গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থ

১। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার [(১ম খণ্ড), পুঁথিঘর]
২। ঐ [(২য় খণ্ড) ঐ
৩। ঐ [(৩য় খণ্ড) জিজ্ঞাসা]
৪। ঐ [(৪র্থ খণ্ড) জিজ্ঞাসা]
৫। এরিষ্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব (বেঙ্গল পাবলিশার্স)
৬। হোরেসের "আর্স পোয়েটিকা" (মডার্ণ বুক এজেন্সি)
৭। নাটক ও নাটকীয়ত্ব (জিজ্ঞাসা)
৮। রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের ভূমিকা (জিজ্ঞাসা)
(অপ্রকাশিত রচনা)
৯। মহ[illegible]কাব্যজিজ্ঞাসা (যন্ত্রস্থ)
১০। নাট্যতত্ত্বমীমাংসা— (যন্ত্রস্থ)
১১। ক্রোচের এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা—
১২। সাহিত্যতত্ত্বমীমাংসা (ভূমিকা খণ্ড)

নিবেদন

'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার' গ্রন্থমালার মতো রবীন্দ্র-নাট্যসমালোচনার গ্রন্থমালা রচনা করার সঙ্কল্প অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে রয়েছে এবং অটুটভাবেই রয়েছে। রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের ভূমিকা সেই সঙ্কল্পিত গ্রন্থমালারই প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ভূমিকাখণ্ড। রবীন্দ্র-নাথের নাটক সমালোচনা করার আগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং তাঁর নাটক সম্বন্ধেও, যে সব কথা অবশ্যই জেনে নেওয়া দরকার, এই খণ্ডে আমি সেই সব কথাই বলতে চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে, আমি প্রতিভা-দর্শনের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেছি এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বর-জ্যোতি নিরীক্ষণ করতে হবে, তার দিকে রবীন্দ্রসাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বলা বাহুল্য, এই অধ্যায়ের আলোচনা দর্শনঘেঁষা না হয়ে পারেনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আমি রবীন্দ্র-যুগের স্বরূপটি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি এবং সমাজবিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষতঃ বাঙালী-জাতির ক্রমবিকাশের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে রবীন্দ্র-যুগটির বিশেষ বিশেষ প্রবণতা নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি। জাতীয় জীবনের রাজ-আর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপের পরিপাটি পরিচয় দিতে হলে যতখানি অবকাশ আবশ্যক, ততখানি অবকাশ এখানে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই, তালিকা দ্বারাই অনেকক্ষেত্রে বক্তব্যকে সংকেতিত করতে হয়েছে। তার ফলে অধ্যায়টি বেশ একটু তালিকা-ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর পর যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ঐতিহাসিক

পদ্ধতিতে সমালোচনা করতে এগিয়ে আসবেন, আশা করি, এই অধ্যায়টি তাঁদের কিছুটা সাহায্য করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, আমি রবীন্দ্র-মানসের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁর পরাদর্শন, দেবতাদর্শন, ধর্মদর্শন, নীতিদর্শন, সমাজ-দর্শন, সৌন্দর্য্যদর্শন, শিল্পদর্শন—সমস্ত রকমের দার্শনিক সংস্কারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই করেছি যে, রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যটুকু ধরতে পারলে রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টির স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝতে বেগ পেতে হবে না। এই অধ্যায়ে আমি নিজে খুবই কম কথা বলেছি এবং রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই অধিকাংশ কথা বলিয়েছি—বলা যেতে পারে—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছি। বলা বাহুল্য, 'রবীন্দ্রমানস' বড় একখানা গ্রন্থের পরিসরে আলোচনার যোগ্য বিষয়; একটি অধ্যায়ের পরিসরে তাকে পরিপাটি করে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে,—আমি রবীন্দ্র-রচনার একটি তালিকা দিয়েছি। এই তালিকা দেওয়ার উদ্দেশ্য—রবীন্দ্রনাথকে একনজরে দেখানো। এই অধ্যায় রচনায় আমি দুইজন মনীষীর কাছে সর্বতোভাবে ঋণী; এঁদের একজন হলেন—৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যজন—রবীন্দ্রজীবনীর স্বনামধন্য লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তালিকাটি সর্বতোভাবে নির্ভুল—এ দাবী করতে পারলে সুখীই হতাম; কিন্তু সে দাবী করবার সাহস পাচ্ছিনে। দু'একটা নাম ও সন-তারিখ একঘর থেকে অন্য ঘরে সরে গেছে। আশা করি সহৃদয় পাঠক ক্ষমাদৃষ্টিতে এই দোষটুকু দেখবেন।

পঞ্চম অধ্যায়,—গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমি রবীন্দ্র-নাটকের ধারাটি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সংক্ষিপ্ত আলোচনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকসমূহের "ভিতরের কথা ব্যক্ত" করতে চেষ্টা করেছি। জানিনে এই চেষ্টা কতদূর সফল

হয়েছে। তবে এটুকু বলতে পারি যে নাটক-সম্পর্কিত কোন সমস্যাকেই আমি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করিনি।

এই অধ্যায়ের শেষভাগে, আমি বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান এবং রবীন্দ্রনাট্যের রীতি সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে দু'একটা কথা বলেছি। অবশ্যই এই দু'টি বিষয় পৃথক পৃথক অধ্যায় দাবী করতে পারে। এই দাবী পূরণ করতে আমি পারিনি, তেমন চেষ্টাও করিনি। প্রথম কারণ রূপকধর্মী ও সংকেতধর্মী রচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রত্যেক রবীন্দ্রনাট্য-সমালোচকই যথাসাধ্য আলোচনা করেছেন, এবং দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ—গ্রন্থের কলেবর আরো দু'টি অধ্যায় যোজনার ব্যাপারে অসহিষ্ণু।

এই অসহিষ্ণুতার জন্য প্রকাশক অপেক্ষা গ্রন্থকারই অধিকতর দায়ী। প্রেসে দেওয়ার আগে সবটা লিখে শেষ না করা এবং লেখা মাজা-ঘষা, না করা—এই দুই কারণেই নানা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে এবং অধ্যায়-গুলির আয়তন বেড়ে গেছে। একহাতে লেখা অন্যহাতে ছাপা—এমন একটা অবস্থাই এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী। আশা করি সহৃদয় পাঠক নিজগুণে ত্রুটি মার্জনা করবেন।

এই গ্রন্থ-রচনায় অনেকেই অনেকভাবে আমাকে উৎসাহ এবং সাহায্য যুগিয়েছেন। প্রথমেই স্মরণ করছি এবং প্রণাম জানাচ্ছি আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয়কে এবং রবীন্দ্রকাব্য-রসিক অধ্যাপক অগ্রজোপম শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যকে। তারপর রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং নাটক সম্বন্ধে যাঁরা সমালোচনা গ্রন্থ লিখেছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণ স্বীকার করছি। বিশেষভাবে ঋণ-স্বীকার করছি পূজ্যপাদ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথকে সর্বতোভাবে জানতে বুঝতে প্রভাতবাবুর 'রবীন্দ্র-জীবনী' (১ম—৪র্থ খণ্ড) শুধু অত্যাবশ্যকই নয় অপরিহার্য। এই অদ্বিতীয়

গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাচ্ছি।

প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবাসজীবন চৌধুরী মহাশয়ের "রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যদর্শন" গ্রন্থখানির কাছেও আমার ঋণের পরিমাণ কম নয়। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কেও আমি এই সুযোগে প্রীতি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বঙ্গবাসী কলেজের দর্শনবিভাগের সাহিত্যরসিক অধ্যাপক বন্ধুবর কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করছি। জটিল দার্শনিক বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আমি অনেক আলোচনা করেছি। তাকেও আমি প্রীতি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে আমি আলোচনা ক'রে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি তাদের একজন হচ্ছেন—নাট্যসমালোক অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অন্যজন [illegible] অধ্যাপক শ্রীসুশীল জানা। দু'জনকেই প্রীতি জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের নাটক কতখানি অভি-নেয়—এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য-নাট্য-সংগীত একাডেমির নাট্যবিভাগের ডীন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে অনেকদিন অনেক আলোচনা করেছি এবং যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। "বহুরূপী" সম্প্রদায়ের 'রক্তকরবী' এবং 'ডাকঘর' অভিনয় এ বিষয়ের অভিমতগঠনে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এজন্য বহুরূপী সম্প্রদায়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রচ্ছদপটশিল্পী, প্রকাশক এবং মুদ্রাকরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিবেদন এখানেই 'ইতি' করছি।

শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্য।

" পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি

আপন গন্ধে মম

কস্তুরী মৃগ সম।

ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে

কোথা দিশা খুঁজে পাই না

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই

যাহা পাই তাহা চাই না "

—(রবীন্দ্রনাথ)

In a stupid nation the man of genius becomes a God : Everybody worships him and no body does his will.

—(**Bernard Shaw**)

উৎসর্গ

রাণী'কে

সূচী

জীবন-সাধনার তথা মুক্তি-সাধনার বৃত্তের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হ'য়েছে। একথা সত্য বটে—"সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎ-প্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী" এবং "মানুষ তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এ সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল আর ধর্মতন্ত্রই বল"—আসল কথা, মানুষের যত কিছুই আশ্রয় থাক, সব আশ্রয়ই উপায়; তাঁর লক্ষ্য—পরম শ্রেয়ের—পরম সামঞ্জস্যের সঙ্গে স্বভাব-যোগে যুক্ত হওয়া। "সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই—" এবং চাই বলেই—"কথা নেই, বার্তা নেই, আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি—কত লিখছি, কত আঁকছি কত গড়ছি। কত গৃহ কত সমাজ বাঁধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি। আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা। এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে নানা দেশের মানুষ কত নানা আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুলছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষা-দীক্ষা। কী করলে নানা মানুষের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে—এই চেষ্টায় এই তপস্যার পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।" (মানুষ)। তাই বলে "প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে"—"মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়"—এ কথা সত্য নয়। একথা স্বীকার করলে—"সমাজকে মানব-হৃদয়ের কারাগার বলতে হয়। সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওয়ালা কারখানা বলে মানতে হয়।" মানতে হয়—"ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা যোগাচ্ছে।"—(সমাজে মুক্তি)। রবীন্দ্রনাথ একথা মানতে মোটেই রাজি ন'ন।

এই না-মানার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের মূল তত্ত্বটি নিহিত

আছে। বৈজ্ঞানিকের বা বস্তুবাদীর মতো তিনি একথা স্বীকার করেন না—জৈবিক আবেগের বা প্রবৃত্তির মধ্যেই মানুষের সব চাওয়ার উৎস নিহিত আছে অর্থাৎ জীব হিসাবে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা করবার তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হ'য়েছে এবং সুষ্ঠু অভিযোজন—প্রচেষ্টাই মানুষের সর্ব্ববিধ আচরণের প্রেরণা হিসাবে কাজ করছে। রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শন-অনুসারে—জীবাত্মার স্বভাব এবং পরমাত্মার স্বভাব মূলতঃ একই। তবে অহংকারের গণ্ডীর মধ্যে জীবাত্মা আবদ্ধ এবং 'আবদ্ধ ব'লেই পরমাত্মা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে।—"এই বিচ্ছেদ এই অসামঞ্জস্যের জন্যেই তো সে (জীবাত্মা) কেঁদে মরছে।"—"এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা।" আসল কথা সামঞ্জস্যের অর্থাৎ ঐক্যের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা আছে ব'লেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। সমাজ সেই সামঞ্জস্যে পৌঁছবার উপায়মাত্র।

মানুষের লক্ষ্য—অমৃতলোক—"মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র" (অমৃতের পুত্র)। মানুষ অমৃতপথযাত্রী—"আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোন পান্থশালাতে আমরা বদ্ধ নই।" (যাত্রীর উৎসব)। মনে হ'তে পারে—"যে পথে চলছি সে সংসারের পথ, তার মাঝে সংসার, তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান তার অবসান মৃত্যুতে" (ঐ)—"কিন্তু না, পথ তো কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়।" (ঐ)। তার গতি সেই লক্ষ্যেই যেখানে—গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্, অন্তরে অদ্বৈতম্"।

এই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগ রাখতে হ'লে, অদ্বৈতের অনন্ত প্রকাশ থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে রাখলে চলবে না এবং চলবে না ব'লেই জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে এবং সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে থেকেই সত্য-শিব-সুন্দরের

সাধনা করতে হবে। প্রাকৃতিককে বা আধ্যাত্মিককেই কেবল সত্য বলে গ্রহণ করলে সমগ্রতা থেকে আমরা দূরে সরে আসবো—কারণ—"পূর্ব ও পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে, প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।"—মনে রাখা দরকার—"মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে আত্মা—একদিকে রাজার খাজনা যোগায় আর একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হ'য়ে উঠতে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়ম রূপে প্রকাশ পায়, সেইদিকে প্রকৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকেই আত্মা।" (বিধান)। এ কথাটা বুঝতে হবে—মানুষ যেমন সকলের সঙ্গে এক হয়ে আছে তেমনি এক জায়গায় সকলের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে আছে। "মানুষ যে দ্বিজ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায় এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-একজায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দ্দিকে কত সংগ্রহ, কত সংগ্রাম করতে হয়; তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে মরে........মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি; সেই গুহালোকেই তার লোক।" (গুহাহিত)। এই ধারণা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন—"বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন, আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন—সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাত্মা"—(বিধান)। আসল

কথা—প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই—দুই দিকেই মানুষকে পূর্ণযোগের সাধনা করতে হবে। কারণ—"প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র আর জীবাত্মা তার প্রেমের ক্ষেত্র……প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে 'প্রচার' করছেন' আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।" (প্রকৃতি)

জগৎ প্রকৃতিতে তাঁর ইচ্ছা 'নিয়ম' রূপে ব্যক্ত আর সমাজ-প্রকৃতিতে তাঁরই ইচ্ছা 'মঙ্গল রূপে প্রকাশিত তাঁর ইচ্ছাই যে বিশ্ব-ইচ্ছা"—"সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়- সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা" (কামনা-ইচ্ছা-মঙ্গল)। এই 'বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করতে পারলেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ সত্য হয়। কারণ—"আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে সংগত-হয়, তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোন প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না। লোকের খ্যাতিই তাকে কোন রকমে তাকে জীবিত রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি যোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না" (স্বাভাবিকী ক্রিয়া)। মোট কথা মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তি-ইচ্ছার সংগতির মাঝ দিয়েই সমাজে মুক্তি আসতে পারে। অন্য কোন উপায় নেই। সমাজের মূল আকাঙ্ক্ষা বিশ্ব ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা। এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাতেই সমাজ নতুন নতুন বিধিব্যবস্থার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে—সমগ্র ব্যক্তি-ইচ্ছাকে সামঞ্জস্যের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে তাঁর স্বস্তি নেই।

সমাজ-প্রকৃতির সমস্যা নানা অহংকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের—সমগ্রের সঙ্গে অংশের সংযোগ স্থাপনের সমস্যা। অহংকার স্বাধিকার

প্রমত্ত হ'য়ে এই সামঞ্জস্যের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। "অধিকাংশ মানুষ এই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ বা প্রাকৃতিক দিকেই সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ বা আধ্যাত্মিক দিকে।'......"প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে।" .."তারা সর্ববিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড়ো জিনিষ লাভ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাদের শ্রেষ্ঠ লাভ হচ্ছে ধর্ম্মনীতি" (প্রকৃতি)। অর্থাৎ—"বড়ো রকমে, স্থায়ী রকমে, সকলের চেয়ে সার্থক রকমে, মিলিতে গেলেই এমন একটি নিয়মকে স্বীকার করতে হয় যা' মঙ্গলের নিয়ম অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম অর্থাৎ ধর্ম্মনীতি" (ঐ)।—"কিন্তু এর একটি মুস্কিল হচ্ছে এই যে, অনেক সময়ে তাঁরা এই ধর্ম্মনীতিকেই মানুষের শেষ সম্বল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলই কর্ম্ম করা যায়, কেবলই শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ করা যায়, সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রেয় বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্ম্মের আশ্রয়ভূত ধর্ম্মনীতিকেই তাঁরা পরম পদার্থ বলে অনুভব করেন। কিন্তু যাঁরা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশ্বর্য্যকে পায়, ঈশ্বরকে পায় না! কারণ, ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের ঐশ্বর্য্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন"। (প্রকৃতি)। ঈশ্বরকে যেখানে পাওয়া যায়—সে "বাহিরে নয়, প্রাকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ সেখানে তাঁর আনন্দ, সেখানে প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকেই দিতে চান। (পাওয়া)।

শুধু যে ব্যক্তিজীবনেই সামঞ্জস্যের অভাবে বিকৃতি ঘটতে পারে তা' নয়, জাতির জীবনেও এই সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দিতে পারে, দিয়েও থাকে। "আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্তভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তা হলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার

মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে—আত্মা মরুক আমি থাকি। আত্মা বলে—প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক, আমি একাধিপত্য করি'। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে : এর মধ্যে আর দয়া মায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাঠ একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না, সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত"। (সমগ্র)

যেমন—"ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্য্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে হচ্ছে।...প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্ত ভাবে কানা ছিল প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।" (সমগ্র)। তারপর—"এ কথা যদি সত্য হয় যে, পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে, একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্য দিক থেকে এসে তার মর্ম্মস্থানে বাজবে।" (সমগ্র)। কারণ—"মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আকড়ে জীব চলেছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে-সত্তা সে আছে আদর্শ নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মত নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ।......কোন দিকে নির্দেশ? যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।............মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র 'অংশগত আপনার ক্ষুদ্রগত প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন

সেই দিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেই দিক আছে তার অন্তরে, যেখানে থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপ দান করে সকলের আনন্দকে। যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানব সত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।" (মানুষের ধর্ম)। কিছুতেই ভুললে চলবে না—"এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র—এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্বর।" (মানুষের ধর্ম)। রবীন্দ্রনাথের মতে এই আত্মোপলব্ধির সত্যকে অস্বীকার করে যে সে বর্বর,—সে ব্যক্তিই হোক, রাষ্ট্রতন্ত্রই হোক, সমাজতন্ত্রই হোক আর ধর্মতন্ত্রই হোক। প্রাকৃতিক আর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশের সমন্বয় যেখানে ঘটেনি সেখানে সম্পূর্ণতাও আসেনি। একথা মানতেই হবে—য়ুরোপ তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির তেজে পৃথিবীতে ঘটা করে আলো জ্বেলেছে—সর্বদেশ সর্বকালকে স্পর্শ করেছে। "কোন সত্য দ্বারা? তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে-বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করে কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে সে একটা বিপুল শক্তি।......এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী করে সৃষ্টি করে তুলেছে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা-কিছু বাধা আছে তা দূর করবার জন্যে সে যে শক্তি প্রয়োগ করেছে তাকে যদি আমরা সামনে মূর্তিমান করে দেখতে পেতুম তাহ'লে তার বিরাটরূপে অভিভূত হতে হত।" কিন্তু—"এইখানেই য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব করতে পারে, তেমনি তার এমন একটা দিক আছে যেখানে তার প্রকাশ আচ্ছন্ন।............

বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশ পথ খুলে দিচ্ছে, কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেছে, যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী একটা বিপদ হয়ে উঠল। এইখানে বিপদ তার নিজেরও।" (জাভাযাত্রীর পত্র)। প্রকৃতিকে সেবা করে মানুষ ঐশ্বর্য্য পায়,—মহাশক্তি লাভ করে—দেবতার শক্তি পায়, কিন্তু দেবত্ব পায় না—"বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের—এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য—পীড়াকে মানব লোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়েছে, মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হ'ল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে এই জন্যেই মরবে—সে সত্যকে জেনেছিল, কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানেনি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায়নি।" (জাভাযাত্রীর পত্র)

আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে দূরে সরে গেছে বলেই—"য়ুরোপের বাইরে সর্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হ'য়ে উঠেছে, তার প্রমাণ আজ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে। (ঐ) "বিজ্ঞানের স্পর্ধায় শক্তির গর্বে, অর্থের লোভে পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-যে চর্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপে করছে- নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল"—তাকে পেতেই হবে—পেতে হচ্ছেও'। তা'ই বলে বিজ্ঞানকে তথা যন্ত্রকে বর্জন করলেই মুক্তি হবে একথা যেন কেউ না ভাবে।—সত্যি বটে য়ুরোপ ভাবছে থামব কোথায়। কিন্তু "সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে। আমি তা' বলিনে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের

দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুয়ের সম্মিলনে সাধনার সিদ্ধি হয়। বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।"

বিজ্ঞানের ও ধর্মবুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য না ঘটাতেই, রবীন্দ্রনাথের মতে, আধুনিক সভ্যতায় বড় সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কট—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সামঞ্জস্যের অভাব থেকেই জন্মেছে। আত্মার সহজযোগ আধুনিক সভ্যতায় অস্বীকৃত—অসম্মানিত হ'য়েছে। যে আত্মা 'জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারা সার্থক হয়' সেই আত্মার যোগের বাধা ঘটছে। "যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা" (মানুষের ধর্ম।) বিজ্ঞান মানুষকে অসীম শক্তির অধিকারী করেছে, কিন্তু "যে-বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিকে—শুভবুদ্ধিকে—আত্মার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, প্রেমের যোগ থেকে ভ্রষ্ট ক'রে—শুভ থেকেই বঞ্চিত করেছে। "সিদ্ধিলোভে শুভ নয়, পুণ্যলোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।"......"সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে।" "আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে, তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক শিব নয়।" সমাজ-রীতি—"নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। একদিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর অন্যদিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন কি, অন্যায় প্রণালী—ঘরগড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন।" (ঐ)। এইভাবে সমাজ অচলায়তনে পরিণত হয়।

'অচলায়তনে' পরিণত হওয়া—সমাজের একদিকের বিকৃতি। অন্যদিকে, জাতীয় অহংকার লোভের তাড়নায় নিষ্ঠুর দস্যুতে পরিণত হ'তে পারে। সাম্রাজ্যবিস্তার এই লোভেরই লেলিহান লোলুপ-তার ফল।

"জীবনক্ষেত্রের যে কিনারাতেই ধর্মবুদ্ধিতে আগুন লাগানো হোক না, সে আগুন সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে-নিষ্ঠুরতার সাধনা করে তার সীমা নেই; কারণ আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বলতে জানে না, "এইবার বস্ হয়েছে।" বস্তুগত আয়োজনের অসংগত বাহুল্যকেই যে-সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয়, সে-সভ্যতা অগত্যাই নরভুক। নররক্তশোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেকবেই, এতে আর সন্দেহ করা চলে না" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)।

যে সমাজ সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে আপন অহংকারকে স্থাপনা করে তখনই সে পাপ করে। যে উদ্দেশ্যে সমাজের সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। মনে রাখা দরকার "জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র।......রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষ-বর্জিত হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে যে-ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হ'লে ইতিহাসে ধিকৃত হয়।" (মানুষের ধর্ম)।

"'মানুষের জাতীয়তা' ইংরাজিতে যাকে Nationality বলে, ক্রমশ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎ রূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু সেই তপস্যাকে ভঙ্গ করবার জন্য শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ, কত আঘাত, কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে

তুলছে।" (সৃষ্টির ক্রিয়া—শান্তিনিকেতন)। এই ভাবেই জাতিগত পাপের সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু যে জাতি পাপ করে, শুধু সেই যে প্রায়শ্চিত্ত করে তা নয়, সমগ্র জাতিকেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে এর যে দিক থেকেই মানবজাতির মধ্যে দুর্বলতা তথা পাপ প্রবেশ করুক, প্রায়শ্চিত্ত না করে তার মুক্তি নেই। "বাহ্যসম্পদের প্রাচুর্যের মাঝখানেই সেই বিনষ্টির লক্ষণ সহসা এসে দেখা দেয় যখন মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।"......... স্বাজাত্যের শিখরের উপড়ে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব করতে স্পর্ধা করে, রাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে, তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে।" (মানুষের ধর্ম) যেখানেই এবং যে-কারণেই পাপ জন্মুক, পাপের মার্জ্জনা বা প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। কারণ, মানবধর্ম প্রকৃতিস্থ হবেই—জ্ঞান-প্রেম কর্মের সামঞ্জস্য না ঘটা পর্যন্ত 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'-এর সম্পূর্ণ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তার শান্তি নেই। তাই "অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবে।" পাপের মার্জনা হবেই। "যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে।" (পাপের মার্জনা)। ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হ'লেই তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি আসেন—মানুষের ধর্মবুদ্ধির রূপেই আসেন—মানুষের জ্ঞান-প্রেম-কর্মরূপেই আসেন—প্রত্যেক জাগ্রত চিত্তের প্রতিক্রিয়া রূপেই আসেন। "এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায় আর কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না, তখনই পাপ জিনিসটা কী তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

আমাদের চৈতন্য যখন বরফ-গলা ঝর্ণার মতো ছুটে বেরোতে চায় তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে না—তাকে ক্ষয় করবার জন্যে, তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পাপের চারিদিকে ফেনিল হয়ে উঠতে থাকে।" (পাপ)। জাগ্রত চৈতন্যের কাছেই পাপ অসহ্য। এর সঙ্গেই পাপের প্রথম ও শেষ সংগ্রাম। চৈতন্যের পীড়া শুধু কি তাঁরই মাঝে দেখা দেয় যে পাপকে সরিয়ে ফেলতে চায়? না। যে পাপ করে তার মাঝেও তো এ পীড়া জাগে। পাপের মার্জনা যখন হয় তখন অন্তরে বাহিরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। অন্তরের জাগরণে এবং বাহিরের আত্মদানে, পাপের মার্জনা সম্পূর্ণ হয়। আত্মার ক্রন্দনেই পাপের আসল মার্জনা।—"এইজন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো কান্না, পাপের কান্না। সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের সুরে মেলাতে পারছে না; সেই অমিলের বেসুর, সেই পাপ তাকে আঘাত করছে……তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলছে: মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরো না। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও। (আত্মবোধ)

এই কান্নার আবেগ তো শুধু একা তারই নয় যে পাপ করে—পাপের প্রায়শ্চিত্তের দায় তো শুধু একা পাপীরই নয়। যেখানে পাপ শাস্তি তো শুধু সেখানেই নেমে আসে না। কারণ—"মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ অতীতে, ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুষ যে গাঁথা হয়ে

আছে।”.........“তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না—সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে।” (পাপের মার্জনা)॥ আগেই বলা হয়েছে—জাগ্রত চিত্তের সঙ্গেই পাপের সংগ্রাম। কারণ—“যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না। সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠেছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন—সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ি ছিন্ন হয়ে যাবে। যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে।” (পাপের মার্জনা)। বেশি করে বাজে বলেই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে এরা দুর্যোগের গভীর অন্ধকারে পথ করে চলতে পারে; ডাক শুনে কেউ না আসলেও, একা একাই পথ চলে।

নিজের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ না করলে “পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে? প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে? মুক্তির তপস্যা করতে হবে—“সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদ্‌ভদ্রং তৎ—যা ভদ্র তাই আসবে।” যে জেগেছে—আত্ম-বোধ যার সম্পূর্ণ হয়েছে, সে, রুদ্রের দারুণ দীপ্তি দেখে, প্রলয়ের রুদ্র শিখা দেখে, রক্তস্রোত, অগ্নিবৃষ্টির প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখে, আর ভয় পায় না। রুদ্রের প্রলয় নাচনের ছন্দে যোগ দিতে সঙ্কোচ করে না। রুদ্রকে নমস্কার করে বলে—“নমস্তেঽস্তু।......পিতা তুমি যে আছ সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর—সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ দলন করুক। পিতা নো বোধি। আজই তো সেই উদ্‌বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়-দাহের রুদ্র আলোকে পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়-হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ,

তুমি জেগে রয়েছ……তুমি আঘাত করছ, প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত… ……সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে, দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো, দুঃখের দ্বারা মার্জনা করো, রক্তস্রোতের দ্বারা মার্জনা করো, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জনা করো।" (পাপের মার্জনা)

জাগ্রত চৈতন্যেরই অপার বেদনা, তাই অশেষ দায়। বিশ্বের নিভৃততম কোণে যে পাপটুকু জমা হয়ে আছে তাকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। আত্মবোধের নির্মল বুদ্ধির আলোকে মুক্তির যে বিশ্বরূপ সে দেখেছে তা'তে সে বুঝতে পেরেছে—"সমস্ত মানব সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটি-মাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান।……"সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের নয়। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে।" (মানুষের ধর্ম) সমস্ত চরম বাধার, সমস্ত আবরণের অপসারণেই মুক্তি-সাধনার সিদ্ধি।

মুক্তি-সাধনাকে এত দায়িত্বপূর্ণ—এত সর্বব্যাপী এবং এত অপরিহার্য করে তোলা—রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোনো দার্শনিক কবি করেননি। "জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগ-সাধনা"—এই আদর্শকেই জীবনসাধনার তথা মুক্তিসাধনার লক্ষ্য রূপে স্থাপনা করায়—রবীন্দ্রদর্শন একটা মহিমময় ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিশ্বজাগতিকতা এবং পূর্ণমানবতার জন্য এত ঐকান্তিক আবেগ খুব কম আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে,

তাতে রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনে, সৃষ্টি, প্রকৃতি, পাপ-পুণ্য, সাধনা মুক্তি, সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতির স্থান ও বৈশিষ্ট্যকে, যথাসম্ভব রবীন্দ্রনাথের বচনেই, ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই হিসাবে এই অধ্যায়ের আলোচনা—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। আগেই এ কথা বলা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার মতোই সামঞ্জস্যের পূজারী; তাই একান্ত দ্বৈতবাদ এবং একান্ত অদ্বৈতবাদ তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ মতবাদ। এ কথাও বলা হয়েছে—ব্রহ্মতত্ত্বকে ও বিশ্বতত্ত্বকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ স্থাপনা করেছেন—একের ও বহুর মধ্যে নির্বিরোধ সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। এখানে যে কথাটি বিশেষ করে বলা হচ্ছে সে এই যে, মূলত আধ্যাত্মবাদী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী দার্শনিকের প্রধান প্রধান আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর দর্শনের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। এমনভাবে তিনি তাদের সমীকরণ করার চেষ্টা করেছেন যে অতিপ্রগতিশীল বস্তুবাদীর কাছেও রবীন্দ্রনাথের কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই।

ভুল বুঝার আশঙ্কা আছে, সুতরাং কথাটাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলা ভাল। বস্তুবাদী জগতের পার-মার্থিক সত্তা স্বীকার করেন, জগৎকে নিয়মের রাজত্ব বলে মনে করেন এবং তা' করেন' বলেই বস্তুজগতের নিয়মকে জানতে ও আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন। কারণ এই সমস্ত নিয়মের মধ্যেই তো সত্য নিহিত। রবীন্দ্রনাথের কাছেও বস্তুজগতের অস্তিত্ব মায়া বা মিথ্যা নয়। জগৎ-প্রকৃতি ব্রহ্মেরই অন্যতম অভিব্যক্তি, সুতরাং সত্য। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি নিয়মরূপে ব্যক্ত। এই নিয়মকে না জেনে বা উপেক্ষা করে কারো পক্ষেই অদ্বৈতকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই .নিয়কে জানার সাধনাই বিজ্ঞানের সাধনা। অতএব বিজ্ঞানের সাধনা ব্রহ্ম সাধনারই একটি বিশেষ রূপ—অবশ্য আংশিক রূপ। তারপর বস্তুবাদীর অন্যতম বাসনা—

বিবর্ত্তনবাদের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদের মধ্যে এই বিবর্ত্তনবাদকে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। তিনি যখন বলেন—"এ-যে কোন যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে! এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে" (চিরনবীনতা)—তখন ডারুইন-শিষ্যদের বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে সামান্যই বাকী রাখেন। তারপর, সামাজিক জীবনে সাম্য-প্রতিষ্ঠার আবেগের কথা ধরা যাক। বস্তুবাদী বিধাতা মানেননা বলেই কোনো সমাজব্যবস্থাকেই বিধাতার বিধান বলে স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে—সমাজ ব্যবস্থা মানুষেরই প্রয়োজনে, মানুষেরই-হাতে—গড়া বিধি-নিষেধ। প্রয়োজন দেখা দিলে মানুষ তাকে অবশ্য পরিবর্ত্তন করতে পারে। যে মূল উদ্দেশ্যে সমাজের উৎপত্তি সেই উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট হ'লে গোষ্ঠী-স্বার্থের এবং ব্যক্তি-স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে, সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়—সমাজ বিকৃত হয়। ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ক'রে নানা ব্যক্তি-স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা—তথা শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই, সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। শোষণমুক্ত সামঞ্জস্য সেই সমাজেই পাওয়া সম্ভব যেখানে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। সমাজের ভিতরে বাইরে সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সাম্যের জন্য, থাকা চাই ভিতরে সাম্যের বোধ ও আবেগ, বাইরে থাকা চাই—সমান অধিকারের ব্যবস্থা। কারণ সাম্যকে শ্রেয় বা সত্য বলে না বুঝলে, প্রেয় বলে না ভালবাসলে, বাইরের সমান অধিকারের ব্যবস্থা বুদ্ধিরও হৃদয়ের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়। তেমনি শুধু অন্তরে বোধ ও আবেগ থাকাই যথেষ্ট নয়, কার্যত জীবনযাপনে সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

রবীন্দ্রদর্শন মূলতঃ ব্রহ্মবাদী দর্শন হ'লেও, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের ইচ্ছার মধ্যেই অহংকে স্বাধীনতা দান করেছেন তথা—মানবসমাজে বিকৃতির অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং জাতিগত পাপের অবকাশ করে দিয়েছেন। বস্তুবাদীর কাছে যেমন অসামাজিক আচরণ—অর্থাৎ যা সমগ্রের মঙ্গলের পরিপন্থী, —পাপ বলে গণ্য, রবীন্দ্রনাথের কাছেও পাপ—সমগ্রের বিরুদ্ধে একের বিদ্রোহ—অসামঞ্জস্য। এই সূত্রানুসারে ব্যক্তি যখন ব্যক্তির উপরে অত্যাচার করে, সে পাপ করে, শ্রেণী যখন শ্রেণীকে শোষণ করে, পীড়ন করে সে পাপ করে এবং জাতি যখন জাতিকে পরাধীন করে রাখে এবং শোষণ-শাসন করে তখন পাপ করে।

রবীন্দ্রনাথ সমাজের অন্তরে-বাহিরে সর্বক্ষেত্রেই সাম্যের প্রতিষ্ঠা করতে অভিলাষী। জগৎ-প্রকৃতির জ্ঞান বাদ দিয়ে মুক্তির চেষ্টা যেমন নিষ্ফল প্রয়াস, তেমনি সমাজ-প্রকৃতিতে প্রেমের সাধনা, মৈত্রীর সাধনা—কর্মের সাধনা বাদ দিয়েও মুক্তির চেষ্টা নিষ্ফল প্রচেষ্টা। বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ যেখানে পরম কাম্য, সেখানে অসাম্য-অনৈক্য, দ্বেষ-হিংসার কোন স্থানই নেই। জ্ঞান—প্রেম-কর্মের যোগেই জ্ঞানময়—প্রেমময়—বিশ্বকর্মার সঙ্গে যোগ সম্ভব এবং সেই যোগেই মুক্তি। রবীন্দ্রদর্শনে মানুষকে যত বড় মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে, তত বেশী তার দায়িত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রেমের সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি না আসলে, জীবন থেকে চৈতন্যের আবরক সমস্ত রকম বাধা অপসারিত না করলে—সমষ্টির মুক্তি না আনতে পারলে ব্যক্তির মুক্তি নেই—এর চেয়ে বড় ও বেশী দায়িত্ব ব্যক্তির পক্ষে আর কি হ'তে পারে? রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—"সমস্ত মানব সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটি মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অবসান হয় না। (মানুষের ধর্ম)—তখন মুক্তিকামী মানুষের সাধনা ও সিদ্ধিকে

এমন এক পরম মহিমায় মণ্ডিত করেন যে যে-কোনো যুগের মানুষের কাছে তা পরম কাম্য আদর্শ বলে গৃহীত হবে। একথা অবশ্যই বলা চলে বিশ্বজাগতিকতার লক্ষ্যের অভিমুখে মুক্তি সাধনার পরমাগতি নির্দেশ করে' রবীন্দ্রনাথ মানব-মুক্তির চরম আদর্শ স্থাপন করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই কামনা,—"শেষ মুহূর্তে যেন বলতে পারি সকল দেশই যেন আমার দেশ, সর্বত্রই বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়ে এক মানবপ্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত—"বিশ্ব-প্রেমিকের প্রাণঢালা ঐকান্তিকতায় পূর্ণ নয় কি? "জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং ধর্মে যোগসাধনা"—এই সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেই তবে মুক্তি—এ কথা অবশ্যই মুক্তির উচ্চ আদর্শ ঘোষণা করেছে।

এই মুক্তির আদর্শ, অবশ্যই যে-কোন প্রগতিশীল ব্যক্তির পক্ষেই পরম কামনার বস্তু। এই মুক্তির আদর্শ যে গ্রহণ করবে—এই মুক্তির মন্ত্রে যে দীক্ষা নেবে—তাকে তো শুধু বিশেষ একটি সমাজের অসামঞ্জস্য দূর করলেই চলবে না—শুধু বিশেষ সমাজের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ক্ষান্ত হলেই চলবে না, তাকে বিশ্বজাগতিকতার ধর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে জাতিগত শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে। সমগ্র মানব-সমাজ থেকে সমস্ত রকমের বৈষম্য অপসারিত করবার জন্য, বিশ্বপাপ দূর করবার জন্য সংগ্রাম করতে হতে হবে। সে বিশ্বমানবের মুক্তি-সেনা।

এই মুক্তির এই বিরাট আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের সব ক্ষেত্রেই পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। কায়িক সংগ্রামে তেমন সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে না পারলেও মানসিক ও বাচিক সংগ্রামে তিনি ঐকান্তিক ও বিশ্রামহীন যোদ্ধা ছিলেন। পরিবার, সমাজ, জাতি—কোন ক্ষেত্রেই তিনি প্রভুত্বের পীড়ন এবং শোষণ-শাসনের

অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর মতে, প্রেমের অভাব থেকেই সমস্ত অত্যাচারের সমস্ত অবিচারের জন্ম। প্রেমের সূত্র যেখানে বাঁধে না সেখানেই বাঁধন দাসত্ব শৃঙ্খলের বেড়ি। প্রেমেই মুক্তি। পরিবার, সমাজ, জাতি, সব ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। প্রেমের যোগেই মুক্তির পূর্ণতা।

পারিবারিক ক্ষেত্রের কথা ধরা যাক। নারীর সম্বন্ধের মধ্যে, পরাধীনতা, অপমান এবং গ্লানি সেখানেই আসে, যেখানে সম্পর্কের মধ্যে প্রেম—হৃদয়ের যোগ থাকে না, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি প্রয়োজনের দড়িদড়ায় বাঁধা থাকে—ব্যক্তিকে ব্যক্তি কাম-লোভ-মোহের প্রেরণায় আত্মসাৎ করতে চায়। প্রেমের সহজ সূত্রে বাঁধতে চায় না। সমাজের ক্ষেত্রেও, শ্রেণী-সম্পর্কের বিষয়ে এই সূত্রই প্রযোজ্য। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যখন প্রয়োজনের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্বন্ধই অবশিষ্ট থাকে না, তখনই তো সমাজে গ্লানি দেখা দেয়—শ্রেণীদ্বন্দ্বের উৎকট রূপ প্রকাশ পায়—মানুষের কাছে মানুষ লাঞ্ছিত হয়, বঞ্চিত হয়, উৎপীড়িত হয়। "স্বার্থ জিনিসই যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয়, যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের সামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থাপন করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাদের নানা প্রকার সুবিধা ঘটছে তবে সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।" (বিশ্বব্যাপী—শান্তিনিকেতন ১)

জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ সম্পর্কেও এই একই সূত্র প্রযোজ্য

এক জাতিকে অন্য জাতি যেখানে শুধু প্রয়োজন-সম্বন্ধেই বাঁধতে চায়, হৃদয়ের সম্বন্ধে বাঁধতে চায় না, সেখানেই তো সাম্রাজ্যবাদের লোলুপতায় ও হিংসায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাম্য নষ্ট হয়—প্রবল জাতি দুর্বল জাতিকে শাসন করে, শোষণ করে, পীড়ন করে। তখনই রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড়' চলে—জলে স্থলে আকাশে। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স নিয়ত ব্যস্ত হয়। "তার গাঁট- কাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে যায়।"

লোভের স্বভাবই এই। "লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেই জন্যে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই চেপে রাখতে চায় এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।" (বাতায়নিকের পত্র)। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মবুদ্ধি দিয়ে এই লোভকে শাসন না করা পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে না হ'তে পারে না বলেই হবে না। "যতক্ষণ লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস কনফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি-শান্তিকে বিশ্বাস করিনে"। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন—মূল ব্যাধি এখানেই—এই অসংযত লোভের মধ্যেই। "কর্মিক-ধনিদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তার কারণ লোভ আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" (ঐ)। ভেতরে লোভ নিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা শান্তির নামে স্বার্থরক্ষা করারই ফন্দি আঁটা। তাই তো বার বার শান্তির দরবার উঠছে আর ভেঙ্গে যাচ্ছে। কারণ—"সবলপক্ষীয়েরা যখন আপোষ-নিষ্পত্তির যোগে শান্তি কামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকা বাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকা খাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায়

পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে জায়টাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে নখ তার শোধ তুলতে পারে। (ঐ) এই ধরণের লোভীরা জগতে শান্তি-স্থাপন করতে পারে না। "শান্তি? শক্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্য যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল করছে, তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।" (ঐ—১৩৯) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে শান্তির দরবার চলছে তার সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য কম মানায় না।

তবে একথাও মনে রাখা দরকার মুক্তির সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব শুধু এক পক্ষেরই নয়। যে বদ্ধ হয়, অধীন হয়, সে ব্যক্তিই হোক, শ্রেণীই হোক, আর জাতিই হোক—সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়ার দায়িত্ব তারও কম নয়। দুর্বলতার ছিদ্রপথেই তো পাপ প্রবেশ করে। দুর্বলতাই পাপের প্রশ্রয় দেয়। দুর্বলতাই পাপের শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে পাপকে ভীষণ থেকে ভীষণতর করে তোলে। "দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্বল তাকেই আতিথ্য দান ক'রে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।" (বাতায়নিকের পত্র)......"মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে এটা, যে লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষ মূল্য সে হ্রাস করে।" এই হিসাবে দুর্বল শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না, নিজেকেই ছোট

করে না, সে সমগ্র মানুষের ক্ষতি করে, মনুষ্যত্বকে ছোট করে। মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা ঘটে যখন দুর্বল অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস লাভ করে—নিজে হাত জোড় করে বলে—"আমি ছোট।" এই চিরঅপমানে দীক্ষিত মানুষগুলো অন্তরে-বাইরে এত ছোট হয়ে থাকে যে "সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল করতে চেষ্টা করলে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে।" (ঐ) মানুষ যেখানে অজ্ঞানে-লোভে-মোহে-ভয়ে মনুষ্যত্বের অধিকার ত্যাগ করে, সেখানেই সে মুক্তির অধিকারকেই ত্যাগ করে। প্রত্যেক মানুষকেই তার মনুষ্যত্বের মূল্য দাবি করতে হবে। মানুষকে "বড়ো করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ" করতে হবে এবং বাধা পেলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে" হবে।

"সবল দুর্বলের পক্ষে যত বড়ো শত্রু দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।" (কর্তার ইচ্ছা কর্ম)। মুক্তি কেউ কাউকে হাতে তুলে দিতে পারে না। সাধনা করে মুক্তি অর্জন করতে হয়, সাধনা দ্বারা মুক্তিকে রক্ষা করতে হয়। "বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে কতো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে" (স্বাধিকার প্রমত্ত—কালান্তর)

একথা মনে রাখতেই হবে—"জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই।" ভিক্ষা করে কোন বড় জিনিসকেই পাওয়া যায় না। মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করেই মানুষের হৃদয়-মন পাওয়া যায়। অন্তরে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আসল মুক্তি পাওয়া যায় না। "ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো-একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত

হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক তার চেয়ে দুর্গতি আর আমাদের হতেই পারে না। (রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত)॥

আত্মশক্তির জাগরণের পথেই আসল মুক্তির আবির্ভাব ঘটে। আত্ম-শক্তির মধ্যে যত বড় ফাঁকি থাকে, মুক্তির মধ্যেও তত বড় ফাঁক দেখা দেয়। অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে ফলও পাব।" (বাতায়নিকের পত্র)॥—"মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেন না মানুষ প্রধানতঃ অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্ত্তা, বাহিরের লোভে অন্তরে লোকসান ঘটে।" (সত্যের আহ্বান)॥ মনে রাখতে হবে—"নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি"—সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জানার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে না তুলতে পারলে অধিকার জন্মায় না। ব্যক্তি সম্পর্কে কথাটা যত সত্য, দেশ সম্বন্ধেও তত সত্য। "দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। (ঐ)

আত্মশক্তি না জাগা পর্য্যন্ত সত্যকে দেখা যায় না। মায়াকেই সত্য বলে মনে হয়। "মায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড় দেখায় যতক্ষণ, রাগেই হোক বা অনুরাগেই হোক, বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ।...... ভয় হচ্ছে মনের নাস্তিকতা তাকে না'য়ের দিক থেকে নিকেশ করা যায় না; উপস্থিত মতো তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আর একটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়। ধর্ম হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকতা, তার অল্প মাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না'কে একেবারে মূলে-গিয়ে অভি-

ভূত করে। (ঐ)॥…"পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রাণ করে তুলবে।" কিন্তু আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটলে—পরতন্ত্রতা আপনা থেকেই মরে যায়। কিন্তু এই আত্মশক্তির উদ্বোধন কঠিনসাধনা-সাপেক্ষ ব'লে মানুষ ফন্দি দিয়ে শক্তির স্থান পূর্ণ করতে চেষ্টা করে—সস্তায় কিস্তি মাৎ করতে চায়। মানুষ বুঝে না—"যে জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই, জিনিসও জোটে না।" (ঐ)॥ ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, জাতির-জীবন—সব জীবনের পক্ষেই খাঁটি মুক্তির জন্য এই আত্মশক্তি—উদ্বোধনের সাধনাই একমাত্র পথ। অন্য কোন পথ নেই। লোভের পথে মুক্তি নেই, ক্রোধের পথে মুক্তি নেই। লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। "এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্য চেষ্টা করে তখন সে জবরদস্তির দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে।" (ঐ)

এখানেই রবীন্দ্রমানসের আলোচনার উপসংহার করা যাক। আগেও বলেছি—আরো একবার বলছি—এই আলোচনার অনেকখানিই 'গঙ্গাজলে' গঙ্গাপূজা—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাষায় রবীন্দ্রনাথের মনটির—বিশেষতঃ তাঁর সংস্কারের রেখারূপটি এঁকে দেখাবার চেষ্টা। সুতরাং একে রবীন্দ্র-মানসের সমগ্র রূপ ব'লে কেউ যদি মনে করে বসেন, তা' হ'লে গোড়াতেই বড় রকমের ভুল করবেন। বলা বাহুল্য তা'তে রবীন্দ্রনাথ বা লেখক কারো পরেই সুবিচার করা হবে না। কারণ, একটা মনের সমগ্র পরিচয় দিতে যাওয়ার অর্থ—সেই ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রমগতিশীল মনের জ্ঞান অনুভব-ইচ্ছার সমগ্র রূপটি দেখিয়ে দেওয়া—অর্থাৎ সংজ্ঞান-অসংজ্ঞান নির্জ্ঞান প্রভৃতি স্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মনের যে জটিল রূপটি পাওয়া যায় সেই রূপটির সমগ্রতাকে ব্যক্ত করা। এই কারণেই

'রবীন্দ্র-মানস' কথাটির তাৎপর্য খুবই ব্যাপক। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-নামক, বিশেষ যুগের একটি সামাজিক ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-অনুভব ইচ্ছার সমগ্র সংস্কার বিরাজ করছে—তা'তে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত-সম্প্রদায়গত-জাতিগত—মানবজাতি-গত নানা আবেগ-অনুভূতি, নানা মুহূর্তের নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতি,—নানা বাসনাবাসিত স্মৃতি কল্পনা, নানা ভাবনা ও প্রেরণা, এককথায়—জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার প্রতি-নিমেষের কাহিনী। এই চলিষ্ণু ও বর্ধিষ্ণু রবীন্দ্র-মানসের সমগ্র সত্তাটির পরিচয় দিতে পারলেই তবে, রবীন্দ্র-মানসের আলোচনা ষোল-কলায় পূর্ণ হ'তে পারে। এ চেষ্টা আমি করিনি তা' আগেই বলেছি। আমি রবীন্দ্র-মানসের কয়েকটি প্রধান প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি এবং দেখাতে চেয়েছি—অধ্যাত্মবাদী দর্শনই মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং অধ্যাত্মবাদী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ আধুনিকতার অস্পৃহাকে উদ্ভূত উদারতার সঙ্গে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন।

এবার রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন—সৌন্দর্যদর্শন এবং আনন্দ-দর্শন সম্বন্ধে দু'এক কথা ব'লে আলোচনা শেষ করছি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তা অধ্যাত্মবাদের প্রেরণায় ও আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে—এ কথা বার বার বলা হ'য়েছে। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এ বিষয়ে অতিআধুনিক দুইজন চিন্তাশীল অধ্যাপকের অভিমত উদ্ধৃত করে বক্তব্যটি সমর্থন করানো যেতে পারে। অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় "শিল্পলিপি"-গ্রন্থের (১৩৫৮) একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—"অধ্যাত্মবাদই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলে, আমার বিশ্বাস এই অধ্যাত্মবাদই রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের মূলে। মার্কসবাদের আরম্ভই আবার এই অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতায়, তাহার প্রতিষ্ঠা-ভূমি জড়বাদে! মার্কসপন্থীয় শিল্পদর্শনের মূলেও তাই রহিয়াছে একটা আপোষহীন

জড়বাদ। রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ এবং আধুনিক শিল্পাদর্শের ভিতরে যেখানে যেটুকু বিরোধ, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, সকল বিরোধের মূলে রহিয়াছে ঐ অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের বিরোধ"—(রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ ও সাম্প্রতিক শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব)। 'রবীন্দ্র-নাথের সৌন্দর্য-দর্শন' (১৩৬৩)—গ্রন্থের প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে মতামত ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি বহুস্থলেই উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কোনো মতের গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিন্ত করিয়াছেন।………কোনো লেখকের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে তাহাকে মানুষের সাধারণ চিন্তা-ধারার পটভূমিকাতে রাখিয়াই বিচার করিতে হয়—তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে তাঁহার সত্যস্বরূপটিকে ঠিকভাবে ধরা কঠিন হয়। রবীন্দ্র-নাথের চিন্তাও ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সেজন্য তাহাকে ইউরোপীয় চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাও ভুল, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিমনের প্রসার শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি সকল দেশের সকল কালের মানুষের ভাব-ভাবনাকে আত্মসাৎ করিয়া একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। যে দার্শনিকগণের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল তাহাদের দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তেমনই যাহাদের সহিত তাঁহার মত-ছিল তাঁহাদের উক্তির প্রতিবাদসূত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের স হত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহৎ ব্যক্তিত্ব তাহার সুদূর-বিস্তারী চেতনা ও সহানুভূতি দিয়া এমন করিয়াই বিশ্বের সকল ভাব-ভাবনাকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাহাদের একটি নূতন ঐক্য বাঁধিয়া সুষমামণ্ডিত করে।" নিঃসন্দেহ—এই দু'টি উদ্ধৃতিই রবীন্দ্র-মানসের সাধারণ প্রকৃতি বুঝবার পক্ষে যেমন, তেমনি শিল্প-

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক। শিল্প-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আলোকে প্রকাশ করবার জন্য অধ্যাপক চৌধুরী-মহাশয়ের প্রচেষ্টা—"রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন" গ্রন্থখানি—খুবই উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমি আলোচনার মুখবন্ধ তৈরী করে নিতে চাই। অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছেন—(ক) "রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শনে সাধারণতঃ ছয়টি তত্ত্বকে আমরা বারবার পাই—ইহারা হইতেছে **সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, আনন্দ, প্রকাশ** ও **সাহিত্য**। ইহাদের পমস্পরের মধ্যে নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে।" (খ) সত্য-সৌন্দর্যাদি ছয়টি তত্ত্ব ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-দর্শনের তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—প্রথম, সাহিত্যের আধার ও বিষয়বস্তু লইয়া সমস্যা—উহাদের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধটি কি বা কি হওয়া উচিত? দ্বিতীয়—কবির ব্যক্তিত্বের সমস্যা—উহা আছে কি না? তৃতীয়—ভাবের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা লইয়া সমস্যা—উহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? (গ) [**সত্য**] "রবীন্দ্র-সৌন্দর্য দর্শনে **সত্যের** স্থান অপর সব তত্ত্বগুলির ঊর্ধ্বে এবং তাহারা সত্য দ্বারাই পরিমাপিত।......রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধির সত্যকেই বিশেষভাবে সত্য বলিয়াছেন এবং তাহাকে জ্ঞানের সত্য (যাহাকে তিনি অনেক স্থলেই তথ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন) হইতে পৃথক করিতেন। বুদ্ধি যে সত্যের সন্ধান পাইয়া নিজ প্রয়োজনে লাগায় তাহা আমাদের আপন হয় না—এবং তাহা খণ্ড সত্য হইয়া বাহিরেই থাকে। কিন্তু বোধি যে সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে তাহা আমাদের অন্তরের বস্তু হইয়া একটি সমগ্রতা লাভ করে।"

(ঘ) [**সৌন্দর্য**] জগতের মধ্যে বেহিসাবী বাজে খরচের দিকটা সৌন্দর্য.....আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা—ইহা হইতেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হইল......সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানে সেতু।......'কোন

বস্তুর সহিত সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক স্বার্থের ঊর্ধ্বে এক আধ্যাত্মিক বস্তু' (অর্থাৎ—সৌন্দর্য প্রয়োজনাতীত) "কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবল মাত্র সৌন্দর্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক,তাহা সুবিধা-অসুবিধা সঞ্চয়-অপচয়ের সম্পর্ক নহে।"........সৌন্দর্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বা সামঞ্জস্যের উপলব্ধি।......কিছুকে নিছক নিজ প্রয়োজনে না লাগাইয়াও তাহাকে কেবল তাহারই জন্য (যেহেতু সে আমার আপন) ভালবাসা......সুন্দরের আসন প্রয়োজন-সাধন ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে।

(ঙ)—[**আনন্দ**] আনন্দ আমাদের অন্তরের সহজাত ঐশ্বর্য। আমাদের আত্মাকে বলা হয় নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আনন্দস্বরূপ......যখন এই আত্মা মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিকে একটি ঐক্যে বাঁধিতে সক্ষম হয়...... তখনই আত্মার স্বাভাবিক আনন্দ ভোগ করে।......স্বরূপপ্রাপ্তিতেই আনন্দ...স্বরূপই আনন্দস্বরূপ।

(চ) [**মঙ্গল**]—'মঙ্গল অর্থে দার্শনিক তাহাই বোঝান—যাহা আমাদের নিছক প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে—যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাহা সুন্দর—অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া মঙ্গল প্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য-মূর্ত্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।"...

যা যথার্থ মঙ্গল তা' সত্য এবং সুন্দর—"কেন সুন্দর? কারণ মঙ্গলমন্ত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে; সকল মানুষের মনের সঙ্গে নিগূঢ় মিল আছে'......মঙ্গলের মধ্যে **সামঞ্জস্য** ছাড়া আরও একটি গুণ দেখা যায়—তাহা **ঐশ্বর্য**।

(ছ) [**প্রকাশ**] 'মানুষের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মের প্রকাশ হইতেছে। ......এই অনন্তস্বরূপের প্রকাশ কি করিয়া হইতে পারে—না অপরের

সহিত মিলনে।—"সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে।"........."শরীরের পিপাসা ছাড়া আর এক পিপাসাও মানুষের আছে। সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে—সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে—'আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে, রঙে, সুরে, বাণীতে, নৃত্যে যে যেমন ক'রে পারো আমার অব্যক্ত কথাটিকে ব্যক্ত করে দাও। (সাহিত্যের পথে)

(জ) [**সাহিত্য**] 'সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিষয়বস্তু বলিয়া মনে করেন। উহাদের প্রকাশই সাহিত্যকে সার্থকতা দান করে।...সাহিত্যে মানবজীবনের উপলব্ধির ইতিহাস......মানুষের উপলব্ধিগুলিই সাহিত্যের বিষয়বস্তু—সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন আসে না...অনুভূতির রসটুকুই নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য ...... সুতরাং লোকশিক্ষার বা নীতিশিক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগ নেই।

এই 'ষড়তত্ত্বের পরস্পর-যোগ'—সম্বন্ধে ডাঃ চৌধুরী যে আলোচনা করেছেন, শিল্প-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন্য তা' অপরিহার্য। জিজ্ঞাসু পাঠককে গ্রন্থখানি পড়তে অনুরোধ জানিয়ে আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করছি। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে—রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনকে, তাঁর পরাদর্শনের—এককথায় ব্রহ্ম-বাদের—মূল সিদ্ধান্তের *অনুসিদ্ধান্ত রূপেই গ্রহণ* করতে হবে এবং তা' করলে দেখা যাবে—অহেতুক প্রকাশ-লীলা, অহেতুক আনন্দের প্রকাশ বা অহেতুক প্রকাশের আনন্দ-লীলা, যেমন পরমাত্মার, তেমনি জীবাত্মারও ধর্ম। এই ধর্ম থেকেই শিল্পের জন্ম। এই ধর্মকে অস্বীকার করলে আত্মার প্রধান একটি ধর্মকেই—তার অনন্তস্বরূপতাকে—স্বরূপোপলব্ধির তপস্যাকেই সত্যই অস্বীকার করা হবে। এক সত্যই নানারূপে বিরাজ করছে। সেই

বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে জ্ঞান-মূর্ত্তিতে, ধর্মবোধে মঙ্গলমূর্ত্তিতে এবং ভাববোধে—রসমূর্ত্তিতে ব্যক্ত হ'চ্ছে। শিল্পে পরম সত্যেরই রসরূপ প্রকাশিত। এই রসরূপই সুন্দর রূপ। সুতরাং জ্ঞানসাধনার, ধর্মসাধনার এবং ভাব-সাধনার পরম কাম্য হ'চ্ছে—পরম একের স্বরূপকে লাভ করা। এই পরম এককে—যিনি পরম সত্য রূপে, পরম মঙ্গল রূপে এবং পরম সুন্দর রূপে বিরাজ করছেন,—খণ্ড বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া যাবে না। তাঁকে পেতে হ'লে—"বোধি"র অখণ্ড উপলব্ধি দিয়েই পেতে হবে। বুদ্ধি-শক্তি দিয়ে শুধু সত্যের বিশেষকেই—পরিচ্ছিন্ন রূপকেই পাওয়া যায়; নির্বিশেষ অপরূপকে পেতে হ'লে "বোধির" উপলব্ধি আবশ্যক। কারণ সমগ্রকে, সমগ্র সত্তা দিয়ে—মর্ম দিয়ে—না পেলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'মরমীয়া'—ধর্মের চরিত্র এবং অহেতুকআনন্দ—রসিক চরিত্র কল্পনার মূলে এই মর্মবাদী শিল্প-দার্শনিকের সংস্কারই সক্রিয়।

রবীন্দ্র-মানসের আলোচনা এই পর্যন্তই যথেষ্ট। এই মানসের উৎস থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনার নির্ঝর উৎসারিত হয়েছে। সুতরাং এই মনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়লেই রবীন্দ্র-নাটকের রূপ-রসের প্রকৃতি সহজেই বুঝা যাবে।

———

রবীন্দ্র-রচনা

বৎসর	কাব্য ও গান	নাটক নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধ-পত্রাদি
১৮৭৬	×	×	×	×	ভুবনমোহিনী-প্রতিভা অবসর-সরোজিনী
১৮৭৮	কবিকাহিনী (৫ই নবেম্বর)	×	×	×	×
১৮৮০	বনফুল (৯ই মার্চ্চ)	×	×	×	×
১৮৮১	ভগ্নহৃদয়	**বাল্মিকী-প্রতিভা** (ফেব্রুয়ারী) **রুদ্রচণ্ড** (২৫শে জুন)	×	×	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (২৫ অক্টোবর)
১৮৮২	সন্ধ্যাসঙ্গীত (৫ই জুলাই)	**কালমৃগয়া** (৫ই ডিসেম্বর)	×	×	×
১৮৮৩	প্রভাত সঙ্গীত (বৈশাখ)	×	×	বৌঠাকুরাণীর হাট (১১ জানুয়ারী)	বিবিধ প্রসঙ্গ ১১ সেপ্টেম্বর
১৮৮৪	ছবি ও গান (ফাল্গুন)	**নলিনী** (১০মে)	×	×	×

বৎসর	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধ প্রভৃতি
১৮৮৪	শৈশব সঙ্গীত (২৯শে মে) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১লা জুলাই)	প্রকৃতির প্রতিশোধ (২৯শে এপ্রিল)		+	
১৮৮৫	রবিচ্ছায়া (গান) (বৈশাখ)	+	+	+	রামমোহন রায় (১৮ই মার্চ) (আলোচনা) (১৫ এপ্রিল)
১৮৮৬	কড়ি ও কোমল (১৭ই নবেম্বর)	+	+	+	+
১৮৮৭	+	+	+	রাজর্ষি (১৯ ফেব্রুয়ারী)	চিঠিপত্র (২ জুলাই)
১৮৮৮	+	মায়ার খেলা	+	+	সমালোচনা (২৬শে মার্চ)
১৮৮৯	+	রাজা ও রাণী (২৫শে শ্রাবণ)	+	+	+
১৮৯০	মানসী (১০ পৌষ ১২৯৭)	বিসর্জন (রাজর্ষি-অবলম্বনে) ২রা জ্যৈষ্ঠ	+	+	মন্ত্রি-অভিষেক (২ জ্যৈষ্ঠ)
১৮৯১	+	+	+	+	য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী (১৬ই বৈশাখ)

বৎসর	**কাব্য ও গান**	**নাটক-নাটিকা**	**গল্প**	**উপন্যাস**	**প্রবন্ধাদি**
১৮৯২	+	**চিত্রাঙ্গদা** ২৮শে ভাদ্র **গোড়ায় গলদ** (৩০ ভাদ্র)	+	+	+
১৮৯৩	গানের বহি ও (বাল্মীকি প্রতিভা)	+	+	+	য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি (২য় খণ্ড) ৮ই আশ্বিন
১৮৯৪	সোনার তরী (২রা জানুয়ারী)	**বিদায় অভিশাপ**	ছোট গল্প (১৫ই ফাল্গুন) বিচিত্র গল্প (৫ই অক্টোবর) কথা চতুষ্টয় (৫ই অক্টোবর)	×	×
১৮৯৫	+	×	গল্প দশক (৩০ আগষ্ট)	×	×
১৮৯৬	চিত্রা (ফাল্গুন) চৈতালি নদী (২২ মাঘ) * কাব্য গ্রন্থাবলী (চৈতালি-মালিনী)	**মালিনী**	+	+	+

বৎসর	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধাদি
১৮৯৭	×	বৈকুণ্ঠের খাতা (চৈত্র)	+	+	পঞ্চভূত (১২মে)
১৮৯৯	কণিকা (৪ অগ্রহায়ণ)	×	+	+	+
১৯০০	কথা (১লা মাঘ ১৩০৬) কাহিনী কল্পনা (বৈশাখ ১৩০৭) ক্ষণিকা (২৬শে জুলাই)	+	গল্পগুচ্ছ (১ম) (১লা আশ্বিন ১৩০৭)	+	ব্রাহ্মোপনিষদ (৭ মাঘ)
১৯০১	নৈবেদ্য (আষাঢ় ১৩০৮)	+	গল্প ৪ মার্চ	×	ব্রহ্মমন্ত্র ৮ই মাঘ ঔপনিষদ ব্রহ্ম (শ্রাবণ) বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা (১৩০৮)
১৯০৩	কাব্য-গ্রন্থ (মোহিত সেন সম্পাদিত— ১—৯)	×	কর্মফল (২২শে ডিসেম্বর)	চোখের বালি ৫ই এপ্রিল	×

	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধাদি
১৯০৪	* রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদীর উপহার) ২৯ আগষ্ট	×	×	×	×
১৯০৫	বাউল (গান) (৩০ সেপ্টেম্বর) স্বদেশ (কবিতা) (২৭ সেপ্টেম্বর)	×	×	×	× আত্মশক্তি (আশ্বিন)
১৯০৬	খেয়া ১৮ই আষাঢ়	×	×	নৌকাডুবি (২রা সেপ্টেম্বর)	ভারতবর্ষ ১৫ই ফেব্রুয়ারী
১৯০৭		হাস্যকৌতুক (শারাড) ব্যঙ্গ কৌতুক (প্রবন্ধ-নাট্য)	×	×	বিচিত্র প্রবন্ধ চারিত্র পূজা প্রাচীন সাহিত্য সাহিত্য লোক সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য
১৯০৮	কথা ও কাহিনী (১০ই সেপ্টেম্বর) গান (২০ সেপ্টেম্বর)	প্রজাপতির নির্বন্ধ ২৬ যেব্রুয়ারী শারোদোৎসব (২০ সেপ্টেম্বর) মুকুট (৩১ ডিসেম্বর)	×	×	পাটনা সম্মিলনী তে সভাপতির অভিভাষণ। রাজা-প্রজা সমূহ স্বদেশ সমাজ শিক্ষা

	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধাদি
১৯০৯	* চয়নিকা	প্রায়শ্চিত্ত	×	×	শব্দতত্ত্ব *
	গান				ধর্ম
	শিশু	বৈশাখ			শান্তিনিকেতন
					(১ম-৮ম)
					বিদ্যাসাগর চরিত
১৯১০	গীতাঞ্জলি	রাজা	+	গোরা	শান্তিনিকেতন
		১৯১০		১লা ফেব্রুয়ারী	(৯ম-১১শ)
	(৩১ শ্রাবণ)	(পৌষ)	আটটি গল্প	+	শান্তি-নিকেতন
১৯১১	+	+	(চয়ন)		(১২শ-১৩শ)
১৯১২	চৈতালি	ডাকঘর	গল্প চারিটি	+	ধর্মের অধিকার
		অচলায়তন			
					জীবনস্মৃতি
					ছিন্নপত্র
১৯১৩	+	+	+	+	—
১৯১৪	স্মরণ	+	+	+	—
	উৎসর্গ				
	গীতিমাল্য				
	গান				
	গীতালি				
	ধর্মসঙ্গীত				
১৯১৫	* কাব্য-গ্রন্থ	×	×	×	শান্তিনিকেতন
	(ইণ্ডিয়ান প্রেস				(১৪শ ভাগ)

	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধাদি
১৯১৬	বলাকা	ফাল্গুনী	গল্প-সপ্তক	ঘরে-বাইরে চতুরঙ্গ	শান্তিনিকেতন (১৫শ-১৭শ) সঞ্চয় পরিচয়
১৯১৭	×	×	×	+	কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম (২২০ আগষ্ট)
১৯১৮	পলাতকা (অক্টোবর)	গুরু (অচলায়তন)	+	+	+
১৯১৯		+	+	+	জাপান যাত্রী (শ্রাবণ)
১৯২০	+	অরূপরতন (রাজা)	পয়লা নম্বর	+	+
১৯২১		ঋণশোধ (শারদোৎসব)	+	+	শিক্ষার মিলন (১৪ই আগষ্ট)
১৯২২	শিশু ভোলানাথ	মুক্ত ধারা	লিপিকা (স্বর্গ-মর্ত্ত্য- নাটিকা অন্তর্ভুক্ত)	+ +	+
১৯২৩	+	বসন্ত (গীতিনাট্য)	+	+	+
১৯২৪	+	+	+	+	+
১৯২৫	পূরবী প্রবাহিনী (গান) গীতিচর্চা	গৃহ প্রবেশ	+	+	সঙ্কলন ৯ই আগষ্ট

	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধাদি
১৯২৬	+	চিরকুমার সভা	+	+	+
		শোধবোধ			
		নটীর পূজা			
		* ঋতু উৎসব			
		(নাট্য সংগ্রহ)			
		রক্তকরবী			
১৯২৭	লেখন	ঋতুরঙ্গ	+	+	+
	(কবিতা-কণা)	(গীতিনাট্য)			
১৯২৮		শেষরক্ষা	+	+	+
		(গোড়ায় গলদ)			
১৯২৯	মহুয়া	পরিত্রাণ		যোগাযোগ	যাত্রী
		(প্রায়শ্চিত্ত)		শেষের কবিতা	
		তপতী			
		(রাজা ও রাণী)			
১৯৩০	+	+		+	ভানুসিংহের
					পত্রাবলী
১৯৩১	বনবাণী	নবীন			রাশিয়ার
	গীতবিতান	(গীতিনাট্য)			চিঠি
	(১—২)	শাপ মোচন			
	* সঞ্চয়িতা				
১৯৩২	গীতবিতান (৩)	কালের যাত্রা	+	+	Mahatmaji
	পরিশেষ				and the
					depressed
	পুনশ্চ				Humanity

	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধাদি
১৯৩৩	বিচিত্রিতা	**চণ্ডালিকা**		দুই বোন	বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ
		তাসের দেশ			শিক্ষার বিকিরণ
		বাঁশরী			মানুষের ধর্ম
					ভারত পথিক
					রামমোহন রায়
১৯৩৪	+	**শ্রাবণগাথা**	+	মালঞ্চ	+
		(গীতিনাট্য)		চার অধ্যায়	
১৯৩৫	শেষ সপ্তক	+	+	+	শান্তিনিকেতন
	বীথিকা				
					(১ম+২য়)
					সুর ও সঙ্গতি
					(পত্রালাপ)
১৯৩৬	পত্রপুট	**চিত্রাঙ্গদা**	+	×	ছন্দ
	শ্যামলী	(নৃত্যনাট্য)			জাপানে-পারস্যে
					শিক্ষার ধারা
					সাহিত্যের পথে
					পাশ্চাত্য ভ্রমণ
					প্রাক্তনী (অভিভাষণ)
১৯৩৭	খাপছাড়া	+	সে	+	কালান্তর
	ছড়ার ছবি				বিশ্বপরিচয়

	কাব্য ও গান	নাটক-নাটিকা	গল্প	উপন্যাস	প্রবন্ধাদি
১৯৩৮	প্রান্তিক সেঁজুতি	চণ্ডালিকা (নৃত্যনাট্য) মুক্তির উপায়	+	+	পথে ও পথের প্রান্তে পত্রধারা (১ম-৩য় খণ্ড) বাংলা ভাষার পরিচয়
১৯৩৯	প্রহাসিনী আকাশ প্রদীপ *রবীন্দ্র রচনাবলী (১ম+২য়)	শ্যামা	+	+	পথের সঞ্চয় প্রসাদ
১৯৪০	নবজাতক সানাই রোগশয্যায় *রচনাবলী (৩য়) ঐ (৪র্থ) ঐ (৫ম) ঐ (অচলিত সংগ্রহ)	+	তিন সঙ্গী	+	ছেলেবেলা চিত্রলিপি (ছবি)
১৯৪১	আরোগ্য জন্মদিনে *রচনাবলী (৬ষ্ঠ) ঐ (৭)	+	গল্প সল্প	×	সভ্যতার সংকট আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

[১৩৪৮ ২২শে শ্রাবণ— মৃত্যু—]

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

*রচনাবলী (৮ম) স্মৃতি

ছড়া + + × ×

শেষ লেখা

*রচনাবলী

(অচলিত ২য়)

" (৯ম)

১৯৪২ রবীন্দ্র × + — চিঠিপত্র

রচনাবলী (১০-১৩) ১ম+২য়+৩য়

আত্ম-পরিচয়

১৯৪৩ রবীন্দ্র সাহিত্যের স্বরূপ

রচনাবলী-(১৪)

ঐ (১৫)

" (১৬)

১৯৪৪ রচনাবলী (১৭, ১৮) চিঠিপত্র (৪)

১৯৪৫ স্ফুলিঙ্গ — — — চিঠিপত্র (৫)

রচনাবলী (১৯-২০)

১৯৪৬ রচনাবলী (২১-২২)

১৯৪৭ সঞ্চয়ন — — —

রচনাবলী (২৩-২৪)

১৯৪৮ মুক্তির উপায় — — মহাত্মা গান্ধী

রচনাবলী (২৫, ২৬)

১৯৫০ গীতিবিতান — — — —

(৩) লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য

১৯৫০ বৈকালী — — — বিশ্ব-ভারতী

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

১৯৫১ চিত্রলিপি (২)

সমবায়নীতি

১৯৫৪ চিত্রবিচিত্র — — —

সংকলিতা (১ম—২য়)

১৯৫৫ সংকলিতা — — — ইতিহাস

১৯৫৬ — — — — বুদ্ধদেব

রবীন্দ্র-নাট্যের ধারা

[নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা চাই
—('ভগ্নহৃদয়'-এর ভূমিকা)]

১। **বাল্মীকি-প্রতিভা** (১০৮১, ফেব্রুয়ারী)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য-রচনা—বাল্মীকি-প্রতিভা। যে বাহ্য-প্রেরণার তাগিদে তিনি এইনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন তা' কোন রঙ্গমঞ্চের চাহিদা নয়, তা' হ'চ্ছে একটি বিশেষ আনন্দানুষ্ঠানের চাহিদা—'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র চাহিদা। ১২৮১ সালের ৬ই বৈশাখ এই সভা স্থাপিত হয় এবং স্থাপিত হয় রবীন্দ্রনাথদের বাড়ীতেই। সভার প্রথম অধিবেশন থেকেই আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা'তে গান এবং আবৃত্তি বিশেষ স্থানলাভ করে। তা'তে শুধু যে গীতরসের আয়োজন থাকে তা' নয়, প্রথম অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরু-বিক্রম' নাটকের উদ্দীপনা-পূর্ণ অংশ আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়, অর্থাৎ নাট্যরসের পিপাসা মেটানোর আয়োজনও কিছুটা করা হয়। এই আয়োজনেরই বিশেষ পরিণতি—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয়।

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষ্যে, বাল্মীকি-প্রতিভার বিষয়বস্তু, বিষয় হিসাবে খুবই উপযুক্ত। বাল্মীকির কবিত্বলাভ শুধু তো একা বাল্মীকিরই কবিত্বলাভের কথা নয়, প্রত্যেক মহাকবির কবিত্বলাভের মূল রহস্যটিও তা'তে ব্যক্ত হ'য়েছে—অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সংকেতিত হ'য়েছে—প্রকাশতত্ত্বের মূল রহস্যটিও। শিল্পসৃষ্টির মূলতত্ত্ব ব'লে যদি কিছু থেকে থাকে তা' হ'চ্ছে প্রকাশতত্ত্ব এবং তারও আগে আছে—স্রষ্টার হৃদয়ের অপার সমবেদনা—

গভীর সংবেদনশীলতা—এক কথায় "করুণা।" এইভাবে দেখলেই অবশ্য, বলা চলে সৃষ্টির মূল উৎসই হ'চ্ছে—"করুণা।" এই করুণা থেকেই জাগে প্রকাশের আবেগ এবং তারই পরিণতি দেখা যায় বিভিন্ন সৃষ্টিতে। এই 'প্রকাশতত্ত্ব'কে রবীন্দ্রনাথের আগেই কবি বিহারীলাল, বাল্মীকি-কাহিনীর আশ্রয়ে, সারদা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। সেখানেও গানের সুরে সুরে বাল্মীকির কবিত্বলাভের কাহিনী রূপ দেওয়া হ'য়েছে। তখনকার বিদ্বজ্জনের কাছে কবি বিহারীলালের সারদা-মঙ্গল অতি আদরের এবং সম্ভ্রমের সামগ্রী। সুতরাং তার বিষয়বস্তু যে সকলেরই কাছে সমাদর পাবে এতে কোন ভুল নেই। তারপর গীতিপ্রাণ রবীন্দ্র-নাথের ধাতের সঙ্গেও গীতিময় সারদা-মঙ্গলের বিষয়টির বেশ যোগ আছে। অধিকন্তু একাধারে কাব্য-দর্শন এবং গভীর জীবনদর্শন ব্যক্ত করার এমন সুযোগও খুব কম কাহিনীতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাল্মীকি-প্রতিভার বিষয়বস্তুটি খুব উপযুক্ত ব'লেই বিবেচিত হবে, এমন অনুমান করতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না।

নাটকখানির জাতি-প্রকৃতি ও রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলার আগে, প্রথমেই নাট্যের ভাববস্তুর তাৎপর্য সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নিতে চাই। আগেই বলেছি, যা'তে রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হওয়া বর্ণিত হ'য়েছে সেই কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ কাব্য-দর্শন এবং জীবনদর্শন ব্যক্ত করার মস্ত একটা সুযোগ পেয়েছেন। এই দুই দর্শনের তত্ত্বের সংযোগে নাটকের 'ভাববস্তু, গঠিত হ'য়েছে। নাটকের বহিরঙ্গে রয়েছে—বাল্মীকির কবিত্বলাভ অর্থাৎ কাব্য-দর্শন, এবং অন্তরঙ্গে আছে—যদিও অস্ফুটাকারে—অপ্রকৃতিস্থ আত্মার স্বভাবহানিজনিত ক্ষয়ক্ষতির অন্ত-র্গূঢ় বেদনা এবং স্বভাবে-ফিরে-যাওয়ার আকুল আর্তি এবং স্বভাব-প্রাপ্তির প্রশান্তি। বহিরঙ্গে যে শিল্প বা কাব্যদর্শন ব্যক্ত হ'য়েছে তা' এই, যে প্রত্যেক মহাকবি-প্রতিভার মূলেই রয়েছে—গভীর সমবেদনা। [স্মরণীয় :

—(অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাঁহারে দেন তাঁর বক্ষে বেদনা অপার) (ভাষা ও ছন্দ)]। এই বেদনারই অপর নাম করুণা—জাগ্রত চিত্তের স্পর্শ-কাতরতা। যে চিত্ত এই মহাসম্পদ থেকে বঞ্চিত, সেই তো অভিশপ্ত—অলৌকিক আনন্দসৃষ্টির মহাসৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। রিপুর বশীভূত হ'য়ে মানুষের অহংকার বিকৃত হ'য়ে উঠে, মানুষ স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়; তার বুদ্ধি হয় বিকৃত, হৃদয় হয় শুষ্ক—নিষ্ঠুর। এইভাবে স্বভাবকে অস্বীকার ক'রে সে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা করে চলে। তারপর যেদিন সে হিসাব-নিকাশ করতে যায়, সেদিন দেখে জীবনের জমার ঘরে এক মহাশূন্য পড়ে আছে। করুণাহীন শুষ্ক-হৃদয়ে সমবেদনার স্থান নেই, সৃষ্টিরও সম্ভাবনা নেই। তাই তো মহাকবিপ্রতিভা করুণাময়ী সারদারই কৃপাতে লাভ করা যায়। করুণারূপেই তিনি কবি-চিত্তে আবির্ভূত হন এবং কবি-চিত্তে প্রকাশের অপার বেদনা সৃষ্টি করেন। সমস্ত সৃষ্টিরই মূলে রয়েছে অলৌকিক আনন্দ প্রকাশের আবেগ। লক্ষ্মীর সঙ্গে অর্থাৎ আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে কবি-কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কবিরা সারদার উপাসক, লক্ষ্মীর উপাসক ন'ন। সারদা হ'চ্ছেন প্রকাশের তথা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আর লক্ষ্মী হচ্ছেন—ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—প্রয়োজনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কবি শিল্পদর্শনের এই মূলতত্ত্বটি জ্ঞাতসারেই করুন আর অজ্ঞাতসারেই করুন—অস্ফুটাকারে, এখানে ব্যক্ত করেছেন। এই ভাববীজ থেকেই পরবর্ত্তীকালে কবির শিল্পদর্শন গড়ে উঠেছে—এ অনুমান একেবারে অমূলক নয়।

দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকি-প্রতিভা নাটকে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনগত প্রধান একটি ধারণা অস্ফুটাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ধারণাটী এই—বিকৃত অহংকারের বশে মানুষ স্বভাবকে যতোই আচ্ছন্ন করুক—যতো-ভাবেই হনন করুক, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারা পর্যন্ত, তার আত্মার

শাস্তি দেই—মুক্তি নেই। একদিন না একদিন আত্মা প্রকৃতিস্থ হবেই—যে ভাবেই হোক তার ভারসাম্য সে রক্ষা করবেই! স্বধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হলে প্রকৃতি কিছুতেই শান্ত হতে পারে না।

জীবনের বড়ো ট্র্যাজেডি এখানেই—সামঞ্জস্যের মারাত্মক অভাবের মধ্যেই—জাগ্রত চিত্তের স্বভাব হারানোর বেদনায়, নৈরাশ্যে এবং অন্তর্বিক্ষোভে। স্বভাবকে ফাঁকি দেওয়ার ফাঁকি যেদিন ধরা পড়ে সেদিন বাল্মীকির মতোই আত্মা আর্তনাদ করতে থাকে—

"জীবনের কিছু হল না হায়। হল না গো হল না হায় হায়
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে?...
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না..."

প্রকৃতির প্রতিশোধই মারাত্মক প্রতিশোধ। সমস্ত জমার অঙ্ক যখন শূন্যে পরিণত হয়ে যায়, তখনকার সেই শূন্য হৃদয়ের নৈরাশ্যের চাপের চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না। এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চরিত্র সৃষ্টিতে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে।

তৃতীয়তঃ এই নাটকেই, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা বিশেষতঃ উপাসনা-সংক্রান্ত একটা বিশেষ সংস্কার—অর্থাৎ সাকার এবং শাক্ত-উপাসনা বধির উপর বিরাগ, পরিস্থিতি-কল্পনার মাঝ দিয়ে, সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে! 'বাতায়নিকের পত্রে' এবং 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে, শক্তি-সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যা বক্তব্য তা বলেছেন এবং এই কথাই মনে রাখতে বলেছেন—"দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। (শক্তিপূজা-১৩২৬)। এই জাতীয় উপসনাকে উপাসনার বিকৃতি ব'লেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। কারণ, প্রকৃত ধর্ম-সাধনায় হিংসার স্থান—সংকীর্ণ মনের স্থান—তামসিক আচারণের স্থান

থাকতে পারে না। তাঁর ধারণা—যাঁরা অন্তরে অন্তরে বিকৃতির ও নিষ্ঠুরতার উপাসক, তাঁরাই নিষ্ঠুর দেবতার রুদ্র উপাসনার মাঝ দিয়ে বিকৃত বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করতে চেষ্টা করেন। ধর্মসাধনাকে তাঁরা কার্যসিদ্ধির উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেন।

এই সংস্কার বশেই রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে কালী-উপাসক, রুদ্রচণ্ডকে কাল-ভৈরবের উপাসক, এবং রঘুপতিকে কালী উপাসক রূপে কল্পনা করেছেন। বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনী নেই। কৃত্তিবাসে রত্নাকর কালী উপাসক নন। বিহারীলালের বাল্মীকিও কালী উপাসক নন। 'কালী'-উপাসক—বাল্মীকির কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা। কেন এই কল্পনা, তা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য প্রতিমা-পূজার প্রতি বিরাগ ব্রাহ্ম-সত্তার মধ্যে ভেতরে ভেতরে কাজ করেছে বলেই এমন কল্পনা করেছেন কি না, সে সম্বন্ধে হাঁ বা না জোর করে কিছুই বলা চলে না। তবে একথা বলতেই হবে—নিছক প্রতিমা বিরাগ ব'লে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। ভুল হবে এই কারণেই যে রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চতর ধর্মদর্শনের স্তরে দাঁড়িয়ে এই কাজটী করেছেন কিছুতেই তাঁকে নিন্দা করা চলেনা।

এই নাটকেই রবীন্দ্র-মানসের আর একটি সংস্কারের বীজ লক্ষ্য যায়। সংস্কারটি এই—প্রাণের স্পর্শেই প্রাণ জাগে। কোমলের স্পর্শেই কঠোর প্রাণে কোমলতার উৎস-মুখ অবারিত হয়—করুণার উত্তাপেই পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়—পাষাণের বাঁধ ভেঙ্গে যায়—হৃদয় তার স্বধর্মকে ফিরে পায়। এই করুণার প্রতিনিধি কখনো আসে নিরুপায় করুণ বালিকা মূর্ত্তিতে, কখনো আসে প্রীতিময়ী কুমারী মূর্ত্তিতে, কখনো বা আসে প্রেমময়ী নারী-মূর্ত্তিতে। বাল্মীকি প্রতিভার 'বালিকা' চরিত্রটি নানা রূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে দেখা দিয়েছে। রুদ্রচণ্ডে এই বালিকাকে পাওয়া যায় রুদ্রচন্দ্রের কন্যা 'অমিয়া'র মধ্যে—রুদ্রচণ্ডের জীবন সাধনার বিপরীত কোটির আদর্শের প্রতিনিধি হিসাবে; প্রকৃতির প্রতিশোধের

মধ্যে—"বালিকা"র রূপে; "রাজা ও রাণী'র মধ্যে ইলার চরিত্রে; বিসর্জ্জন-নাটকের' অপর্ণা'র রূপে "রক্তকরবী"র 'নন্দিনী'র রূপে। বিকৃতকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য—রবীন্দ্রনাথ এই রীতি অনেকক্ষেত্রেই অবলম্বন করেছেন। আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাক। ভূমার চেতনা—সে চেতনা যত অস্পষ্টই হোক—উপনয়নের পর থেকেই গায়ত্রীমন্ত্র ধ্যান করার অভ্যাস থেকে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দেয়। সমগ্র বিশ্বের মূলে সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখা এবং বিশ্বের সমগ্র প্রকাশকে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দের প্রকাশ-লীলা স্বরূপে দেখা—আনন্দের ছন্দোলীলা রূপে প্রত্যক্ষ করা—এই ভূমা চেতনারই অনিবার্য পরিণতি। এখানে বাল্মীকির উক্তির মধ্যে—আনন্দময় ছন্দোময় প্রকাশের তত্ত্বটি, অস্ফুটাকারে হলেও, প্রকাশিত হয়েছে। সরস্বতীর করুণা-প্রসাদে বাল্মীকির দৃষ্টিতে আনন্দের এই মহাপ্রকাশের রূপটি প্রতিভাত হয়েছে। বাল্মীকি এই বিরাট প্রকাশলীলা সাক্ষাৎকার করেছেন বলেই এবং বিশ্বের মহাচ্ছন্দে যোগ দেওয়ার আনন্দ লাভ করেছেন বলেই, লক্ষ্মীর-দেওয়া অনিত্য ঐশ্বর্য্যের সুখকে উপেক্ষা করতে পেরেছেন। নাটকের ভাববস্তু সম্বন্ধে এক্ষেত্রে এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

এবার নাটকখানির রীতি এবং জাতি সম্বন্ধে দু'একটি বলা যাক। রবীন্দ্রনাথ নাটককে বলেছেন—"ফুলের গাছ" অর্থাৎ নাটকে শুধু ভাবের ফুল ফুটালেই—ভাবের ফুলের মালা গাঁথলেই চলবে না; নাটকে ভাবের ফুল যা ফুটবে তা' ফুটবে জীবনের রূপের গাছেই। জীবনবৃত্তের জন্য যেটুকু ভাব আবশ্যক বা অপেক্ষিত সেইটুকু ভাবই নাটকে থাকতে পারে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবনের যে সম্ভাব্য অভিব্যক্তি, তার মুখাপেক্ষী হ'য়েই ভাবকল্পনাকে সংযত হ'য়ে থাকতে হবে। সম্ভাব্যের মাত্রা কম পড়লেও যেমন দোষ, তেমনি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও দোষ। জীবনের রূপকে উপেক্ষা করে ভাব-কল্পনা যেখানে উদ্দাম

হ'য়ে উঠে—নাট্যকার ভাবের জন্যই ভাবের তানবিস্তার করতে যেতে উঠেন, সেখানেই যে পরিমাণে জীবনের রূপ আচ্ছন্ন হয় সেই পরিমাণেই নাটক 'দৃশ্যাকারে কাহিনী-কাব্য' হ'য়ে উঠে। "ভগ্নহৃদয়" নাট্যাকারে লেখা হ'লেও ঐ একটিমাত্র কারণেই 'কাব্য' হ'য়ে আছে। নাটকের পদবীতে উঠতে পারেনি। ভগ্নহৃদয় "ফুলের মালা" হ'য়েছে "ফুলের গাছ" হ'তে পারেনি।

'জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ, হ'য়ে উঠাই নাটকের একমাত্র লক্ষ্য। এরই জন্যে চাই—উপযুক্ত পরিস্থিতি-কল্পনা এবং সেই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-সম্পর্কের বিচিত্র বিন্যাস এবং তার মাঝ দিয়ে ভাবাভিব্যক্তি তথা রসনিষ্পত্তি। প্রত্যেক দর্শক-পাঠকের মনেই এই 'রূপের' কোন-না-কোন-কিছু ধারণা আছে। অভিজ্ঞতার তারতম্যের ফলে ঐ ধারণার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়ে থাকে। পার্থক্য যাই থাক, ধারণা যে একটা থাকেই—এইটেই বড় কথা। কারণ এই ধারণা দিয়েই রূপের যাথাযথ্যের মূল্য বিচার করা সম্ভব।

নাটকে আমরা জীবনের প্রত্যক্ষকল্প রূপ চাই বলেই, রূপ-বাস্তবতার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি নাটকের ক্ষেত্রে প্রবল। প্রথার কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রকাশ-রীতিকে ছন্দের স্তরেই নিয়ে যাক বা সুর-লোকেই টেনে তুলুক রূপ-বাস্তবতার টান কোন-না-কোন ভাবে সেখানেও কাজ করে। এই রূপ-বাস্তবতার চাহিদার টানেই তো নাটকের প্রকাশরীতি—সুরলোক থেকে ছন্দোলোকে এবং ছন্দোলোক থেকে গদ্য-লোকে নেমে আসতে বাধ্য হ'য়েছে। সর্বাঙ্গীণ বাস্তবিকতার চাহিদার চাপেই নাটককে রূপে-রসে সর্বতোভাবে বাস্তব হওয়ার দিকে এগিয়ে আসতে হ'য়েছে। শুধু বিষয়বস্তুতে বাস্তবধর্মী হওয়াই আজ নাটকের পক্ষে যথেষ্ট নয়, রূপ-কল্পনাতেও অর্থাৎ ঘটনা-বিন্যাসে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, ভাবে-ভাষায় সব বিষয়েই তার বাস্তবধর্মী হওয়া চাই। তবেই আসবে সর্বাঙ্গীণ বাস্তবতা।

কিন্তু এই জাতীয় সর্বাঙ্গীণ বাস্তবতা সব জাতের নাটকে পাওয়া যায় না। নাটকের সংলাপ যেখানে গদ্যময় না হ'য়ে পদ্যময় বা সুরময় হয়, সেখানে যথার্থ **বাচনিক বাস্তবতা** পাওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় লোকে যখন কথা বলে তখন সুরে বা ছন্দে কথা বলে না। সুতরাং গীতি-নাট্যে বা কাব্যিক নাট্যে—বাচনিক বাস্তবতা যথাযথ রূপে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই, তা'তে এই জাতীয় বাস্তবতার প্রত্যাশাও আমরা করি না। কিন্তু তা'ই বলে অর্থাৎ গদ্য সংলাপের প্রত্যাশা না থাকলেও, বাস্তবিকতার (অব্‌জেক্‌টিভিটি) প্রত্যাশা একেবারেই থাকে না, এ কথা বলা চলে না। গীতি-নাট্যই হোক, আর কাব্যিক নাট্যই হোক, প্রকাশের মাধ্যমে নাটকীয় সংলাপের বিশেষ ধর্মটি অবশ্যই থাকা চাই। এ কথা সত্য বটে, সংলাপের স্থান যেখানে গান বা ছন্দোময় প্রকাশ-রীতি অধিকার করে—সেখানে পরিপাটি বাস্তবিকতা থাকতে পারে না, কিন্তু সমুচিত ভাবাভিব্যক্তির সম্ভাব্য রূপটি থাকতে না পারে এমন নয়। গীতি-নাট্যে বা কাব্যিক নাট্যে ভাবাভিব্যক্তির এই সম্ভাব্য নাটকীয় রূপটি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি এবং সেই রূপের ঘোলের মধ্যেই বাস্তবিকতার দুধের আশা মেটাতে পারি। অতএব, নাটকীয় হ'তে হ'লে সংলাপকে যে যে গুণের অধিকারী হ'তে হবে,—গীতিনাট্যের সংলাপ—গানকে এবং কাব্যিক নাট্যের সংলাপ ছন্দোময় বাক্যকেও, সেই সেই গুণের অধিকারী হ'তে হবে। গীতি-নাট্যের গান-যোজনা বা কাব্যিক নাট্যের কবি-কল্পনার ঔচিত্য বিচার করবার সময় এ কথাটি মনে রাখতেই হবে। মনে রাখতে হবে—ঔচিত্যবিচারের অন্য কোন উপায় নেই।

বাল্মীকি-প্রতিভা বিশুদ্ধ একখানি গীতি-নাট্য। বিশুদ্ধ বললাম এই কারণে যে এর মূল নাটকীয় অংশে গীতি ছাড়া অন্য কোনরূপ অর্থাৎ পদ্য বা গদ্য সংলাপ নেই। শুধু সরস্বতীর শেষ উক্তিটি পদ্যে গ্রথিত

এবং আবৃত্তির জন্যে রচিত। নাটিকাখানি রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যরচনা এবং অপরিস্ফুট রচনা। বাল্মীকির ভাবদ্বন্দ্বের এবং ভাবান্তরের রূপটি তেমন গভীর রেখায় ফুটে উঠেনি। তবে উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়—কবির কল্পনা-শক্তির সম্ভাবনাটি এখানেই বেশ টের পাওয়া যায়। করুণ রাগিণীর প্রভাব বর্ণনা করতে কবি কল্পনা করেছেন—

"অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে
চারিদিকে দিগ্‌বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা
অমনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা"—এ কল্পনা

অবশ্যই উদার কল্পনা।

কবির দ্বিতীয় নাট্যরচনা- **"রুদ্রচণ্ড"** (১৮৮১, ২৫শে জুন)।

রুদ্রচণ্ড নাটিকা সম্বন্ধে কোন কথা বলার আগে নাটকাকারে-লিখিত-কাব্য "ভগ্নহৃদয়'কে (২৩শে জুন—১৮৮১) নাটকের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সামান্য একটু কৈফিয়ৎ দিয়ে নেওয়া দরকার। অবশ্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ কবি নিজেই ভগ্নহৃদয়কে কাব্যের পংক্তিতে স্থান দিয়ে গেছেন এবং কেউ যাতে রূপ দেখেই ভুল না করে সে বিষয়েও সতর্ক করে গেছেন। কিন্তু আমরা যারা রূপ দেখে ভুলতে অভ্যস্ত তারা কবির 'নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে'—এ সতর্কবাণী মানতে চাইনি। কেউ কেউ "ভগ্নহৃদয়"-কে গীতি-নাট্যের পংক্তিতে স্থান করে দিয়েছেন। কেউ কেউ নাট্যাভ্যাস-রূপে তাকে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন। কবির রসবোধের ওপর আস্থা রেখেই আমি 'ফুলের তোড়া'কে "ফুলের গাছ" বলতে অনিচ্ছুক। কবির কথাই ঠিক—ভগ্নহৃদয় শুধু আকৃতিতেই নাটক, প্রকৃতিতে কাব্য। 'উক্তি-প্রত্যুক্তি'-রীতি এবং উপস্থাপনার প্রত্যক্ষকল্পত্ব (directness) দৃশ্যকল্পত্ব তথা নাটকের আভাস থাকা সত্ত্বেও, ভগ্নহৃদয় কাব্য। 'সর্গের'

স্থলে 'দৃশ্য' কথাটা বসালেও এই সিদ্ধান্তের ইতরবিশেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

কেন ইতরবিশেষ হবে না—এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। পূর্বপক্ষ থেকে বলা যেতে পারে—নাটকে যেমন হয় তেমনি ভগ্নহৃদয়েও উক্তি-প্রত্যুক্তি-রীতি অবলম্বনে কাহিনী রচনা করা হ'য়েছে। পাত্র-পাত্রীরা কবিত্ব পূর্ণ পদ্যে, কখনও কখনও গানের সাহায্যে, মনের ভাব ব্যক্ত করেছে এবং পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের জীবনে বিশেষ বিশেষ পরিণতি দেখা দিয়েছে। তারপর, ছন্দে লেখা হ'য়েছে ব'লেও নাটক ব'লতে আপত্তি করলে চলবে না। গ্রীসের প্রাচীন নাটকগুলি, এলিজাবেথীয় যুগের বিখ্যাত নাটকগুলি—এমন কি বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলি ধর্মতঃ কাব্যিক নাটক। সুতরাং ভগ্নহৃদয়কেও নাটক না বলার হেতু কি?

এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণভাবে একটু আগেই দেওয়া হ'য়েছে। নাটককে ফুলের গাছ" কেন বলা হ'য়েছে তা' ব্যাখ্যা ক'রে বলতে গিয়েই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুর ওপর আলোকপাত করা হ'য়েছে। বলা বাহুল্য হ'লেও বলার দরকার—প্রশ্নটির সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন নাটকীয়ত্বের এবং কাব্যিকত্বের অবিরোধ অবস্থিতির রূপটি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যাবে। কাব্যিকতা কোন্ মাত্রা ছাড়ালে অনাটকীয় হয়ে পড়ে—এই প্রশ্নের সুমীমাংসা না করা পর্যন্ত, উক্ত প্রশ্নের খাঁটি উত্তর দেওয়া যাবে না। সমস্যার আসল জড় এইখানেই। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে—প্রশ্নটি নিয়ে কম জল ঘোলা করা হয়নি। সমালোচকরা (সুইনবার্ণ, এবারক্রোম্বি, উইলিয়াম আর্চার, টি, এস, এলিয়ট প্রমুখ পণ্ডিতরা) অনেকেই সমস্যার সমাধান করবার জন্য যথাসাধ্য করেছেন। একদিকে আছেন—সুইনবার্ণ, এবারক্রোম্বি প্রমুখ ব্যক্তি, যাদের মতে নাটককে কাব্য হ'তে হবে; অন্যদিকে বিপরীত পক্ষে

আছেন উইলিয়াম আর্চার—যাঁর ধারণা—নাটকে কাব্য থাকলে চলবে না—নাটক ও কাব্য সাহিত্যের দুই ভিন্ন জাতি। কাব্যের সংস্পর্শে নাটকের জাতিচ্যুতি ঘটে। টি, এস, এলিয়ট মহাশয় এ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমার মনে হয়, তদনুসারেই সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে। 'পোয়েটিক ড্রামা' সম্পর্কে আলোচনা করবার প্রসঙ্গে, তিনি শেকস্‌পীয়রের 'কাব্যিক নাটক' এবং নিজের কাব্যিক নাটকের তুলনা করে দেখিয়েছেন শেকস্‌পীয়র অনেক বড় নাট্যকার এই কারণেই যে, কাব্য ও নাটকের পূর্ণ সামঞ্জস্য তাঁর নাটকে ব্যক্ত হ'য়েছে ; তিনি কাব্যকে "এ্যাকশানে"র বাহন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং যেখানেই 'action' শেষ হ'য়েছে তার 'কাব্যিকতা'ও সেখানে শেষ হ'য়েছে। এলিয়ট মহাশয়ের মতে—নাটকে কাব্যিকতা তখনই দোষাবহ যখন 'action'-কে অতিক্রম করে 'কাব্য' আপন বিভূতি বা বাহাদুরি দেখাতে চায়। কাব্যের স্বমহিমা প্রদর্শনের মনোভাব যেখানে ব্যাপকভাবে অনাটকীয় মাত্রায় প্রকাশ পায়, সেখানেই নাটক কক্ষচ্যুত হয়ে অ-দৃশ্যকাব্যের কক্ষে প্রবেশ করে। এই সূত্র প্রয়োগ ক'রেই কাব্যিক নাটকের নাটকীয়ত্ব বিচার করতে হবে।

নাট্যরচনার সংলাপ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লেখা হ'লেও এবং পাত্র-পাত্রীর উক্তিতে কবিকল্পনার অবকাশ থাকলেও, সেই রচনা নাটক হ'তে পারে—এ কথা যেমন স্বীকার্য ; তেমনি স্বীকার্য এই কথাটিও—নাটকাকারে কাব্য এবং 'কাব্যিক নাটকের' মধ্যে আকৃতিগত ঐক্য থাকলেও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। পার্থক্য এই—"নাটকাকারে কাব্য"—জাতীয় রচনায়, কবিকল্পনা 'action' অপেক্ষা নিজেকে জাহির করতেই বেশী মত্ত থাকে, আর কাব্যিক নাটকে—কবি-কল্পনা action-এর অনুগত থাকে, action-কে অক্ষত রেখে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই নিজেকে জাহির করে।

এই কথা মনে রাখতেই হবে—নাটক হচ্ছে—'রূপক' অর্থাৎ জীবনের রূপারোপ—"imitation of life-in-action"। এই রূপারোপ যত "life-in-action"-এর কাছাকাছি পৌঁছায়—যত ক্রিয়াশীল জীবন্তকল্প অবস্থার মায়া সৃষ্টি করে, তত তা' অভিনেয় তথা নাটকীয় হয়। শেষপর্যন্ত অভিনেয়ত্বই তো নাটকের বৈশেষিক লক্ষণ। উক্তি-প্রত্যুক্তিরীতি দৃশ্যত্বের আপাত লক্ষণ মাত্র। দৃশ্যত্বের প্রকৃত লক্ষণ—অভিনেয়ত্ব। যে রচনায় নানাবস্থান্তরাত্মক জীবনের উপস্থাপিত রূপটি আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে অনুকরণ ক'রে দর্শকচিত্তে অভিপ্রেত রূপরস সৃষ্টি করার সুযোগ আছে, সেই রচনাই প্রকৃত দৃশ্য বা অভিনেয়। এ ছাড়া অভিনেয়ত্বের আর কোন লক্ষণ নেই। আর যেহেতু অভিনেয়ত্বই নাটকীয়ত্ব, নাটকীয়ত্বেরও ভিন্ন কোন লক্ষণ থাকতে পারে না।

এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে—অভিনেয়ত্বের মাত্রা কি সুনির্দ্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া সম্ভব? একটা উক্তি কত কাব্যিক হ'লে বা কত দীর্ঘ হ'লে অভিনেয় হবে না—এর মাত্রা কি বেঁধে দেওয়া যায়? এর উত্তরে এই কথাই বলা যায়—সুনির্দ্দিষ্ট বলতে যা' বোঝায় তেমনভাবে মাত্রা বেঁধে দেওয়া সম্ভব না হ'লেও মোটামুটি একটা মাত্রা অবশ্যই স্বীকার্য। কারণ তা' না করলে নাটকীয় অনাটকীয় ব'লে কোন সমস্যাই তো উপস্থিত হয় না। এখন, মাত্রা যদি একটা থাকেই, প্রশ্ন হবে, কি দিয়ে সেই মাত্রা নিরূপিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সব নির্ভর করছে। উত্তর এই-ভাবেই দিতে হবে—জীবনের মাত্রা জীবন-বোধ ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে নিরূপিত করা যেতে পারে না। সুতরাং পাত্রপাত্রীর সম্পর্কে ও আচরণে জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠছে কি না—উপস্থাপনা জীবন্তবৎ হ'চ্ছে কি না, মাত্রা-নিরূপণে এই বিচারই একমাত্র গতি। এই বিচার-আপেক্ষিকতা মুক্ত নয় বটে, কিন্তু এ ছাড়া বিচারের ভিন্ন উপায়ও নেই।

এইভাবে একটা সূত্র করা যেতে পারে—জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ এবং নাটকীয় হয় তখনই যখন পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ—কায়িক, মানসিক বাচনিক—সর্ববিধ আচরণ, স্বাভাবিক বা সম্ভাব্য রূপের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সেই আচরণ দর্শকচিত্তে ক্রমবর্ধমান কৌতূহল উদ্দীপিত রেখে অভিপ্রেত রসপরিণতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই সূত্র দিয়েই নাটকীয় অনাটকীয় বিচার করতে হবে।

কিন্তু এই সূত্র ঠিকভাবে প্রয়োগ করা খুবই কঠিন কাজ। সূত্রের ধারণা ও প্রয়োগ একটু এদিক-ওদিক হ'লেই, কত গণ্ডগোল হ'তে হ'তে পারে, "রুদ্রচণ্ড" নাটিকা সমালোচনার দৃষ্টান্ত থেকেই তা' বুঝা যেতে পারে। দৃশ্যকাব্যকে শুধু 'কাব্য' বলা বা 'নাটকাকারে কাব্য' বলা "drama"কে' 'closet drama' বলা, আসলে নিন্দাই করা। পরোক্ষভাবে এই কথাই বলা—দৃশ্যকাব্য লিখতে যিনি শুধু কাব্য লেখেন বা 'নাটকাকারে কাব্য' লেখেন, তিনি নাটক লিখতেই জানেন না। ভাল কাব্য হ'য়েছে ব'লে যত প্রশংসাই তার করা হোক, সে প্রশংসা ব্যাজস্তুতিমাত্রই—স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। বাস্তবিক "নাটকাকারে কাব্য রচনা করাই তাঁহার নাট্যিকপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য"—এ কথা বলা আর আর রবীন্দ্রনাথকে নাট্যকার না বলা, প্রায় একই কথা নয় কি? রবীন্দ্রনাথ 'নাটক' লিখেছেন, না "নাটকাকারে কাব্য" লিখেছেন—এই সমস্যার সমাধান করা রবীন্দ্র-নাটক-সমালোচকের একটি মৌলিক কর্তব্য এবং অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না ঘটাতেই, রুদ্রচণ্ড-নাটিকা সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়—"নাটিকা ছাপ থাকা সত্ত্বেও রুদ্রচণ্ড গাথা কাব্যেরই সগোত্র এবং ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা কাব্য।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার সেন)। "রুদ্রচণ্ডের ভূমিকা সুচিত্রিত, তাহাতে নাটকীয় গুণ আছে। তবু রুদ্রচণ্ড নাটক নয়, কাব্য।" (ঐ)। প্রায় এই ধরণেরই মন্তব্য পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ

ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে। 'গীতিনাট্য শব্দটিকে একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করতে চেয়ে তিনি লিখেছেন—রুদ্রচণ্ড নাটিকাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথমরচিত গীতিনাট্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য......ইহা আদ্যোপান্ত ছন্দোবদ্ধ কথোপকথন দ্বারাই পূর্ণ। সেইজন্য ইহার আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তু কাব্যের উপাদানে গঠিত হইলেও বাহ্যতঃ ইহা নাটকের লক্ষণাক্রান্ত।" এসব যে খুবই গোলমেলে কথা তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্যের ও নাটকের সম্পর্ক বা সীমারেখা ঠিকভাবে নির্দ্ধারণ না করা পর্যন্ত এই গোলমাল থাকবেই।

যা হোক অভিনেয়ত্বকে নাটকীয়ত্বের বা নাট্যধর্মের মুখ্য লক্ষণ করলে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে—রুদ্রচণ্ড নাটিকায় যথেষ্ট মাত্রায় নাট্যধর্ম আছে এবং সেই হিসাবে রুদ্রচণ্ড নাট্য-জাতিরই অন্তর্গত। তবে জাতির মধ্যেও তো প্রজাতি ভাগ আছে—উপজাতি আছে। রুদ্রচণ্ড 'কাব্যিক নাটক'—প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। নাটক হিসাবে তার দোষগুণ যাই থাক—'কাব্যিক নাটক' ছাড়া একে আর কিছুই বলা যায় না।

রুদ্রচণ্ড নাটিকা রবীন্দ্রনাথের প্রথম ট্র্যাজেডি-রসাত্মক নাট্য রচনা। ট্র্যাজেডির যে ধারণাটিকে এখানে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে বেশ অভিনবত্ব আছে। বাহ্যতঃ রচনাটি 'প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির ট্র্যাজেডি' (ট্র্যাজেডি অফ রিভেঞ্জ) বটে, কিন্তু এই বাহ্য রূপটির সঙ্গে মানব-আত্মার মহতী বিনষ্টির গভীর ব্যঞ্জনা মিশে আছে।

একটা "অহম্" জীবাত্মার স্বধর্মকে নির্জিত করে তার সমস্ত সত্তাকে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত করেছে—বিকৃতির উপাসনায় তার সমস্ত দেহ-মন অর্পণ করেছে—সমস্ত বৃত্তি বিসর্জন দিয়ে একটা প্রবৃত্তির কেন্দ্র-বিন্দুর ওপর অহংকে স্থাপিত করেছে। প্রতিহিংসাই তার ধ্যান,

প্রতিহিংসাই তার জ্ঞান। স্নেহ-মায়া-মমতাকে সে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে। হৃদয়কে শুষ্ক কঠোর করে তুলেছে। তার ধমণী একমাত্র প্রতিহিংসার তীব্র উত্তেজনার প্রবাহই কামনা করে। তার সমস্ত জীবন-রসে প্রতিহিংসার লালকণিকা ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। প্রতিহিংসার উত্তেজনাই তার সঞ্জীবনী-শক্তি। প্রতিহিংসাই জীবন, প্রতিহিংসার অভাবেই মৃত্যু। প্রতিহিংসাই তার সর্বস্ব। এই প্রতিহিংসা-সর্বস্ব অহং-এর লক্ষ্য থেকে প্রতিহিংসার পাত্রকে যেদিন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সে দিন তার সমস্ত জীবনের আকাশ জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্যে পরিণত হয়ে যায়, তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব শূন্যে পরিণত হয় এবং তার সমস্ত উত্তেজনা ক্রিয়ার অভাবে শেষ পর্যন্ত নিজের বুকেই প্রতিক্রিয়া হয়ে আঘাত হানে। স্বভাবকে বঞ্চনা করার মহতী বিনষ্টির বেদনাকে, শূন্য প্রাণের মর্ম-জ্বালাকে মৃত্যুর শীতল স্পর্শে নির্বাপিত করা ছাড়া আর কোন উপায়ই তার থাকে না। বিকৃতিবশে এরা শুধু যে নিজের জীবনেই শোচনীয় পরিণতি সৃষ্টি করে তা' নয়, অনেক নিরপরাধ জীবনকেও শোচনীয় পরিণতির আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। রুদ্রচণ্ডের জীবনেও এই পরিণতি ঘটেছে।

এই ভাববস্তুকেই রবীন্দ্রনাথ রুদ্রচণ্ড নাটিকার কাহিনীর রূপে অঙ্গদান করেছেন। তবে অঙ্গরচনা অর্থাৎ কাহিনী-পরিকল্পনা এবং রসনিষ্পত্তি সন্তোষজনক মাত্রায় পৌঁছতে পারে নি—এক কথায় অপরিস্ফুট। কাহিনী কল্পনায় রয়েছে রোমাঞ্চসুলভ কাল্পনিকতা এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে রয়েছে অপরিণত উপলব্ধি এবং অস্বাভাবিকতা।

তবে অভিব্যক্তির দিক দিয়ে যত ত্রুটিই থাক, এ কথা স্বীকার করতেই হবে—খুব অল্প বয়সেই, রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কে গভীর ট্র্যাজেডির ধারণা স্পষ্ট আকার নিয়েই দেখা দিয়েছে। যেখান থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়ে থাকুন বা যার কাছ থেকেই জীবন-রহস্যের পাঠ নিয়ে থাকুন,

বনফুলের কবি বা 'কবি-কাহিনী'র কবি, জীবনের রূপ আঁকতে গিয়ে যে জীবনরহস্যের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম থেকেই কবির সুর উচু পর্দায় বাঁধা—কবির দৃষ্টি অন্তর্লোকের অর্থাৎ আত্মার ট্র্যাজেডির কেন্দ্রে নিবদ্ধ।

তৃতীয় নাট্য—**কালমৃগয়া** (৫ই ডিসেম্বর ১৮৮২)

'বাল্মীকি প্রতিভা'র মতোই কালমৃগয়া একখানি গীতি-নাট্য এবং একই উপলক্ষে অর্থাৎ 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সম্মিলন উপলক্ষে অভিনীত। গীতি-নাট্য হিসাবে কালমৃগয়া বাল্মীকি-প্রতিভার চেয়েও বিশুদ্ধতর "সুরে নাটিকা" বা গীতি-নাট্য। প্রথম দৃশ্যের প্রারম্ভ থেকে শেষ দৃশ্যের যবনিকাপাত পর্যন্ত গান ছাড়া কোন সংলাপ নেই। এই নাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন—"বাল্মীকি প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতি নাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্য-বিষয়। তেতলার ছাদে ষ্টেজ খাটাইয়া ইহা অভিনয় হইয়াছিল—ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।" বাইরের পরিচয় এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

নাটিকাখানি করুণ রসাত্মক। রসনিষ্পত্তি সন্তোষজনক মাত্রায় ঘটেছে, তার প্রমাণও আছে—"ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।" তবে 'সুরে কথা'কে যাঁরা কথা বলে মনে করতে প্রস্তুত থাকবেন না, তাদেয় কাছে সংবেদনার মাত্রা নিশ্চয়ই খুব বেশী হবে না। নাট্য মূল্য যাই থাক, নাটিকাখানির চরিত্র-কল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বনদেবীগণ, লীলা এবং অন্ধমুনি এই তিনটি চরিত্রে রবীন্দ্র-মানসের কয়েকটি সংস্কার প্রতিফলিত

হয়েছে। বনদেবীগণ চরিত্র হিসাবে গ্রীক-কোরাসের বাংলা সংস্করণ হলেও, তারা প্রকৃতির অন্তরাত্মা—প্রকৃতির জগৎ ও মানুষের জগতের মধ্যে যে নিগূঢ় যোগ রয়েছে, সেই যোগেরই সংকেত। মানুষ তো শুধু পিতামাতারই আদরের ধন নয়, সে বিশেষ একটি পরিবারের কোলেই জন্মগ্রহণ করে না, সে প্রকৃতির কোলে—সমাজেরও কোলে জন্মগ্রহণ করে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সে যেমন হৃদয়ের যোগে যুক্ত হয়ে থাকে, তেমনি যুক্ত থাকে সমাজের সঙ্গে—দশের হৃদয়ের সঙ্গে। এখানে প্রকৃতির প্রতিনিধি—বনদেবীগণ আর সমাজপ্রকৃতির প্রতিনিধি—অহেতুক প্রীতিমাধুর্যের প্রতিনিধি "লীলা"। এই "লীলা'রই হৃদয়-মাধুর্য ডাকঘরে 'সুধা'হয়ে দেখা দিয়েছে।। বনদেবী বা লীলা শুধু তত্ত্বই নয় রসেরও পরিপোষক। এদেরই হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়ে অন্ধমুনির পুত্রশোকের আর্তনাদ বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি লাভ করেছে—একের শোক বিশ্বের শোকে 'emotion of multitude'-এ পরিণত হয়েছে। অন্ধমুনি যেমন একমাত্র পুত্রের পিতা তেমনি মুনিও বটেন। একমাত্র পুত্রের অপঘাত মৃত্যু তাঁর পিতৃ-সত্তাকে যত বিক্ষুব্ধই করুক, শেষ পর্যন্ত মুনির স্থিতধী-দৃষ্টিই জয়ী হ'য়েছ—মৃত্যুকে তিনি ভূমার আলোকে দেখে বীতশোক হ'য়েছেন।

(৪) চতুর্থ নাট্যরচনা—**'প্রকৃতির প্রতিশোধ'** (২৯শে এপ্রিল ১৮৮৪)

এই নাটকের প্রেরণা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে, যে-সব মন্তব্য আগে করা হ'য়েছে তাদের একটু উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাধীন মন্তব্য যাঁরা ক'রেছেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম এবং তা' বলাই বাহুল্য। এ সম্বন্ধে অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের এবং স্বয়ং কবির নিজের মন্তব্যই সকলে উদ্ধৃত ক'রে আসছেন। যে-কোন সমালোচনার বই খুললেই এই উদ্ধৃতিগুলি পাওয়া যাবে। রবিরশ্মি-গ্রন্থে আবশ্যক উদ্ধৃতি-

গুলি সংগ্রহ ক'রে দেওয়া আছে। সুতরাং উদ্ধৃত উদ্ধৃতি জড়ো ক'রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। যেটুকু না-হ'লে-নয়, আমি শুধু সেইটুকুই এখানে তুলে নিয়ে আমার আলোচনার পটভূমি তৈরী ক'রে নিচ্ছি। সুসমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন—"এক সময়ে যে কবির সহিত প্রকৃতির বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হইয়া তিনি বেদনা পাইতেছিলেন, সেইটা কাটিয়া গিয়া পুনরায় বিশ্বের আনন্দলোকের সঙ্গে মিলিত হইবার আত্মকাহিনীর এক অংশ এই নাটকের মধ্যে আছে।" এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় কবির নিজের এই উক্তির মধ্যে—"আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।" (জীবনস্মৃতি)

'অন্তরের অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহা' থেকে নিষ্ক্রমণের তথা-মুক্তির প্রেরণা থেকে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচিত হ'য়েছে, এ কথায় সায় দেওয়ার আগে—'অন্তরের অনির্দেশ্যতাময়' অন্ধকার গুহায় প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা জেনে নেওয়া দরকার। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কবি-কাহিনী' কাব্যের মধ্যে, কবি-আত্মার—মানবাত্মারও বটে—যে ইতিহাস—'history of soul' বর্ণনা করা হ'য়েছে, তাতেই দেখা যায় অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহায় প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের বিষয় প্রথম উপস্থাপিত হ'য়েছে। এখানেই কবি উপলব্ধি করছেন—"self-centered seclusion"—এ শান্তি নেই, আপনার সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানব-হৃদয়ের স্বস্তি নেই—বিশ্বপ্রেমের অপার করুণায় হৃদয়

পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত—"সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল" না ফেলতে পারা পর্যন্ত মানবহৃদয়ের বিশ্রাম নেই, মানবাত্মার পূর্ণ স্বস্তি ও শান্তি নেই। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই—এ ধারণার সূত্রপাত এখানেই। কবি নিসর্গকে ছেড়ে মানব-হৃদয়ে প্রবেশ হ'য়েছেন, আবার মানব-হৃদয়কে ছেড়ে মনের শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছেন ; এতে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে যেমন হারিয়েছেন তেমনি মানব-প্রকৃতিকে অর্থাৎ নলিনীকেও হারিয়েছেন এবং প্রকৃতির হাতে শাস্তি পেয়েছেন। প্রকৃতি-প্রেম ও মানবপ্রেম বিশ্বপ্রেমের অনুভূতির সাথে অবিনাভাবে যুক্ত হয়েই কবির আত্মায় শান্তি ফিরে এসেছে। কবি-কাহিনীতে, কবি-চিত্তের বিশেষ ও নির্বিশেষ কামনার দ্বন্দ্ব এবং সমাধানে যে রূপটি ব্যক্ত হ'য়েছে, তা' কবির ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি কি না সে কথাটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। কবির এই ভাব কতটা তাঁর নিজের অন্তরের সহজ পরিণতি আর কতটা—শেখানো বা প'ড়ে পাওয়া, তা'ও বিচার্য্য।

যে ভাব এখানে ব্যক্ত হ'য়েছে তা' কবির সহজ উপলব্ধি হ'তে পারে না—এ কথা যেমন অশ্রদ্ধেয়, তেমনি এ কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার ক'রে দেখা দরকার—ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের "এক্‌স্‌কারশান" শেলীর "এলাসটর" এবং কীটসের "এণ্ডিমিয়ন"প্রভৃতি কবি-কাহিনী-বিষয়ক কবিতা থেকে—(যে কবিতায় history of poetic soul বর্ণিত হ'য়েছে তা' থেকে) এই "অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহা"য় প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের ধারণা সংক্রামিত হ'য়েছে কি না, আমাদের কবি তদ্ভাবে ভাবিত হ'য়েছেন কি না। আমার মনে হয়, 'কবি-কাহিনী' নামটি যেমন, তেমনি বর্ণিত বিষয়েও উল্লিখিতনামা কবিদের কাব্যের প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। ঐ সব কবিতার ভাবাদর্শেই "কবি-কাহিনী" রচিত হ'য়েছে এটা মিথ্যা অনুমান নয়। এখানে, বিশেষতঃ কবি-চিত্তের সমস্যা

স্থাপিত হ'লেও, জীবন-তৃষ্ণারই তীব্র রূপটি প্রকাশিত হ'য়েছে। জীবনের মর্মমূলে আছে বাসনা—প্রেমের আবেগ। প্রকৃতির রূপের দিকেই এই আবেগে মানুষ প্রথম ধাবিত হয়; কিন্তু মানব-হৃদয় শুধু প্রকৃতিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—হৃদয়ের স্বর্গ পেতে সে উৎসুক হ'য়ে উঠে। বিশেষ ব্যক্তির ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম পেয়ে তার প্রেমের পিপাসা মিটতে চায় না—ক্ষুদ্রপ্রেম তার শূন্যতা ঘুচাতে পারে না। প্রেমের ভূমাকে না পেলে তার স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। কিন্তু এখানেই ভূমাকে পাওয়া নিয়েই ঘটে প্রমাদ। ভূমা যে নির্বিশেষ নয়, ভূমাকে চাওয়া যে শূন্যের সাধনা নয়, খণ্ডের সমবায়েই যে অখণ্ড—অল্পকে নিয়েই যে ভূমা—এই কথাই ভুলে যায়। ভূমাকে পাওয়ার আবেগ যেখানেই বিশেষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নৈর্ব্যক্তিক আবেগমাত্রে পর্যবসিত হয়—আত্মা তাঁর অবলম্বন হারিয়ে ফেলে—এবং তখনই অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করে—জগৎ ও জীবনের ওপর তার যে সহজ অধিকার সেই অধিকার হারিয়ে বসে। যে দৃষ্টি শুধু বিশেষকে নিয়েই মত্ত, সেও যেমন বিকৃত, তেমনি যে দৃষ্টি নির্বিশেষ আদর্শকে খুঁজতে বেরিয়ে 'বিশেষ'-শূন্য শূন্য নিয়ে মত্ত থাকে, সে দৃষ্টিও বিকৃত। যে দৃষ্টি শুধু "বিশেষের" গণ্ডীতেই আবদ্ধ সে যেমন অন্ধকার গুহায় বাস করে, তেমনি যে দৃষ্টি বিশেষবর্জিত নির্বিশেষকে চায়, সেও "অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহায়" বাস করে। মুক্ত দৃষ্টি তাঁরই যিনি নির্বিশেষকে বিশেষের মধ্যে এবং বিশেষকে নির্বিশেষের আলোকে দেখেন। প্রকৃতির বিশেষ ও নির্বিশেষ প্রবণতাকে, real ও ideal এর প্রবণতাকে এক নির্বিরোধ সম্বন্ধের মধ্যে ধরতে না পারলে, প্রকৃতির হাতে শাস্তি পেতেই হবে। কবি-কাহিনীতে, কবি-আত্মায় বিশেষ (real) এবং নির্বিশেষ (ideal)-এর দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধান দেখানো হ'য়েছে। 'আইডিয়াল'-হীন 'রিয়েল'-এর সেবা অথবা 'রিয়েল'-শূন্য 'আইডিয়াল'-এর সেবা—দু'টোই মিথ্যা।

"প্রকৃতির প্রতিশোধ"-নাটকে এই তত্ত্বই—রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে;" 'অন্যরকমটুকু এই যে—'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-নাটকে জীবনের পরমার্থসাধনার বিকৃতিকে উপস্থাপ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে।

৫। **নলিনী** (১৮৮৪)

"রবীন্দ্রনাথের বয়স অনুপাতে তাঁহার কল্পনা ও বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'Precocious child' তিনি ছিলেন তাই"—শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মন্তব্যটি আশা করি সকলেই সত্য ব'লে স্বীকার করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অবশ্য স্বীকার করবেন—রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটু বিশেষত্ব ছিল যা' সাধারণ পরিবারের ছেলের ভাগ্যে কমই জোটে। বাঁধা-ধরা লেখাপড়ার পথ থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে দাঁড়িয়েছিলেন, এ কথা যেমন সকলেরই জানা, তেমনি এ কথাও আজ আর অজানা নেই যে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো গৃহশিক্ষকদের হাত ধরে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই ইউরোপীয় ও ভারতীয় কবিকল্পনার অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিলেন। ফলে, কালিদাসের ও শেকসপীয়রের নাটকের এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স প্রমুখ রোমান্টিক কবিদের কাব্যের সঙ্গে অতি অল্পবয়সেই তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এই পরিচয়ের প্রভাব কবিজীবনে কতখানি—তা' নিয়ে বিশেষ আলোচনা আজপর্যন্ত না হ'লেও, এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই কবি-আত্মার অতৃপ্তি-তৃষ্ণা নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী কীট্‌স যে ধরণের কাব্য রচনা করেছিলেন অনেকটা তারই ধাঁচে রবীন্দ্রনাথের "কবি-কাহিনী" রচিত হ'য়েছিল এবং উল্লিখিত রোমান্টিক কবিদের অঞ্জন-শলাকার স্পর্শে তাঁর চোখে আত্মার অনন্ত অতৃপ্তির বেদনার রূপটি ফুটে উঠেছিল। নিজের কল্পনাপ্রবণ কবি-আত্মা দিয়ে

খেলতেই ভালবাসে, হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে জানে না। নলিনীর সংস্পর্শে এসে কবি নীরবে প্রেমের ঐকান্তিকতা ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু এই ভুল বুঝতে যে সময় যায় তা' মুরলার জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। অন্তিমশয্যায় কবির সঙ্গে মুরলার মিলন হয়। বাসর-শয্যা ও চিতা-শয্যা একাকার হ'য়ে যায়। অনিলের ভুল ভাঙতে ভাঙতে ললিতাও মৃত্যুর কোলে শায়িত—চিরস্মৃতির জন্য ব্যাকুল হয়।

'নলিনী'র ওপরেও প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। যে রূপের শোভা দিয়ে একদিন সে ভ্রমরদের আকর্ষণ করতো, সে রূপ-যৌবন আজ শুকিয়ে আসছে। একদিন যাদের সে উপেক্ষা করে বিদায় করেছে, তাদেরই উপেক্ষা আজ ফিরে এসে আঘাত করছে দ্বিগুণ আঘাতে। কবির সঙ্গে হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার খেলা খেলতে খেলতে সে হৃদয় হারিয়েছে, কিন্তু সে কবিও ফিরে গেছে নিজের ঘরে—মুরলার নীরব প্রেমের মন্দিরে। সবাই ঘর বেঁধেছে, ঘরে ফিরে গেছে; সেই শুধু একা ও উপেক্ষিতা। প্রেমিকার অধিকার, জননীর অধিকার নিজের হাতেই সে বিসর্জন দিয়েছে—স্বখাত সলিলেই সে ডুবেছে। নলিনীর ট্র্যাজেডি খুবই মর্ম্মস্পর্শী।

'নলিনী'-নাটিকায় আমরা যে নলিনীকে পাই তার প্রকৃতি কবি-কাহিনীর নলিনীর এবং ভগ্ন-হৃদয়ের মুরজা ও ললিতার ধাতু দিয়ে গড়া। নলিনী বালিকা। কিন্তু নীরদকে সে একান্তভাবেই ভালবাসে। তার ভালবাসায় কোন চপলতা বা লালসার ছলাকলা, হাবভাব নেই। ভাল-বাসা ঐকান্তিক ও সুগভীর বলেই অতিস্থির গোপন-আত্মনিবেদনেই তার একমাত্র অভিব্যক্তি ঘটে। বুক ফাটলেও নীরদের কাছে তার মুখ ফোটে না। যাকে সে সর্বান্তঃকরণে চায় শুধু তার কাছেই সে সহজভাবে কথা বলতে পারে না। আর সবার কাছেই সে সপ্রতিভ।

নবীনের সঙ্গে হাসি-তামাসায় সে কত না সহজ, কত না মুখর ; কিন্তু যে নীরদ একটু হাসির, একটু প্রিয়সম্ভাষণের কাঙাল, তার কাছে সে সঙ্কোচে-অবগুণ্ঠিত। তাই শেষপর্যন্ত নীরদ বালিকা-হৃদয়ের নীরব প্রেমকে প্রেমের অভাব মনে করে এবং দূরে চলে যায়। অশান্ত শ্রান্ত হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজে পায় সে নীরজার মধ্যে। নীরজা ভগ্ন-হৃদয়ের নলিনী নয়, সে মমতাময়ী, স্নেহময়ী—সে মমতা করেই ভাল থাকে, স্নেহ দিতেই ভালবাসে। সে করুণাময়ী। নীরজার 'মধুর করুণা'র আশ্রয়ে থেকেও নীরদ নলিনীকে ভুলতে পারে না,—মন থেকে বিষাদ মুছে ফেলতে পারে না। তা' সত্ত্বেও নীরজা নীরদকে ভালবাসে। শুধু নীরদের শান্তির মুখ চেয়েই নীরদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনধারা মিশিয়ে দেয়। নীরজাকে নিয়ে নীরদ দেশে ফিরে আসে। "নলিনীর উদ্যানে বসন্তোৎসবে" নীরদ ও নীরজা উপস্থিত হ'য়ে দেখে দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে নলিনীর দেহ শেষ হ'য়ে এসেছে। নীরজা নলিনীর বিরহ দুঃখ-তপস্যা দেখে চোখের জল সামলাতে পারে না, নিজের জীবন দিয়েই নীরদ ও নলিনীর মিলন-সেতু রচনা করে—মুমূর্ষু নীরজা 'পরস্পরের হাতে হাত সমর্পণ' ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। নলিনী মৃত নীরজাকে আলিঙ্গন ক'রে কেঁদে উঠে—"আমিও আর বেশীদিন থাকব না আমিও শীগ্‌গির তোর কাছে যাচ্ছি।" নীরজা তার নিজের বিবাহ প্রসঙ্গে যে কথা বলেছিল—সে কথা মিথ্যে নয়—বাসরঘর শ্মশানের ওপরেই গড়া। নীরদ-নলিনীর বাসরঘরও শ্মশানের ওপরে গড়া নয় কি ? মৃত্যু বিষাদগ্রস্ত এই মিলন—বিয়োগান্ত পরিণতির বেদনাই বহন করে। এবং তা' করে বলেই ট্র্যাজেডি-রসাত্মক।

তবে ছয়টি দৃশ্যের এই গদ্য নাটকখানি রসের হিসাবে রোমান্টিক ট্র্যাজেডি—শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'লেও, ট্র্যাজেডি-নাটকের যে পরিমাণ রূপ-বাস্তবিকতার গুরুত্ব থাকা আবশ্যক, সেই পরিমাণ গুরুত্ব এর নেই।

যে কারণে রবীন্দ্রনাথ নাটককে 'ফুলের গাছ' বলেছেন, সেই কারণেরই গাছ-হ'য়ে-উঠারই—অভাব ঘটেছে। প্রকৃত গাছ হ'তে গেলে মূলের যতখানি মাটির ভিতরে ছড়িয়ে থাকা উচিত, পাত্র-পাত্রীরা এখানে পরিবেশের সঙ্গে ততখানি জড়িয়ে নেই। ফলে রোমাঞ্চের আবহাওয়াই এখানে বিরাজিত। দেহে-আত্মায় রচনাটি 'রোমাঞ্চ'এর পর্যায়েই রয়ে গেছে।

৬। মায়ার খেলা (১৮৮৮)

সখীসমিতির চাহিদায়—বিশেষ ক'রে শ্রীমতী সরলা রায়ের (ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী) অনুরোধে 'মায়ার খেলা' নাটিকা রচিত। এই নাটিকার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য—"তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ"। বলা বাহুল্য, নাটক ব'লতে সাধারণতঃ যে-জাতীয় রচনা বুঝায় এ সে জাতীয় রচনা নয়। এ যেন নাটকেরই এক আদিম রূপ—এমন অতীতকালের রূপ যখন গানের ভাষার গণ্ডীর মধ্যেই নাটক আবদ্ধ। এই ধরণের নাটককে 'নাটকের অতীত নিয়ে নতুন পরীক্ষা' বলা চলে। 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা'কে প্রকৃত নাটক বলা চলে কি না—অবশ্যই বিচার্য বিষয়।

আর একটা বিচার্য বিষয়—প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা :—"আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।" এ কথা ঠিক বটে যে অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকা "নলিনী"র সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—অর্থাৎ "নলিনী"-তে

যেমন প্রেমতৃষ্ণায় নায়ক মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হ'য়েছে এবং বাসনা-বহ্নি নিবিয়েই প্রেমের যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছে, এখানেও তেমনি 'প্রেম-মরীচিকা'-র পেছনে ছুটে ছুটে শ্রান্তক্লান্ত নায়ক অমর প্রেমিকা শান্তার কাছে ফিরে এসেছে এবং তার প্রেমের মধ্যেই প্রেমের কামগন্ধহীন রূপটি উপলব্ধি করেছে। কিন্তু "মায়ার খেলা"কে 'নলিনী' নাটকের সংশোধন হিসাবে গ্রহণ ক'রতে বলা ঠিক হয়েছে কি ? প্রথমতঃ রীতির দিক দিয়ে "নলিনী" 'মায়ার খেলা'র চেয়ে আধুনিক বা প্রচলিত নাট্য-রীতির বেশী কাছাকাছি। দ্বিতীয়তঃ, মায়ার খেলার সাথে 'ভগ্ন-হৃদয়' কাব্যের সাদৃশ্যই বেশী। ভগ্নহৃদয়ের মুরলাই, মায়ার খেলার 'শান্তা' হ'য়েছে, ভগ্নহৃদয়ের 'কবি' (কবি-কাহিনীর কবি ও) মায়ার খেলার 'অমর' হ'য়েছে। ভগ্নহৃদয়ের "নলিনী"—মায়ার খেলার "প্রমদা" হ'য়ে দেখা দিয়েছে ; উভয়ের কাহিনীও প্রায় একরকম।

যা'ই হোক, 'ভগ্নহৃদয়ের এবং 'নলিনী'র সুর যেমন ট্র্যাজেডির সুরের সঙ্গে বাঁধা, 'মায়ার খেলা'র সুরটির রেশও করুণ। শান্তা ছাড়া আর সকলেই মায়ার ছলনায় সুখ-মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়েছে—অনন্ত প্রেমের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রায় দিগ-দিগন্ত ছুটোছুটি ক'রে জীবনের দিনগুলি ক্ষয় করে ফেলেছে। মনের মানুষকে মনের মধ্যে না পেলে, বিশ্বে আর কোথাও তাকে পাওয়া যায় না—এই কথাটাই মায়ার ছলনায় মানুষ জানে না। তাই—মায়া-কুমারীগণের কথাই সত্য—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
—শুধু সুখ চলে যায়।
—এমনি মায়ার ছলনা
—এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়।

....

—তাই এত হায় হায়।

*—প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়॥

মায়ার ছলনাতেই মানুষ—"যাহা চায় তাহা ভুল করে চায় যাহা পায় তাহা চায় না"—'মিড্ সামার নাইটস্ ড্রিম-এর স্বপ্নের মতো মোহের ঘোরে—'কারে ছেড়ে কারে চায়'।

আত্মার অন্তর্নিহিত এই তৃষ্ণা থেকে যেখানে জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হ'য়ে যায়,—চিরজীবনের তৃষ্ণায় জীবন যেখানে কেঁদে কেঁদে মরে—অনির্দ্দেশ্য আবেগে মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে জীবন ক্ষয় করে ফেলে, সেখানে যে ট্র্যাজেডির রূপ পাওয়া যায়, তাকে আধ্যাত্মিক ট্র্যাজেডির রূপ বলা চলে। এ সব ক্ষেত্রে, জুলিয়াস ব্যাব্ মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়—"Tragic guilt is not ethical, it is on the contrary, meta-physical that is to say, innate"। 'চিরজীবনে'র তৃষ্ণার—মধ্যেই এ সব ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত। এর মূল কারণ মানুষের—spirituality—যাকে বলা হ'য়েছে—"reason, will and emotion acting togethir to see life in its total relationships and also to feel an obligation toward the whole of life,' T. R. Hennলিখিত The Harvest of Tragedy (1956) থেকে উদ্ধৃত]"

এ খুবই উল্লেখযোগ্য কথা যে, প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির কাছে আধ্যাত্মিক সঙ্কটের ট্র্যাজেডির রূপটি খুব স্পষ্ট আকারে ধরা দিয়েছে। উল্লিখিত রচনাগুলিতে রূপ-রসের ত্রুটি আছে—এ খুবই সত্য কথা, কিন্তু এও সত্য—ত্রুটি যতই থাক, ভাবের গভীরতা এবং কল্পনা কুশলতার পরিচয়ও তাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। এই সব নাটকের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ কোন কোন স্থলে অপূর্ণ আত্মার ভূমার তৃষ্ণার—চিরজীবনের তৃষ্ণার—ট্র্যাজেডি, এবং কোন কোন স্থলে প্রেমতৃষ্ণার ট্র্যাজেডি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন. অন্যদিকে অর্থাৎ জীবনের রস-

রূপের মাঝ দিয়ে জীবনভাষ্য রচনা করতে গিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, প্রেম, সুখ ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, সেই দার্শনিক উপলব্ধিকেও প্রকাশ বা প্রচার করেছেন। বাসনা ও বিবেকের মধ্যে—প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির মধ্যে, বিশেষের এবং নির্বিশেষের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হ'লে, জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়—জীবনে একচক্ষু গতির ফলে শোচনায় পরিণতি দেখা দেয়, এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই জেনেছিলেন—উপলব্ধিও করেছিলেন। স্বভাবো অতিরিচ্যতে। আত্মা স্বভাববশেই আপন সত্তার সমগ্রতা দাবী করে—জ্ঞান-প্রেম-কর্ম সব বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিতার্থতা কামনা করে। শুধু জ্ঞানে, শুধু প্রেমে, শুধু কর্মে আত্মার স্বস্তি নেই, মুক্তিও নেই। বিবেক-বিযুক্ত বাসনা ভোগের অন্ধ আবেগে বিষয়ের তৃষ্ণায় পাগল হয়ে বনে বনে ফেরে। বাসনা-বিযুক্ত বিবেক হৃদয়হীন শুষ্ক আচার-বিচারে আত্মক্ষয়ের সাধনায়, শূন্যের সাধনায় মেতে উঠে। উভয়েই মোহগ্রস্ত। মোহের অবসান না ঘটলে মুক্তি নেই এবং মুক্তি না আসলে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। স্বভাবে অবস্থান না করা পর্যন্ত...আত্মার মধ্যে নির্বিরোধ সামঞ্জস্য না ঘটা পর্যন্ত, মুক্তি অসম্ভব। নিবিরোধ সামঞ্জস্য তখনই আসে যখন জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বাসনায় বিশেষ-নির্বিশেষের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষকে এবং নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষকে উপলব্ধি করতে পারলেই এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়। এই উপলব্ধির পথে প্রবল অন্তরায় কাম ও মোহ। সম্মোহ সামঞ্জস্যের বিরোধী। মোহের স্বভাবই এই যে সে কামনার বিষয়কে, তার সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে, ভোগের মুখের মধ্যে পুরে নিতে চায়। যত ঐকান্তিক কামনা তত উগ্র সম্মোহ এবং তত অনিবার্য তার পরিণতিগুলি—মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে সর্বনাশ।

রাজা ও রাণী (১৮৮৯)

রাজা ও রাণী—নাটকে মোহগ্রস্ত প্রেম-তৃষ্ণার ট্র্যাজেডির রূপকেই একটু নতুন ও জটিল আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন আকার বলছি এই কারণে যে এই নাটকের পাত্র-পাত্রীরা পূর্ববর্ত্তী নাটকের পাত্রপাত্রী অপেক্ষা একটু কম আকাশস্থ এবং এখানকার ট্র্যাজেডির মধ্যে পাত্রপাত্রীর সমাজ-সত্তা অপেক্ষাকৃত বেশী স্থান জুড়ে রয়েছে ; অর্থাৎ যে দ্বন্দ্বের ফলে এখানে ট্র্যাজেডি ঘটেছে, সেই দ্বন্দ্বটির একপক্ষে র'য়েছে রাজা বিক্রমদেবের অন্ধ জৈবিক প্রবৃত্তি, অন্যপক্ষে র'য়েছে—রাণী সুমিত্রার মনোজৈবিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি অর্থাৎ সেই কল্যাণবোধ—মনুষ্যত্বচেতনা যা' মানুষকে শুধু জৈবিক বাসনার সমষ্টি বলে মনে করতে পারে না, যা' মানুষকে শুধু জীব মনে না ক'রে, মনুষ্য-সমাজের একজন ব'লেই স্বীকার করে এবং তা' করে ব'লেই সমস্ত দায়িত্ব পালন করার ভেতর দিয়ে মানুষের যে কল্যাণময় সামাজিক রূপ প্রকাশ পায় সেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মহিমান্বিত রূপটিকেই দেখতে চায়—যা' সম্পূর্ণতার ভাবাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই বিশেষকে উপলব্ধি করতে চায়—বিশেষকে ভালবাসে সেই পরিমাণেই যে পরিমাণে বিশেষ তার ভাবাদর্শকে পরিতৃপ্ত করে। প্রাণধর্ম ও মনোধর্ম নিয়ে মানবাত্মার যে সমগ্রতা, মানুষকে এ সেই সমগ্রতার আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

রাজা-রাণীর দ্বন্দ্ব এবং ট্র্যাজেডির বীজ এই ধর্মবিরোধের মধ্যেই নিহিত। রাজা প্রজার সঙ্গে যোগ হারিয়ে রাজধর্ম থেকে তথা মনোধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেছেন, এককথায় জীবধর্মের সংকীর্ণ কামনার গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন। রাজ-বিক্রমের মহিমা ভুলে বিক্রমদেব মদনোৎসবে মত্ত হয়েছেন—কামদেবের পূজায় আত্মনিয়োগ করেছেন। রাজা মোহগ্রস্ত ব'লেই কর্ত্তব্য তাঁর কাছে কারাগার—আত্মপীড়া ; আর "সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর।

কিন্তু রাণী সুমিত্রা তার রাণী-সত্তাকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র কামিনী সত্তার মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে আনতে পারেননি। প্রজার সঙ্গে তথা দেশের কল্যাণের সঙ্গে যে যোগে তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও মহিমা, সেই যোগ নষ্ট ক'রে, সেই মহিমাকে খর্ব ক'রে, সুমিত্রা, রাজার মতো নিজেকে জৈবিক কামনার গোপন অন্তঃপুরে আবদ্ধ ক'রে রাখেননি। তিনি "অন্তরে প্রেয়সী" এবং 'বাহিরে মহিষী' হয়েই আপন সমগ্রতা ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এই মহত্ত্ব-শিখরে রাজা উঠতে পারেননি ব'লেই, রাজা তাঁকে পেয়েও পাননি—রাজা ও রাণীর মধ্যে মিলন ঘটতে পারেনি। এই মোহগ্রস্ত রাজাকে মোহমুক্ত করতে গিয়ে রাণী অগত্যা রাজ-অন্তঃপুর থেকে অন্তর্হিত হন এবং নিজেই নিজেকে নির্বাসিত করেন—নিজের সুখশান্তি বিসর্জন দেন—এককথায়, আত্মত্যাগ করেন। কিন্তু রাজাকে প্রকৃতিস্থ করতে গিয়ে রাণী যে উপায় অবলম্বন করেন, তা'তে রাজা এক মোহ থেকে মুক্ত হ'য়ে আর এক মোহের মধ্যে গিয়ে পড়েন। কাম-মোহ সংগ্রাম-মোহে পরিণত হয়। ঐকান্তিক কামের সম্মোহ ব্যাহত হ'য়ে প্রচণ্ড হিংসার উত্তেজনায়—যুদ্ধের উন্মাদনায় পরিণত হয়। রাজা প্রেমের অমৃতের অভাব শক্তির সুরা পান করে মেটাতে মরিয়া হ'য়ে উঠেন। ক্রোধের সম্মোহে রাজার স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, বুদ্ধিনাশ হয়। রাজ-মহিমার উপর যেই ছায়াপাত করতে আসুক, তার নিস্তার নেই। হো'ক না কেন সে রাণী, হো'ক না কেন সে রাণীর ভ্রাতা কুমারসেন। প্রচণ্ড অভিমানে রাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে বিক্রমদেব মনুষ্যসত্তাকে হারিয়ে বসেন। নানা সত্তার সামঞ্জস্যে ব্যক্তিত্বের যে সমগ্রতা, তা' তাঁর মধ্যে কিছুতেই আসছে না। যুদ্ধ ভাল না লাগলেও যুদ্ধের উত্তেজনা দিয়ে অবসাদ পূরণ করে করে দিন যায়। এমনি এক মুহূর্তে, সংঘর্ষের মাঝ দিয়ে ইলার ঐকান্তিক প্রেমের সঙ্গে পরিচয় হয়। ইলার ঐকান্তিক [illegible]

প্রেমিকসত্তাকে জাগিয়ে দেয়—হিংসার উন্মাদনা প্রশমিত ক'রে দেয়। বিক্রমদেব তাঁর জীবনের হারানো সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনতে ব্যাকুল হয়ে উঠেন।

কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে বিক্রমদেব যে সব কাজ করেন, তারই ফল তাঁকে হাতে হাতে পেতে হয়। তিনি কুমারসেনকে এবং রাণী সুমিত্রাকেও এক মহাসঙ্কটের সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। সেখান থেকে, আত্মহত্যা অথবা আত্মসমর্পণ, দু'য়ের কোন-একটিকে বেছে না নিয়ে মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। কুমারসেন ক্ষত্রি-অভিমান নিয়ে প্রাণ দিয়ে মান রক্ষা করেন—বশ্যতা স্বীকার করার চেয়ে প্রাণ দেওয়া অধিকতর কাম্য মনে করেন। তাঁরই অনুরোধে, সুমিত্রা কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড বহন ক'রে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং মুণ্ডটি উপহার দিয়ে চিরতরে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন। রাজার জীবনে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা দেখা দিতে না দিতেই চিরতরে মিলিয়ে যায়। রাজা ও রাণীর জীবন অবলম্বনে ট্র্যাজেডির এই রূপটি ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ নাটকখানি লিখেছেন।

তবে ভাবের গুরুত্ব বা মহত্ত্ব যতই থাক, যে রূপের দেহে তিনি ভাবটিকে অঙ্গ দিতে চেষ্টা করেছেন, সে রূপ অনবদ্য হ'তে পারেনি। প্রথমতঃ কাহিনীতে ঐতিহাসিকত্বের আভাস থাকলেও প্রকৃত ঐতিহাসিকত্বের বাস্তবিকতা বা বাস্তবিককল্পতা নেই। মাটির মধ্যে যত গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে থাকলে গাছ জীবন্ত অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, গাছকে জীবন্ত গাছ বলে মনে হয়—এখানে কাহিনীর এবং চরিত্রের দেশ-কালের মাটির সঙ্গে সেই নিবিড় সম্পর্ক নেই।

'ফুলের গাছ' হ'তে গেলে নাটককে শিকড় উপেক্ষা করলে চলবে না। কারণ তা'হ'লে গাছকে গাছ ব'লেই মনে হবে না। নাটকের

পক্ষে "গাছ" না হ'তে পারা ত্রুটিই ব'লতে হবে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীটি বেশ দূর অতীতের কাহিনী। সংস্কৃত নাটকের রাজারা যে যুগের লোক প্রায় সেই যুগেরই কাহিনী। সুতরাং এই ব্যবধানের সুযোগে কবি যদি রোমাঞ্চ-সুলভ পরিবেশ ও পরিস্থিতি কল্পনা করার অবকাশ সৃষ্টি করেন, তা'হ'লে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না—আর এত দূর অতীতের কাহিনীতে আমাদের পক্ষেও নিখুঁত বাস্তবিকতা দাবী করা ঠিক হবে না। তবে এ সব যুক্তি সত্বেও, বলবার কথা এই যে—এই নাটকের পরিস্থিতি-কল্পনার মধ্যে, চরিত্রের আচরণের মধ্যে বেশ একটা অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে এবং তা' নাটকের সামগ্রিক আবেদনের ও গুরুত্বের ক্ষতি করেছে।

রাজার জীবন স্বভাবতই অস্বাভাবিক ; জীবনের অসাধারণ মুহূর্ত্তগুলি অস্বাভাবিক ব'লেই মনে হয়—এই সব যুক্তি দেওয়ার পরেও ঐ আগের কথাই বলতে হচ্ছে—অসাধারণকে অসাধারণ রূপেই স্বাভাবিকপ্রায় করতে পারার যে প্রতিভা, তা' এখানে যথেষ্টমাত্রায় প্রকাশিত হয়নি। "ভাব-কল্প"কে উপযুক্ত 'রূপ-কল্পে'র আশ্রয় দিতে পারেননি।

তবে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ-অনুসরণে অনেক সমালোচক যে দিক থেকে নাটকখানির সমালোচনা করেছেন তা' আমি মেনে নিতে রাজি নই। রাজা ও রাণী-নাটকের যে ভাবকল্প তা'তে কুমারসেন-ইলার কাহিনীকে একেবারে অনাবশ্যক বলা চলে না। ইলার ঐকান্তিক প্রেমের সঙ্গে প্রেমস্বর্গচ্যুত হিংসোন্মত্ত রাজার সংঘর্ষ নাটকের বর্ত্তমান উপসংহারের জন্য আবশ্যক কি না অবশ্যই বিচার ক'রে দেখা দরকার। আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার—ইলার বা কুমার-সেনের উক্তির মধ্যে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, পরিস্থিতির সঙ্গে তার বিশেষ আপত্তিকর অসঙ্গতি ঘটেনি। তারপর ভাবগত সঙ্গতির দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, রাজা যে রাণীর সঙ্গে দেখা করেননি বা কুমার-

সেনের মাথা নত করবার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, এগুলি একেবারে অমনস্তত্ত্বসম্মত ঘটনা নয়। আগেই বলেছি, রাজা সব বিষয়েই অসাধারণ ঐকান্তিক। যেমন অনুরাগে ঐকান্তিক, তেমনি বিরাগেও ঐকান্তিক। যত প্রবল তাঁর কাম-মোহ, তত প্রচণ্ড তাঁর অভিমানক্ষুব্ধ অহমিকার উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ। এই সব দিকগুলি লক্ষ্য না রাখলে, 'রাজা ও রাণী'র ট্র্যাজেডির রূপটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। তবে অতিনাটকীয় ঘটনা এবং ভাবতান্ত্রিক উপস্থাপনার ত্রুটিও অবশ্য লক্ষণীয়। এই ত্রুটিগুলি না থাকলে 'রাজা ও রাণী' উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারতো। এই নাটকখানি সংশোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ পরে 'তপতী' নামে যে নাটক রচনা করেন, তা' যে ভিন্ন নাটক হ'য়ে গেছে, 'তপতী' আলোচনা করার সময় সে সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে।

৮। **বিসর্জন** (১৮৯০, ২রা জ্যৈষ্ঠ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কয়খানি নাটক বহুবার অভিনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, তাদের মধ্যে 'বিসর্জন' অন্যতম এবং সেই হিসাবে বিশেষ উল্লেখ দাবী করতে পারে। এই নাটক-রচনার বাহ্য প্রেরণা বাড়ীর ছেলেদের, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের "বায়না"। সুরেন্দ্রনাথ নিজের হাতে বাঁধানো একখানি খাতা 'রবিকা'র সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। মাঘোৎসবের পরে সাহাজাদপুরে ফিরে গিয়ে, জমিদারি তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ সেই খাতাতেই বিসর্জন রচনা করেন। নতুন আখ্যানবস্তু চিন্তা করবার সময় ছিল না ব'লেই করুন আর শক্তিপূজার নিষ্ঠুর আচারের বা প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বা বিকৃত ধর্মসাধনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যই করুন, রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি উপন্যাসের আখ্যানবস্তুকেই কাটছাট দিয়ে নাট্যরূপ দান করেন। নাটক রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়

রবীন্দ্রজীবনীতে (১ম খণ্ড) যা লিখেছেন তা'কেই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট এবং প্রামাণিক ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। লিখেছেন :—"'বালকে' প্রকাশিত রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম ৮টি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্পাংশ বিসর্জনের বিষয়বস্তু। নক্ষত্ররায়ের বিদ্রোহ কাহিনী সংযোজিত অংশের (৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭ পরিচ্ছেদ) অন্তর্গত। রঘুপতি কর্তৃক কালী-প্রতিমার বিসর্জন ঘটিয়াছে ৪০শ পরিচ্ছেদে। রাজর্ষির অন্যান্য অংশের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। উহার অন্তর্গত হাসি, হাসির কাকা কেদারেশ্বর ভিখারিণী অপর্ণার অন্ধ পিতা প্রভৃতি বিসর্জনের প্রথম সংস্করণে ছিল। ১৩০৩ এর সংস্করণে তাহারা পরিত্যক্ত হয়। নাট্যো-ল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গুণবতী অপর্ণা নয়নরায় চাঁদপাল প্রভৃতি বিসর্জনের নূতন সৃষ্টি, রাজর্ষিতে ইহারা নাই। বিসর্জনের পাঠে বহু পরিবর্তন হইয়াছে; ১৩০৩-এর কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনকালেই উহার যথার্থ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেকগুলি দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হয়, নূতন লিখিত কোনো কোনো অংশ যোজিত হয় কোনো কোনো অংশ পরিবর্তিত হয় ও কয়েকটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হয়।" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা)। সংক্ষেপণ, সংযোজন, পরিমার্জন ও বর্জন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করার প্রয়োজন এবং অবকাশ এখানে নেই। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাচ্ছে।

তবে নাটকখানির **আভ্যন্তরিক প্রেরণা** সম্বন্ধে কথা-কথান্তর হ'য়েছে ব'লেই দু'একটা কথা বলা আবশ্যক। খ্যাতনামা সমা-লোচক শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য—" 'বিসর্জনে'র মধ্যে শুধু বলিদানের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিমাপূজার যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ রহিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য কেবল যে বলিদান বন্ধ করিয়াছেন, তাহা নয়, প্রতিমার প্রতি ভক্তিও যেন তাঁহার নাই। রঘুপতি নিজের অপরাধ প্রতিমার উপরে চাপাইয়া তাহাকে বিসর্জন দিয়া যেন সর্বদোষ

মুক্ত হইল, শক্তিলাভ করিল, দেবীর প্রতি তাঁহার আজন্ম বিশ্বাস এবং ভক্তি মিথ্যা বলিয়া বুঝিল" (বাংলা নাটকের ইতিহাস)—অনেকেরই মনের কথা। ব্রাহ্মসম্প্রদায় ও হিন্দুসম্প্রদায়ের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে দেখতে গেলে, প্রত্যেক সমালোচকের মনেই এ কথাটা বেশী-কম জাগবেই।

হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আচার—এক কথায়, হিংসা, ধর্মসাধনার অঙ্গ হ'তে পারে না—এই তত্ত্ব প্রচার করলে আপত্তি করবার তেমন কারণ নেই বটে, কিন্তু ধর্মসাধনায় প্রতিমার স্থান নেই—প্রতিমা-পূজা তামসিক উপাসনা—এ তত্ত্ব প্রচার করলে হিন্দু-সত্তায় আঘাত লাগবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য—"বিসর্জন" শাক্ত-হিন্দুর অভিমানে বেশ আঘাত দিয়েছিল এবং এখনও দেয়। সমালোচক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'রঘুপতি'র কথা বলতে গিয়ে, কড়া-মন্তব্য করতে বাধ্য হ'য়েছেন—"শাক্ত-ধর্ম এই প্রকার প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার ছলনা মাত্র নহে; এই ধর্মেও বিশ্বাস করিয়া, ইহার সংস্কার ও আচারগুলি পালন করিয়া নিষ্ঠাবান সাধকগণ তাঁহাদের নিজেদের দিক হইতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।" অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য জোরের সঙ্গেই লিখেখেছেন—"ইহার সংস্কার কুসংস্কার হইলেও, ইহার প্রথা কুপ্রথা হইলেও, এই ধর্মের প্রকৃত সেবকের নিকট তাহা প্রাণ দিয়াও রক্ষণীয়" (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস)

এখন প্রশ্ন এই যে—বিসর্জন নাটকখানি কি বলির বিরুদ্ধে—প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে, এককথায় শাক্ত-সাধনার বিরুদ্ধে প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সাকার উপাসনাকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে, নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই লিখিত হ'য়েছিল? উত্তরে বলা যায়—এমন কোন উদ্দেশ্য থাকা অসম্ভব কিছু নয়। প্রথমতঃ শক্তিপূজার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল। দ্বিতীয়তঃ

সাকার উপাসনা ব্রাহ্মসংস্কারের বিরোধী। তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের নতুন ধর্মবোধে বা পরমদর্শনে প্রতিমাপূজার এবং দেবতার সশরীরে আবির্ভূত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ("রবীন্দ্র-মানস"-দ্রষ্টব্য)। এ কথা স্বীকার করতেই হবে—শাক্ত-সাধনার উপরে রবীন্দ্রনাথের বিরাগ অতি স্পষ্টভাবেই নাটকে ফুটে উঠেছে। শাক্ত রঘুপতি সমস্ত শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হ'য়ে না দাঁড়ালে, এত কথাই উঠতো না। শক্তি-সাধকের মধ্যেও প্রকৃত সাধক আছে, এ ধারণার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ রাখেননি ব'লেই এত আপত্তি উঠেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে।

এ কথা ঠিক বটে যে বিসর্জন নাটকে বলির বিরুদ্ধে এবং প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে নাট্যকারের বিরূপ মনোভাব স্পষ্টাকারেই ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলেও চলবে না যে রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মদর্শনের পক্ষ অবলম্বন করেছেন—সেই প্রেমধর্মের বিপক্ষে বলবার মতো কথা খুব কমই আছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম—এই তিন যোগের পূর্ণ সামঞ্জস্য যে সাধকের জীবনে ঘটেনি, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রকৃত সাধক বলতে রাজি হননি। প্রচলিত শক্তিপূজা বা উপাসনা থেকে অনেক উচ্চে তার স্থান।

জ্ঞানবর্জিত ও প্রেমবিহীন কর্ম, সহজেই বিকৃত হয় এবং অন্ধ ও নিষ্ঠুর আচারে পরিণত হ'য়ে উঠে। তেমনি জ্ঞানবর্জিত প্রেম অন্ধ ও অধীর ভাবাবেগ মাত্র এবং প্রেমহীন ও কর্মহীন জ্ঞান শুষ্কতার ও শূন্যতার উপাসনা। যোগের বিকৃতি যে-কোন সাধকের জীবনেই দেখা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাছে পরমতত্ত্ব হ'চ্ছে—'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। তিনি তো শুধু সৃষ্টির দেবতা নন, শুধু স্থিতির দেবতা নন এবং শুধু প্রলয়ের দেবতা নন। তিনি একাধারেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। তাঁর উপাসনা তাঁরই স্বরূপোপলব্ধি—তাঁর

স্বরূপে অবস্থান। শুধু জ্ঞানে, শুধু প্রেমে এবং শুধু কর্মে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁকে সর্বতোভাবেই লাভ করতে হবে। কেউ হয়ত এখানে কূট তর্ক তুলে বলতে পারেন—তিনি তো শুধু শান্ত শিব ন'ন—সৃষ্টি-স্থিতির দেবতা ন'ন, তিনি তো প্রলয়েরও দেবতা; শিবের ইচ্ছা যেমন প্রেমরূপে কাজ করছে, রুদ্রের ইচ্ছা তেমনি হিংসার রূপ ধরে কাজ করছে। উপাসনা হ'চ্ছে তাঁর ইচ্ছানুবর্তী হওয়া—জীবন দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করা। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা শুধু শান্ত ভক্তিরই ব্যাপার নয়; ভৈরবের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হলে—রক্ত দিয়ে শক্তির উদ্বোধন করা চাই—আগুনের গান গাওয়া চাই, আগুনকে ভাই বলা চাই। সুতরাং হিংসা মাত্রেই পাপ নয়—যেমন ইন্দ্রিয়প্রীতি মাত্রই 'কাম' নয়। যেমন 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম' তেমনি—রুদ্রের ইচ্ছা পূরণে যে হিংসা সে হিংসা রুদ্রভক্তিরই বিশেষ রূপ। কূটতার্কিকের কথা মেনে নিয়েও বলা যায়—শুধু পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রেই হিংসাকে রুদ্রের ইচ্ছা ব'লে মনে করা যেতে পারে, অন্যক্ষেত্রে হিংসা পাপ। অহেতুক হিংসায় রুদ্রের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, নিজের রুদ্রপ্রীতির অহঙ্কারই ব্যক্ত হয়। শাক্ত সাধক-কবি এই দ্বন্দ্বের চমৎকার সমাধান করে গেছেন—তাঁর গীতিময় সাধনার মধ্যে; গেয়েছেন :—

'মেষ ছাগ' আর মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে।
জয় মা জয় কালী ব'লে বলি দে ষড়রিপুগণে॥

বলিদান আসলে রিপু-বলি। কারণ রিপু থেকেই পাপের জন্ম। রিপুকে অর্থাৎ ভিতরকার পশুকে এবং পাপাচারীকে ছাগ বা মহিষ-কল্পনা ক'রে, রিপুর বা পাপাচারীর পরিবর্তে ছাগ-মহিষ বলিদান দেওয়া সাধনার নামে আত্মপ্রবঞ্চনাই করা এবং অবশ্যই তা' সাধনার বিকৃতি। রঘুপতির মধ্যে এই বিকৃতির রূপকেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে' তিনি জ্ঞানযোগের বিকৃতির রূপ দেখিয়েছেন— বিসর্জনে দেখিয়েছেন—জ্ঞান-প্রেমহীন কর্মের অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাসের সংস্কারের—উপলব্ধিহীন আচারের বিকৃতির রূপ। এই বিকৃতির রূপটি ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেষ্টা করেছেন। একদিকে ভগবৎ-আরাধনার বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন অন্যদিকে সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে—প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে, এককথায় হিন্দু ধর্ম-সাধনার বিরুদ্ধে, প্রচারকার্য্যও করেছেন। এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য আর কোন্‌টি গৌণ—এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেরই কাছে একই রকম কথা প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না, কারণ তা' পাওয়াও যাবে না। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বা উদ্দেশ্য একক হবেই—এমন কোন কথা যখন নেই, তখন এক্ষেত্রেও একাধিক প্রেরণা স্বীকার করাই উচিত। তবে এই কথাই মনে রাখা দরকার—এক দৃষ্টিকোণ থেকে যা'কে প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা বলা যায়, অন্য দৃষ্টি থেকে তাকেই বলা যায় বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রচার বা সংগ্রাম।

প্রেরণা যাই হোক, নাটকখানির নামকরণ খুবই সার্থক হ'য়েছে। এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অনেকেই কিছু-না-কিছু একটা বিসর্জন দিয়েছে। অপর্ণার ছাগশিশু-বিসর্জনে বিসর্জনের সূচনা। ছাগশিশুর বিসর্জনে অপর্ণার হৃদয় থেকে যে করুণা সঞ্চারিত হ'য়েছে, রাজা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে তা প্রেমধর্মের উৎস-মুখ খুলে দিয়েছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য পূজা-প্রথা প্রভৃতি বাহ্য আচারের বেদিকা বিসর্জন দিয়ে, ধর্মকে অন্তরের উপলব্ধির সামগ্রীতে পরিণত করেছেন —ধর্মসাধনাকে প্রতিমা-পূজার বাহ্য আচার থেকে—মন্দিরের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত করে, প্রতিনিমেষের জ্ঞান-প্রেম-কর্মের ভেতর দিয়ে জীবনযাপনের সঙ্গে এক করে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে 'ধর্মই ধর্মের শেষ' বলে তা' 'সম্পদের হেতু' বা 'সুখের ক্ষুদ্র সেতু'

হয়নি। প্রেমধর্মকে রক্ষা করবার জন্য তিনি রাজ্য-সুখ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি। রাণী গুণবতীও বিসর্জন দিয়েছেন। পুত্রকামনার স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই, স্বার্থ-সাধনের জন্যই তিনি দেবতার কাছে বলি মানত করে এসেছেন। ধর্ম যে অন্তরের বস্তু—এ উপলব্ধি তাঁর হয়নি। আচার-অনুষ্ঠানের মিথ্যার রাজ্যেই তিনি বাস করতেন বলেই রঘুপতির পক্ষে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এই মিথ্যা সংস্কারকে তিনি বিসর্জন দিয়েছেন এবং রাজার অন্তরে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জয়সিংহ হৃদয়ের ধর্মরক্ষা করবার জন্য—প্রেমধর্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। রঘুপতি বিসর্জন দিয়েছেন অনেককিছু। বিসর্জন দিয়েছেন—প্রাণতুল্য জয়সিংহকে, শাক্তসত্তার নিদর্শন কালী-প্রতিমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানকে ও হৃদয়হীন তামসিক আচারকে। সুতরাং বিসর্জন নামটির সার্থকতা নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না।

যদি বলা যায়, এই 'বিসর্জন' নামকরণের দ্বারাই নাট্যকারের অভি-প্রায়টি সংকেতিত হয়েছে তাহলে, প্রধান বিসর্জনকেই—অর্থাৎ রঘুপতির প্রতিমা এবং হিংসা বিসর্জনকেই এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় বলে ধরতে হবে। গোবিন্দমাণিক্যকে মুখ্য আলম্বন বিভাব ক'রে—প্রকৃত ধর্মের —বা এককথায় প্রেমধর্মের জয় প্রদর্শন করাই যদি নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'তো, তা হ'লে নাটকের 'বিসর্জন' নাম রাখার সার্থকতা থাকতো কি ? তারপর নাটকখানি আর যাই হোক, ট্র্যাজেডি-রসাত্মক হতো কিনা সেও বিচার্য বিষয়। গোবিন্দমাণিক্য প্রায় সব বাধাই অতিক্রম করে অন্তরের ধর্ম রক্ষা করেছেন—রাণী নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুপতি অনেক আঘাত পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। এই দিক থেকে দেখলে, গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে

অতি শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে একথা বলা যায় না। অবশ্য আর এক দিক থেকে দেখলে, গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে ট্র্যাজেডির আভাস পাওয়া না যায় এমন নয়। ধর্মের জন্য—প্রকৃত ধর্মের জন্য গোবিন্দমাণিক্য নব নব দুঃখ পেয়েছেন। নিজের রাণীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছে—রাণী তাঁকে ভুল বুঝেছেন। সহোদর ভাই নক্ষত্ররায় তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে—তাঁকে হত্যা করতে রাজি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মোগল সৈন্য নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। ধর্মকে ভালবাসা—নিশ্চয়ই কোন অপরাধ নয়। অথচ সেই কারণেই তাঁকে এত সব আঘাত সইতে হ'য়েছে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই অস্ত্রধারণ করবে—এই অধর্মকে এড়াবার জন্যই তিনি যুদ্ধের পথে না গিয়ে যেচে নির্বাসন নিয়েছেন। যুদ্ধ করতে যে শক্তি দরকার, রাজ্যত্যাগ করতে—ভ্রাতৃরক্তপাতের মতো অধর্ম থেকে সংসারকে মুক্ত রাখতে যুদ্ধ না করতে—তার চেয়েও বেশী শক্তি আবশ্যক। গোবিন্দমাণিক্য সেই শক্তিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। প্রাণের সম্পর্ক পর্যুদস্ত ক'রে দিয়ে শক্তির ও ভোগের তাণ্ডবলীলায় জীবন যদি মেতে উঠে, তার চেয়ে অপমৃত্যু মানুষের আত্মার আর কি হ'তে পারে? মানবমহিমাকে রক্ষা করবার জন্য গোবিন্দমাণিক্যের এই আত্মত্যাগ যত উদ্দীপকই হোক, তার দুঃখবরণ অবশ্যই শোচনা জাগ্রত করে। গোবিন্দমাণিক্যের জয়ে আমরা উল্লসিত হই বটে, কিন্তু তার নিরুপায় দুঃখদুর্ভোগে আমরা বেদনা বোধ না ক'রে পারিনে। গোবিন্দমাণিক্যের জীবনও এই হিসাবে শোচনীয় বটে। কিন্তু তাই ব'লে এ কথা বলা চলে কি—গোবিন্দমাণিক্যের ট্র্যাজেডি দেখানোই এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি 'বিসর্জন' কথাটির অর্থ "সবকিছু স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ধর্মরক্ষা" করা যায়, তবেই তা' বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি—এই নাটকের পাত্রপাত্রীরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু বিসর্জন দিয়েছে। সব কয়টি 'বিসর্জন'কেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলা নিশ্চয়ই ঠিক

হবে না। যেমন, জয়সিংহের প্রাণ-বিসর্জন নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা; এই প্রাণের আঘাত রঘুপতির হিংসাকঠিন প্রাণে দেবতার স্পর্শরূপে কাজ করেছে এবং জয়সিংহের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র; কিন্তু তাই বলে জয়সিংহকে "নায়ক"-এর মর্যাদা দেওয়া ঠিক হবে কি না ভেবে দেখা দরকার। যতক্ষণ আমরা এই কথা প্রমাণ করতে না পারছি যে, জয়সিংহের জীবনের বা দ্বন্দ্বের পরিণতি দেখানোই এই নাটকের 'মুখ্য উদ্দেশ্য', ততক্ষণ জয়সিংহকে প্রধান রসের আলম্বন-বিভাব ব'লে ঘোষণা করতে পারা যায় না। অতএব কা'র এবং কি বিসর্জন'কে মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় করা হ'য়েছে, সেইটিই প্রথম নির্ধারণ ক'রে নিতে হবে। তা' করতে গেলেই—আমরা রঘুপতিকেই মুখ্য আলম্বন হিসাবে পাবো।

গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটলেও এবং তাঁকে রাজ্য-বিসর্জন দিতে হ'লেও, নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য যে রঘুপতির কালী-প্রতিমা এবং হিংসা বিসর্জন, নাটকের নামকরণ ও পরিণতি এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে। ট্র্যাজেডির 'ফোকাস' এখানে একাধিক চরিত্রে—গোবিন্দ-মাণিক্য-রঘুপতি এবং জয়সিংহ এই তিন চরিত্রে—বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বিসর্জন এমন একখানি ট্র্যাজেডি যেখানে দ্বন্দ্বের দুই পক্ষকেই ক্ষত-বিক্ষত হ'তে হ'য়েছে—ক্ষতি স্বীকার করতে হ'য়েছে। দুই শিবিরের মাঝে পড়ে জয়সিংহের মতো একটি মহাপ্রাণ যুবককে অকালে শোচনীয় অপমৃত্যু বরণ করতে হ'য়েছে। দুই শিবিরেরই ক্ষতির মাত্রা যেখানে সমান সমান হয়, সেখানেই মুখ্য উপস্থাপ্য নিরূপণ করা বেশ একটু দুঃসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। এখানেও সেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানে গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতি দু'জনেই প্রতিস্পর্ধী।

গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে ট্র্যাজেডির যে রূপটি ব্যক্ত হ'য়েছে, তা' হ'চ্ছে—মহাপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ঐকান্তিক, ধর্মনিষ্ঠার প্রেরণায় আপোষ-

হীন সংগ্রাম করার এবং তদানুষঙ্গিক দুঃখদুর্দশা ভোগ কারর ট্র্যাজেডি।—ঐকান্তিক আদর্শ নিষ্ঠাই তাঁর ট্র্যাজেডির কারণ। অন্তপক্ষে রঘুপতির ট্র্যাজেডি—ধর্মের নামে নিষ্ঠুর আচার ও অহংকারকে সেবা করে যে, এমন এক প্রতাপ-মোহগ্রস্ত হিংসাপরায়ণ ব্যক্তির অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণের এবং হাতে হাতে সেই নিষ্ঠুর আত্মঘাতী আচরণের প্রতিফল পাওয়ার ট্র্যাজেডি—হৃদয়ের যে বস্তু হারিয়ে সংসারে বাঁচা না-বাঁচারই সমান, সেই প্রাণতুল্য অমূল্য বস্তুর বিনিময়ে মোহমুক্তি ক্রয় করার ট্র্যাজেডি—ভুলের ফসলে জীবনের ক্ষেত্র ভরে যাওয়ার 'পরে ভুলভাঙার যে ট্র্যাজেডি সেই ট্র্যাজেডি।

কিন্তু এই ট্র্যাজেডির 'আইডিয়া' বা ভাব যত মহিমময়ই হোক, রূপটি তত অনবদ্য হ'য়ে উঠেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর "লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি"র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরিষ্টলের ভাষায় বলা যেতে পারে এখানে জীবনের রূপ যে উপস্থাপিত হয়েছে তারা "as they are' না হ'য়ে "as they ought to be" হ'য়ে গেছে এবং অধিকমাত্রায়ই তা হ'য়েছে। প্রত্যেক শিল্পই "idealized imitation" বটে, কিন্তু "idealization'-এর মাত্রা বেশী বেড়ে গেলে 'বাস্তবিকতার মায়া' নষ্ট হ'য়ে যায় এবং উপস্থাপনা ভাবতান্ত্রিকতার (Idealism) এবং সাংকেতিকতার (Symbolism) সীমারেখায় পৌঁছে যায়। নাটকের পক্ষে "জীবনের মায়া" অপেক্ষিত ব'লেই ভাবতান্ত্রিকতার আধিক্য বা অতিসাংকেতিকতা দোষ ব'লেই স্বীকার্য। নাটকে পাত্রপাত্রীর পক্ষে ভাবের বাহন হওয়াই যথেষ্ট নয়, শ্রেণী-সত্তার এবং ব্যক্তি-সত্তার দিক দিয়েও তাঁদের স্বাভাবিক তথা বাস্তবিককল্প হ'য়ে উঠা চাই। বাস্তবিককল্প হ'য়ে ওঠার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি অপরিস্ফুট বা অসম্পূর্ণ ব'লে মনে হবে। ভাবের বাহন হিসাবে তারা যত সুন্দর, রক্তমাংসের গোটা মানুষ হিসাবে তত অভি-

ব্যক্ত বা সুন্দর নয়। এই কারণে নাটকে যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে তা যতটা ভাবের দ্বন্দ্ব হ'য়েছে, ততটা বাস্তবকল্প জীবনের দ্বন্দ্ব হ'য়ে উঠতে পারেনি—রক্তমাংসের মানুষের দ্বন্দ্ব হ'তে পারেনি। পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বাস্তবিকতার বা স্বাভাবিকতার ঘাটতি থাকে ব'লে, সব দ্বন্দ্বই যেন শেষ পর্যন্ত ছায়াবাজি ব'লে মনে হয়। যদিও ভাবের অভিব্যক্তি, তার আবেগ-তীব্রতা কল্পনা-মাধুর্য, ভাবনা-বৈভব দিয়ে সাময়িকভাবে "suspension of disbelief" সৃষ্টি করে বলেই বাস্তবিকতার বা স্বাভাবিকতার অভাব তত মারাত্মক ব'লে মনে হয় না, তবু একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই, ঔচিত্য-বোধ বাধা পায় এবং 'কিন্তু' না তুলে পারে না। সাহিত্যের জগৎ কল্পনার জগৎ হ'লেও, ঔচিত্য-বোধের ধার কম বা বেশী তাকে ধারতেই হবে। তার নিজের গণ্ডীর মধ্যে, তাকে জীবন-সম্পর্কের একটা সুসঙ্গত রূপ হ'য়ে উঠতে হবে।

আর একটি কথা বলেই, এই বিষয়ের উপসংহার করব। কোনো কোনো সমালোচক গোবিন্দমাণিক্য-রঘুপতির দ্বন্দ্বের মধ্যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম—'ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ শক্তির দ্বন্দ্ব' এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। "বাহুবল রাহুসম ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে"—নিশ্চয়ই এই দ্বন্দ্বের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন—"গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির দ্বন্দ্ব এক হিসাবে ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ শক্তির দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে, অন্তত রঘুপতির মতে।" অন্তত রঘুপতির মতে—যাই হোক, আসলে এই দ্বন্দ্বটি ব্রহ্মতেজ গ্রাস করবার জন্য ক্ষত্রিয়ের চক্রান্ত বা সংগ্রাম নয়। ডাঃ সেন মহাশয়ও তা উপলব্ধি করেছেন ব'লে—'অন্ততঃ রঘুপতির মতে' বলেছেন। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—লেখক শ্রীযুক্ত

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই দ্বন্দ্বের মধ্যে—'রাজশক্তির সহিত পুরোহিত শক্তির সংগ্রাম' লক্ষ্য করেছেন এবং 'রঘুপতির চরিত্র পরিকল্পনায় যে পাশ্চাত্য প্রেরণাই কার্যকরী হইয়াছে' সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য "পাশ্চাত্য কোন কোন নাটকে রাজশক্তির সহিত পুরোহিত-শক্তির যে সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, রঘুপতির পরিকল্পনা সেই শ্রেণীর পুরোহিত-শক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহা যেন আমাদের সমাজে এক অভিনব শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রঘুপতি রাজার রাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহার সমান শক্তিলাভের অভিলাষী। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসে পুরোহিত শক্তির এমন ঔদ্ধত্যের পরিচয় খুব সুলভ নহে; সেইজন্য রঘুপতির চরিত্র পরিকল্পনায় যে পাশ্চাত্য প্রেরণাই কার্যকরী হইয়াছে তাহা অনুমান করিতে ভুল হয় না।" আমার ধারণা, বিসর্জন নাটকে রাজশক্তির সঙ্গে পুরোহিত-শক্তির দ্বন্দ্বের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তা আপাত সাদৃশ্যমাত্র। বিসর্জনের রাজা ব্রহ্মতেজকে গ্রাস করতে চান না—মুক্ত করতে চান।

চিত্রাঙ্গদা (রচিত—১২৯৮, ভাদ্র, প্রকাশিত ও ১২৯৯ ভাদ্র)

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য-নাট্য রচিত হয়......উড়িষ্যায় জমিদারি তদারক কার্যে নিযুক্তকালে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে—১২৯৮ সালের ভাদ্রমাসে এবং প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালের ভাদ্রমাসে। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী কাহিনীহিসাবে সামান্য হ'লেও চিত্রাঙ্গদার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সামান্য নয়। বেশই অসামান্য। কোমলস্বভাবা নারীর বিপরীত সে—সে "কঠিন নারী"ই বটে। এই "unwomanly woman"—কে সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও ভুলতে পারেননি।

'চিত্রাঙ্গদা'-নাটকের "সূচনা"য় কবি নিজেই চিত্রাঙ্গদা-রচনার

প্রেরণার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতির বুকে একদিকে 'ফুলের রঙের মরীচিকা' অন্যদিকে 'অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভার'—দেখে হঠাৎ কবির মনে হ'ল "সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তা'হ'লে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে।……যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র-শক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎলাভ, যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়।……এই চরিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল………সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।" 'কিছু রূপান্তর' সম্বন্ধে অনুমান করতে হ'লে, কাহিনীটির আকর্ষণ-শক্তি বিশ্লেষণ করলে সুবিধা হবে। আধুনিক মনের কাছে কাহিনীর প্রথম আবেদন চিত্রাঙ্গদার পৌরুষপ্রবল নারীত্বের দিকটি কারণ—'শুধু ক্রন্দনের অধিকারী' যে নারী—আজন্মবিধবা যে নারী "নির্বাক ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা নিশীথ নয়নজলে কয়য়ে পালন, দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে"—যে নারী "লতিকার মতো…নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত"—এই অবলা ও অবোলা নারীর স্থলে—'যামিনীর নর্ম-সহচরী" "দিবসের কর্মসহচরী" 'সরল উন্নত-বীর্যমন্ত অন্তরের বলে' এমন চরিত্র-শক্তিময়ী নারীকেই আধুনিক মন কামনা করেছে। (ইউরোপীয় মহিলা দেখেই এই কামনাই বেশী ক'রে জেগেছিল)। এই নতুন কামনার মদ পান করার যতগুলি পুরাতন পাত্র আছে তার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা অন্যতম এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষক। চিত্রাঙ্গদার রূপ তার চরিত্র-শক্তি। চরিত্র-শক্তিই ধ্রুবসম্বল; সুতরাং তা' অক্ষয়। চরিত্র-শক্তির নিত্য ভিত্তির ওপর নরনারীর প্রেম যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সেই প্রেম আদর্শ মিলন রচনা করে।

যুগলজীবনের জয়যাত্রায় ধ্রুবসম্বল চারিত্র-শক্তি—এই কথা মনে জাগতেই, কবির মনে জেগেছে বহুপঠিত 'কুমারসম্ভব' কাব্যের ভাব-বস্তুর কথা। এই কাব্যই কবির মনে আদর্শ প্রেমের তত্ত্বটি মুদ্রিত করে দিয়েছিল। রূপজ মোহে যে মিলন ঘটায় সে মিলনের ঘটক কাম। সে মিলনে দেহই দেহকে চায়। কিন্তু যে মিলন ঘটে মোহমুক্ত অন্তরের 'ভাবৈকরস'-এর প্রেরণায়, সেই মিলনই প্রকৃত মিলন—অন্তরে-অন্তরে-মিলের মিলন—চারিত্র-শক্তির ধ্রুবসম্বল নিয়েই সেখানে মিলিতজীবনের জয়যাত্রা।

এই প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে চারিত্রশক্তিময়ী নতুন নারীর আদর্শ মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা রচনা করেছেন। এই নতুন নারীর দাবী

—" দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখেদুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।".

'চিত্রাঙ্গদা' অনেকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে এর নাটকীয়ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নটি রবীন্দ্র-নাটক-সম্পর্কিত সেই পুরাতন প্রশ্ন—নাটক না কাব্য, সেই প্রশ্ন। এ সমস্যা সম্পর্কে 'আমার যা বক্তব্য তা' আগেই বলেছি—বলেছি—'কাব্যিক নাটক' স্বীকার করতে গেলে—করতে অবশ্য বাধ্য—, কবিত্বময় উক্তি অপাংক্তেয় বলে ঘোষণা করলে চলবে না ; উক্তির ঔচিত্য তথা নাটকীয়ত্ব

বিচার, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য রূপটিকে মানদণ্ড করেই করতে হবে।

'চিত্রাঙ্গদা'র উক্তি-প্রভৃতিতে নাটকীয় ধর্ম আছে কি না—এই সূত্র প্রয়োগ করেই করা উচিত। প্রচলিত নাট্য-সংজ্ঞার দিক দিয়ে—বা বাহ্য ধর্মের দিক দিয়ে অনাটকীয় ব'লে মনে হ'লেও, অন্তরে অন্তরে চিত্রাঙ্গদা নাট্য-ধর্মান্বিত হ'য়েছে কি না অবশ্যই বিচার্য বিষয়। নাটক তো দূরের কথা, 'নাট্যকাব্য' বলতেও কোন কোন সমালোচক কুণ্ঠিত। কিন্তু শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থ সিদ্ধান্তই করেছেন—"কতকগুলি আদর্শচরিত্রের সহায়তায় একটি তত্ত্ব-কথাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে যে ইহার নাট্যিক মূল্য খর্ব্ব হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহার প্রধান চরিত্র দুইটি মধ্যে অন্তরের যে সূক্ষ্ম ভাব-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার নাট্যিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার মধ্যে কামনার উদ্দামতা, আশাভঙ্গের নৈরাশ্য, মিলনের আনন্দ, লালসার তৃপ্তি, ভোগের অবসাদ, পরিপূর্ণ আত্মনিমজ্জনের ও আত্মসচেতনতার যে মানসচিত্র পাওয়া যায়, তাহা পাঠকের নাটকীয় ঔৎসুক্য কখনও শিথিল হইতে দেয় না।" বাস্তবিকই এত 'অপরূপ নাট্যিক গৌরব' থাকা সত্ত্বেও "নাট্যকাব্য আখ্যানও সমীচীন হবে না" এ কথা বলা যায় কি ?

গোড়ায় গলদ (১৮৯২) ও শেষরক্ষা (১৯২৮)

এই নাটকখানি রচিত হয়—নিছক আমোদ-প্রমোদ দেওয়ার প্রেরণায়—"ভারতীয় সংগীত সমাজ"-এর সভ্যদের 'আমোদ-অনুষ্ঠানের চাহিদায়। রবীন্দ্রনাথের সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন। সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও যোগ ছিল অতিঘনিষ্ঠ। নিছক আমোদ দেওয়ার পক্ষে 'প্রহসন'ই একমাত্র

উপায়। রবীন্দ্রনাথও সেই উপায়ই অবলম্বন করেন—গোড়ায় গলদ প্রহসনখানি রচনা করেন। 'কমেডি-অফ-এর'র-জাতীয় নাটকের গোড়ায় সাধারণতঃ যে গলদ থাকে এখানেও তা' কিছু কিছু আছে। পাত্র-পাত্রীকে ভ্রান্তির চক্রে ঘুরপাক খাওয়াতে হ'লে ভ্রান্তির আটঘাট শক্ত করেই বাঁধা দরকার। বাঁধুনি শক্ত না হ'লে রসের তেজ কমে যায়। এই সব নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত থাকে তার পরিস্থিতি হাস্যোদ্দীপকতার মধ্যে, চরিত্রের কায়িক-মানসিক ও বাচনিক বিকৃতির অর্থাৎ আচরণের কৌতুককরতার মধ্যে। নাট্যকার যেখানে পরিস্থিতি-গুলিকে একই সঙ্গে স্বাভাবিক অনিবার্য এবং হাস্যোদ্দীপক করতে পারেন, সেখানে তার কৃতিত্ব বেশী প্রকাশ পায়। পরিস্থিতি, ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রীর কায়িক-মানসিক-বাচনিক আচরণ যত বেশী 'কিন্তু'হীন হয় তত রচনা নিখুঁত হয়। গোড়ায়-গলদ এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ গলদহীন হ'তে পারেনি। তবে সব গলদ ভুলিয়ে দেয় বাক্‌কেলিকুশল রবীন্দ্রনাথের রসিকতাপূর্ণ সংলাপ।

কিন্তু গোড়ায় গলদ কি শুধু পাত্র-পাত্রীর ভ্রান্তির মধ্যেই? গোড়ার আগেও তো গোড়া আছে—জীবনের মূলেই রয়েছে এই গলদের জড়—প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার প্রাণের খেলা। এই নাটক-রচনার ছত্রিশ বৎসর পরে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকখানির পুনর্লিখিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং নামকরণ করেন—"শেষরক্ষা।" প্রারম্ভে গোড়ায় গলদ। পরিণতিতে শেষরক্ষা। দু'একটি পরিবর্তন, কয়েকটি গান-যোজনা এবং সংলাপের বাঁকা বাঁকা পাকা কথা—এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি।

বিদায় অভিশাপ (১৮৯৫)

কচ-দেবযানী সংবাদকে, এখানে একটিমাত্র দৃশ্যে রূপ দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষাসমাপনের পর, কচ দেবযানীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন—এইটুকু হ'লো বাইরের রূপ। এই দেহের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি ভাব-আত্মাকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন—প্রেমের উপরে কর্ত্তব্যের আসন নির্ধারণ ক'রেছেন—ব্যক্তিগত স্বার্থের বা প্রেমের ঊর্ধ্বে জাতিগত স্বার্থকে—শ্রেয়কে তুলে ধরেছেন ; বড় রকমের আত্মত্যাগ ক'রেও, জাতিস্বার্থ সাধন করতে হবে—এই প্রেরণা সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন। নারী-স্বভাব এবং পুরুষ-স্বভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ একটি ধারণা আছে—(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী) সেই ধারণাটি এখানে পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। বিদায়-অভিশাপ একটিমাত্র দৃশ্য এবং সেই হিসাবে খুবই ছোট বটে কিন্তু ভাব-গভীরতা, কল্পনা-মহিমা এবং নাটকীয় গৌরব এর একটুও কম নয়।

মালিনী (১৮৯৬)

"মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।......তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল...তারক পালিতের বাসায়।...গোলমালে রাত হয়ে গেল। তাই পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম।...স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্ত্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতে শিকল তার মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।" কেন রবীন্দ্রনাথ এই স্বপ্নটি দেখেছিলেন তা' নিয়ে

অবশ্যই গবেষণা করার অবকাশ আছে। স্বপ্নের মধ্যে বিদ্রোহের উপলক্ষ্য উল্লিখিত থাকলে বোঝা যেতো—বিদ্রোহটি আসলে রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক অথবা—প্রেমনৈতিক। যা'ই হোক, এই স্বপ্ন-কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ছিল। পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের—Sanskrit Buddhist Literature in Nepal-গ্রন্থের মহাবস্তু-অবদান-এর একটি কাহিনীর উদ্দীপনায়, স্বপ্নলব্ধ কাহিনীটি আত্মপ্রকাশের সুযোগ ক'রে নিয়েছিল।

মালিনী নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বন্দ্বের পটভূমি রচনা ক'রে—শাস্ত্রধর্ম ও প্রেমধর্মের দ্বন্দ্বটিকেই নতুন আকারে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন এবং মুখপাত্র সুপ্রিয়কে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন—'যে-শাস্ত্রের অনুগামী এ ব্রাহ্মণ, সে-শাস্ত্র কোথাও লেখে নাই—শক্তি যার ধর্ম তার; শুধু—যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাসকেই ধর্ম বলে মানা মূঢ়তা; স্বর্গধাম মিথ্যা, দেবদেবী মিথ্যা—আসল ধর্ম—সত্য, দয়া, জীবে প্রেম। প্রেমধর্ম—হৃদয়ের ধর্ম এবং সেই ধর্ম ই প্রকৃত ধর্ম। প্রেমময় এবং করুণাময় মানবের হৃদয়েই দেবতার আসন। মানুষের প্রেম ও করুণার রূপ ধরেই দেবতা মর্তে বিরাজ করছেন—"বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা আপন করিতে হবে—যে কিছু বাসনা শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।" যাগযজ্ঞের তপস্যায় কভু মুক্তি নয়—মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে"—"যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেম স্নেহ, যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।" এই নব ধর্মের জীবনকেই রবীন্দ্রনাথ সুপ্রিয়ের মৃত্যুস্নানে শুচি ক'রে তুলেছেন। সুপ্রিয়ের হত্যাকারী ক্ষেমঙ্করের জন্যেও করুণাময়ী মালিনী ক্ষমা ভিক্ষা করেছে। সুপ্রিয় ভক্তির পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণ দিয়ে, মালিনী ধর্মের পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণাধিকপ্রিয় সুপ্রিয়ের হত্যাকারী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা ক'রে। ভাবালুতার আধিক্যে, ক্ষেমঙ্কর ছাড়া কোনও চরিত্রই

রক্তমাংসের মানুষ হ'তে পারেনি। মালিনী, মালিনীর মা ও বাবা, সুপ্রিয় কেউই তেমন পরিস্ফুট ব্যক্তিত্ব লাভ করেনি।

বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭)

সংগীত সমাজের চাহিদা পূরণ করবার জন্য এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাখানি রচিত। বৈকুণ্ঠের খাতা অতিবহু-অভিনীত নাটক। স্কুল-কলেজের আনন্দানুষ্ঠানে বৈকুণ্ঠের খাতার প্রদর্শন হামেশাই হ'য়ে থাকে। মানুষের মনের রহস্য যাঁরা জানেন, তাঁরাই বলে থাকেন—বায়ুহীন স্থানের মতোই বাতিকহীন ব্যক্তি অসম্ভব ; প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বাতিক আছে। বৈকুণ্ঠের খাতায় এই বাতিক ভিত্তি করেই সার্বজনীন আবেদনের কয়েকটি হাস্যোদ্দীপক চরিত্র এবং পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। এতে কোন ব্যক্তিকে বা শ্রেণীকে হাস্যাস্পদ করার জন্য ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা নেই ; কোন বিশেষ কালের রীতি-নীতিকে উপহাস্য করবার অভিপ্রায় নেই। ফলে, বিশুদ্ধ প্রহসন ব'লতে যে-জাতীয় কমেডি বুঝায়, যা শুধুই "dramatising the ludicrous" এ সেই জাতীয় রচনা। কিন্তু নাটকখানির প্রাণ নিছকহাস্যোদ্দীপক হালকা ঘটনার মধ্যে নিহিত নেই, এর প্রাণশক্তি রয়েছে রসিকতাপূর্ণ সংলাপের মধ্যে—কৌতুকজনক পরিস্থিতির মধ্যে। এই নাটিকায় হাস্যরসই অঙ্গীরস বটে, কিন্তু একমাত্র রস নয়। এখানে করুণ-রস মিশিয়ে হাসিকান্নার গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম সৃষ্টি করা হ'য়েছে।

হাস্যকৌতুক (১৯০৭)

এই নাট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "য়ুরোপে শারাড (Charade) নামক একপ্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।" 'শারাড' নামক এই কৌতুকনাট্যগুলিকে "হেঁয়ালি-নাট্য"ও বলা হ'য়েছে। 'শারাড'-এর

সংজ্ঞা "ডিকসানারি অফ্ ওয়ার্লড্ 'লিটারেচার'-গ্রন্থে এইভাবে দেওয়া হ'য়েছে—The charade is an enigmatic description (written or acted) of a word and its separate syllables. "এই হেঁয়ালি নাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকে আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"

'হাস্যকৌতুক'-গ্রন্থে এই নিম্নলিখিত নাট্যগুলি আছে ঃ—

১।	ছাত্রের পরীক্ষা	(১২৯২)	—দৃশ্যসংখ্যা—১
২।	পেটে ও পিঠে	(১২৯২)	— ,, ৩
৩।	অভ্যর্থনা	(১২৯২)	— ,, ৩
৪।	রোগের চিকিৎসা	(১২৯২)	— ,, ২
৫।	চিন্তাশীল	(১২৯২)	— ,, ২
৬।	ভাব ও অভাব	— ০	— ,, ১
৭।	রোগীর বন্ধু	— (১২৯২)	— ,, ১
৮।	খ্যাতির বিড়ম্বনা	— (১২৯২)	— ,, ২
৯।	আর্য ও অনার্য	— (১২৯২)	— ,, ১
১০।	একান্নবর্তী	(১২৯৪)	— ,, ১
১১।	সূক্ষ্মবিচার	(১২৯৩)	— ,, ১
১২।	আশ্রমপীড়া	(১২৯৩)	—দৃশ্যসংখ্যা—৬
১৩।	অন্ত্যেষ্টি-সংকার	(১২৯৩)	— ,, ৩
১৪।	রসিক	(১২৯৩)	— ,, ১
১৫।	গুরুবাক্য	(১২৯৩)	— ,, ১

ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭)

নামেই প্রকাশ—'ব্যঙ্গকৌতুক' বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক মাত্র নয় ব্যঙ্গাশ্রিত কৌতুক। ব্যঙ্গকৌতুক-এর সব কয়টি রচনাই দৃশ্য-বা নাট্য

নয়। অভিনয়-যোগ্য করে যে কয়টি রচনা করা হ'য়েছে, তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১। **সারবান সাহিত্য।** পূর্ণাঙ্গ নাটক না ব'লে পঞ্চাঙ্ক নাটকের খসড়া বলা যেতে পারে। উদ্দেশ্য—সাহিত্যে যাঁরা শিক্ষা খোঁজেন তাঁদের ব্যঙ্গ করা।

২। **নূতন অবতার।** এক এক উক্তিতে এক একটি অঙ্ক—এমনি তিনটি অঙ্কের নাটিকা প্রথম অঙ্কের বক্তা—নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের বক্তা—রুদ্রনারায়ণ বকশি।

৩। **অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি।** ইংরেজিতে যাকে Monodrama বলে এ সেইজাতীয় রচনা। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র এইজাতীয় রচনাকে বলেছে "ভাণ॥"

৪। **স্বর্গীয় প্রহসন।** (দৃশ্য—১টি=ইন্দ্রসভা)

৫। **বশীকরণ।** (পঞ্চাঙ্ক নাটিকা)

৬। **স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক।** (১টি দৃশ্য)

শারদোৎসব (১৯০৮, ২০শে সেপ্টেম্বর)

শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসব প্রবর্তিত হয় ১৩১৩ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন (১৯০৭, ফেব্রুয়ারী ১৭)। প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে (১৯০৭ নভেম্বর) কিছুদিনের জন্য বন্ধ থেকে ; ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবার ঋতু-উৎসব আরম্ভ হয়। এই সময় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিচালনায় প্রথম বর্ষা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরে শারদোৎসব হয় এবং উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ "শারদোৎসব" নাটক রচনা করেন (১৩১৫, ৭ ভাদ্র)।

এই নাটকের 'ভিতরের কথাটি' রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিকবার ব্যাখ্যা ক'রেছেন। ১৩৫৪ সনের সংস্করণের শেষে যে গ্রন্থপরিচয়

দেওয়া হ'য়েছে, তা'তে এই সকল ব্যখ্যা সংগৃহীত হ'য়েছে। এখানে তাঁদের পুনঃসংগ্রহের প্রয়োজন নেই।

এখানে এই কথাটিই বিশেষভাবে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—তাঁর সমস্ত কাব্যে 'একটিমাত্র পালা'ই তিনি গান ক'রেছেন; এখানেও সেই পালারই কথা ও সুর শোনা যায়। বিশ্বরূপের সীমার মাঝে অসীমের লীলা চলছে; তাঁর উপলব্ধিতেই সত্যোপলব্ধি, তাঁর উপলব্ধিতেই প্রকৃত মুক্তি, প্রকৃত আনন্দ এবং সেই আত্মোপলব্ধির সাধনাতেই তথা আত্মপ্রকাশেই প্রকৃত সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের এ অনিবার্য সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের আলোকে রেখে দেখলে দেখা যাবে—জগৎপ্রকৃতি এবং মানব-প্রকৃতি—এই দুই প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের সহজ যোগে যুক্ত হ'তে না পারলে মানবাত্মার মুক্তি নেই, আনন্দ নেই—এই তত্ত্বটিই, শারদ-প্রকৃতিকে পটভূমি হিসাবে রেখে, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিকে অনাত্মীয় করে রাখলে আত্মাকেই খণ্ডিত করা হয়। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির বুকে যে সৃষ্টির স্পন্দন জাগে, সেই স্পন্দনের সঙ্গে হৃদয় যদি অনুস্পন্দিত বা সংবাদিত না হয়, তা'হ'লে মানুষ বিশ্বানুভূতির অনেকখানিই হারিয়ে ফেলে। হৃদয় দিয়েই বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয়খানি অনুভব করতে হবে। কোন পুঁথিপড়া বিদ্যা এই অনুভবের অভাব মেটাতে পারে না। আত্মসমর্পণের সহজ যোগ ছাড়া একে পাওয়া যায় না। আসক্তি ও অহংকারই এই সহজ যোগের প্রধান অন্তরায়। কারণ আসক্তি ও অহংকারই সামঞ্জস্যের অন্তরায়। আসক্তি লক্ষেশ্বরের মতো লোভার্ত হয়ে বিষয় আত্মসাৎ করতে চায়, যক্ষের মতো ধন আগলে রাখতে চায়; আর অহংকার ক্ষমতায় সকলের চেয়ে বড়ো হ'তে চায়—রাজার উপরে অধিরাজ রাজচক্রবর্তী হ'তে চায়। চিত্তের দ্বার যে ভাবেই রুদ্ধ হো'ক, রুদ্ধ হ'লেই মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। এই বিচ্ছেদ দূর করবার একমাত্র উপায়—সবার সাথে যোগ স্থাপনা করা।

ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়” সুতরাং ভানুসিংহের পত্রাবলীতে কবি যে লিখেছেন —“ওটা হ’চ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির।...... তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হ’চ্ছে—‘বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা’—এ কথা ঠিক নয়। সুতরাং কবির এ কৈফিয়ৎও ঠিক না যে শারদোৎসব নাটক—“গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।” ‘কিছুই-না গোছের জিনিস’ই যদি হতো, তবে রবীন্দ্রনাথ এত ব্যখ্যা ক’রে ‘ভিতরকার কথা’ বলতেন না এবং শারদোৎসব থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছেন সবগুলিই ‘কিছুই-না গোছের জিনিস’ হ’য়ে যেতো। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন—“শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই।” মোটকথা পালার বিষয়টা ‘অনর্থক’ নয়।

উপসংহারে, রবীন্দ্রনাথ নাটকখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ১৩২৯ সালে যে ভূমিকা লিখেছিলেন সেই ভূমিকাতে নাটকের জাতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই নাটকে—গল্প “নেই বল্‌লেই হয়”; ‘যুদ্ধ’ নেই, ‘রক্তপাত’ নেই, ‘আত্মহত্যা’ ‘পতন ও মূর্চ্ছা’ নেই, ‘আদিরস’ ‘বীররস’ ‘করুণ রস’—কোনটাই নেই—যা’ আছে—তা’ ‘খুব হালকা রকমের ব্যাপার’। রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চান—তার নাটকের কৌতূহল গল্পের মধ্যে ঘটনার মধ্যে বা রসের মধ্যে নিহিত নয়; কৌতূহল-কেন্দ্র র’য়েছে অন্যত্র—ভাবের মধ্যে, সংলাপের মধ্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রচলিত নাটকের ধারা থেকে পৃথক। এ কথা সত্য বটে যে প্রত্যেক রচনাই এক হিসাবে ভাবকেন্দ্রিক;

কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যেক রচনাই যে ভাবতান্ত্রিক হবে এমন কোন কথা নেই। ভাবের দৈহিক প্রকৃতিকে অর্থাৎ রচনাকে আমরা রূপতান্ত্রিক, ভাবতান্ত্রিক এবং সাংকেতিক—মোটামুটি এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। রূপতান্ত্রিকতা রবীন্দ্রনাথের রচনায় কম। তাঁর রচনা প্রধানতঃ ভাবতান্ত্রিক এবং অনেক স্থলে রূপকাশ্রয়ী ও সাংকেতিক। এখান থেকেই রূপক-প্রবণতা বেশ সংলক্ষ্য আকারে দেখা দিয়েছে।

আর একটি কথা বলেই 'শারদোৎসব'-আলোচনা শেষ করছি। এই নাটকেই—প্রথম 'রক্তকরবীর রাজা'র বীজ পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী যেখানে বলছে—কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে এ কখনই হতে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে যে ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে।' সেখানেই রক্তকরবী নাটকের 'রাজা' চরিত্রের ভ্রূণাবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

মুকুট (১৯০৮)

"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে 'বালক' পত্রে প্রকাশিক 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত"—এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। ত্রিপুরার রাজপরিবারের কাহিনী অবলম্বন করে 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' এবং নাটিকাখানি রচিত হয়েছে। কৌশলী কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর, বীর মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার এবং নির্মলপ্রাণ ভ্রাতৃবৎসল যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য এই তিন রাজকুমারের আত্ম ও প্রাত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং নির্মল প্রাণের জয় বা মুকুট লাভ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানেও শক্তিমত্তা-বীর্যবত্তা-বুদ্ধিমত্তার উপরে হৃদয়বত্তার মহিমাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। যে হৃদয়বান সেই প্রকৃত শক্তিমান, জীবনযুদ্ধে তাঁর যে পরাজয় ঘটে তা আপাত পরাজয়; সমস্ত দেশ নয়,

সমস্ত হৃদয় জয় করেই সে রাজচক্রবর্ত্তীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত জয়ীর মুকুট তাঁর শিরেই শোভা পায়।

প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)

প্রায়শ্চিত্ত নাটকখানি লেখা হয় ১৩১৫ সালে (১৯০৮) এবং প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১১৮৯ পৌষ) নামক উপন্যাস থেকে এই নাটকের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হ'য়েছে। এই উপন্যাসখানি অবলম্বন ক'রে কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় আগেই "রাজা বসন্ত রায়" নামে একখানা নাটক লেখেন এবং অভিনয় করান। বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ একটি ভাবাদর্শকে সমাজের মধ্যে প্রচার বা সঞ্চার করবার প্রেরণায়, উক্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তুটিকে ব্যবহার করেন এবং "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক রচনা করেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' লেখার প্রেরণা খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং তখনকার রাজনৈতিক আবেগ দু'দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হ'বে। রবীন্দ্রনাথের দেবতা-দর্শনে 'রুদ্রে'র জন্য বিশিষ্ট একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ কোনো ক্ষেত্রেই—কি ব্যক্তিজীবনের সাধনায়, কি জাতি-জীবনের সাধনায়, রুদ্র-পন্থাকে শ্রেয়ঃ বলে মনে করতে পারেননি। যদিও তিনি স্বীকার করেন অনন্তের ইচ্ছা ব্যক্তির ইচ্ছা আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে, শিবের ইচ্ছা যেমন ব্যক্তির ইচ্ছা আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পায়, তেমনি রুদ্রের ইচ্ছাও ব্যক্তির ইচ্ছা আশ্রয় করে—'পাপের মার্জনা' ক'রে থাকে, তবুও তিনি রুদ্রের দারুণ দীপ্তিকে, মনে মনে স্বীকার করলেও, প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে কেমন যেন কুণ্ঠিত হ'য়েছেন। সত্য বটে—পাপের মার্জনার দিন যখন আসে, যেদিন দহনযজ্ঞ সুরু হ'য়ে যায় সেদিন সেই প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করতে কুণ্ঠিত

হননা—"সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে, ঘরে ঘরে, দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো, দুঃখের দ্বারা মার্জনা করো" (৯ই ভাদ্র ১৩২১), কিন্তু এই প্রার্থনার শেষদিকে রক্তপাত করার, অগ্নিবৃষ্টি করার যে রুদ্র দায়িত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হ'য়েছে, সেই দায়িত্ব যে পালন করে রবীন্দ্রনাথ তাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ ক'রতে পেরেছেন কি ? এ কথা মানতেই হবে—রুদ্র পাপকে যে আঘাত করবেন সে আঘাত নিশ্চয়ই মানুষের হাত দিয়েই করবেন, সে আঘাত নিশ্চয়ই দারুণ মর্মভেদী আঘাত হবে এবং নিষ্ঠুর আচরণের রূপেই তা' প্রকাশ পাবে। সুতরাং যে রুদ্রের 'নিমিত্তমাত্র' হ'য়ে পাপকে আক্রমণ করবে, তার নিষ্ঠুর আচরণ অবশ্যই নিষ্কাম কর্মযোগের, ধর্ম-সাধনার অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হওয়া উচিত। এই ধরণের নিষ্কাম নিষ্ঠুর কর্মের সমর্থন রবীন্দ্রনাথে যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তা' নয়। যখন 'বীরের দল ইতিহাস-বিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে'—রবীন্দ্রনাথ জয়ধ্বনি করেছেন ; যখন 'কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে'—'মরণযজ্ঞে প্রাণের মহোৎসব' হ'য়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-বিধাতার আনন্দকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাক্যত রবীন্দ্রনাথ যা'ই করুন না কেন কার্যতঃ তিনি রুদ্রের 'নিমিত্তমাত্র' কোনো সব্যসাচীকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মধ্যে হিংসার প্রতি, উন্মত্ততার প্রতি একটা সহজ ঘৃণা ছিল ব'লেই পারেননি। তিনি অন্তরে অন্তরে শান্তরসের রসিক। প্রেমভক্তির—সংস্কারটিই তাঁর মধ্যে বলবান। তাঁর জীবনসাধনায়, জ্ঞানের এবং প্রেমেরই প্রাধান্য। যদিও জ্ঞান-প্রেম-কর্মযোগের সামঞ্জস্য তাঁর আদর্শ, তবু প্রেমযোগকেই তিনি সব যোগের উপর স্থান দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের মূলে ফিরে গেলে এই সংস্কারের কারণটি

খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি এ বিষয়ে নিজেই সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন লিখেছেন—"আমার থাকাটা **শক্তির প্রকাশ** না **প্রীতির প্রকাশ** এইটে যে যেমন মনে করে সে সেই ভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহংকারের যেদিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক উল্‌টো দিকে।" (কালান্তর—বাতায়নিকের পত্র)। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আমাদের থাকাটা 'প্রীতির প্রকাশ'—'শক্তির প্রকাশ' নয়। এই দৃষ্টিতে আসল পাপ হ'চ্ছে ভেদ, সে ভেদ স্বদেশবাসীর সঙ্গেই হোক আর বিদেশীর সঙ্গেই হো'ক। ভেদেই অধর্ম, অভেদেই ধর্ম। এই ধর্মের পথ দুর্গম। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন......ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া" (প্রবাসী, ১৩১৫)। ঘৃণার সঙ্গে হিংসার সঙ্গে এই ধর্মের কোনো যোগ নেই। এই ধর্ম কাউকে আঘাত করে না; আহত হ'য়েও প্রীতি প্রদর্শন করে। এই ধর্মের আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম এবং অন্তে প্রেম। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জাত-বৈষ্ণব।

এই কারণেই তিনি 'মারা'র মহিমার চেয়ে 'মরা'র মহিমাকেই বেশী ক'রে দেখিয়েছেন, পাপীকে বিনাশ করার চেয়ে পাপীর হৃদয় মার্জনা করার দিকেই, পাপকে সমূলে বিনাশ করবার দিকেই, জোর দিতে বলেছেন। আঘাত করার শক্তিই বড় শক্তি নয় আসল শক্তি চৈতন্যের উদ্বোধনে, আত্মাহুতি দিয়ে আত্মার দৈন্য দূর করায়, আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করায়। তাঁর মতে—ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব থেকে উদ্ধার পায়। অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি।" "ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য,

সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য।” তাঁর ধারণা—এই ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি দিয়ে পাপকে আঘাত করতে পারলেই পাপ মরমে মরে যায়। পাপকে সমূলে বিনাশ করবার অন্য কোন উপায় নেই। হিংসা দিয়ে আঘাত করলে শুধু পাপীর দেহটিকেই বিনষ্ট করা যায়, প্রেম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে পাপীর অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে দিতে পারলে, পাপের সমূলে—বিনাশ ঘটে। আর তা'তেই পাপের প্রকৃত মার্জনা। শক্তি দিয়ে যে জয়লাভ সে জয়লাভে পরাজিতের অন্তরে প্রতিহিংসার বীজ লুকিয়ে থাকে ; সুযোগ পেলেই সেই পরাজিত আঘাত হানতে চেষ্টা করে ; কিন্তু প্রেম দিয়ে যে জয় সে জয় শুধু দেহজয়মাত্রই নয়, সে জয় হৃদয়জয়। হৃদয়জয় করতে পারাই প্রকৃত জয়লাভ। তা'ই রবীন্দ্রনাথের কাছে সংগ্রাম মুখ্যতঃ হৃদয়জয়ের সংগ্রাম—প্রাণ দিয়ে প্রাণকে, প্রেম দিয়ে আত্মাকে জাগানোর তপস্যা। এই তপস্যাই আসল ধর্মসাধনা।

অধর্মের সঙ্গে আপোষ করে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার চেষ্টাকে রবীন্দ্র-নাথ কোনোদিনই প্রশংসা করেননি। যেন তেন প্রকারেণ লক্ষ্যে পৌঁছানোই তাঁর কাছে বড় কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ কোন ক্ষেত্রেই অধর্মাচরণকে সমর্থন করতে পারেননি। দেশের মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর একই কথা—“অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অব-লম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়……দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোনখানে ঠেকাইব ?……ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে।” (১৩১৫'ই ভাদ্র) এই দৃঢ় সংস্কার থেকেই তিনি বিপ্লবীদের রুদ্রপন্থাকে নিন্দার্হ বলে ঘোষণা

করেছেন—"ইহা নিশ্চয়ই মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" (১৩১৫—পত্র—শ্রীমতী নির্ঝরিণী কল্যাণীয়াসু)

মোটকথা কি ব্যক্তিজীবনের মুক্তিসাধনায়, কি জাতীয়-জীবনের মুক্তিসাধনায়—কোনো ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ হিংসাকে উপায় হিসাবে স্থান দিতে প্রস্তুত ন'ন। এই কারণেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে হিংসার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করতেই, তিনি পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন ; এবং আত্মশক্তির—আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমাকে সমস্ত শক্তির মহিমার উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই ফল প্রায়শ্চিত্ত নাটক।

এখানেও কিন্তু শক্তি-পূজার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে। অবশ্য এ প্রতিক্রিয়া রাজনীতির মন্দিরে শক্তি-দেবতা—পূজার এবং নরবলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। শক্তির উপাসক প্রতাপাদিত্য প্রভৃতিকে জাতীয় বীরের আসনে বসিয়ে জাতির মধ্যে শক্তি-সাধনার যে আবেগ এসেছিল, দেশমাতৃকার পূজার নাম ক'রে হিংসামন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করবার যে আয়োজন চলেছিল—"প্রায়শ্চিত্ত" তারই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিবাদ। নানা প্রবন্ধে ও পত্রে রবীন্দ্রনাথ এর নিন্দা করেছেন। প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীরের গৌরব দান করতে, তাঁর নিষ্ঠুর আচরণকে শক্তি-আরাধনার অঙ্গ ব'লে শোধন ক'রে নিতে, হিংসাকে পূজার অঙ্গ করতে রবীন্দ্রনাথ সম্মত হননি। তিনি প্রতাপকে প্রতাপমোহগ্রস্ত শক্তিমদমত্ত ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রতাপাদিত্যের অহং বিকৃত। সে অপ্রকৃতিস্থ পাপী, কারণ অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে। তার পাপের জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'য়েছে—

উদয়াদিত্যকে, বসন্তরায়কে, বিভাকে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো শুধু পাপীকেই করতে হয় না ;—"সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে।"

নাটকখানির নামকরণের তাৎপর্য ভাল করে উপলব্ধি করতে হলে, 'পাপ' ও 'পাপের মার্জনা, এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা সেই ধারণাটুকু জেনে নেওয়া আবশ্যক। 'রবীন্দ্র-মানস' আলোচনা প্রসঙ্গে পাপ ও পাপের মার্জনা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, এখানে 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, সেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ, সে যদি বেদনা পেত তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে।......সেইজন্য এক-এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে—**যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না**? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে?"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাতেই প্রায়শ্চিত্তের ধারণাটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে—তিনি লিখেছেন—"এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য **পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে এক জনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়,** কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।...এই জন্যই আমাদের সকলকে দুঃখ ভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না—**সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে।** যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না।...যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সামনে রেখে এ কথা অবশ্যই বলা যায় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে, প্রীতিতে-কোমল কতকগুলি হৃদয় দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রতাপাদিত্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। প্রতাপ শক্তিপূজা করতে গিয়ে জীবনের সামঞ্জস্য তথা মনুষ্যত্বই বিসর্জন দিয়েছেন। শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতেই তাঁর সব বাসনা ঘুরপাক খেয়েছে। সমগ্র থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। শক্তির মোহ এবং দর্প ছাড়া আর কিছুই তাঁর আপনার নয়। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন কারো সঙ্গেই তাঁর হৃদয়ের যোগ নেই। যেহেতু "শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান" এবং "শক্তির অহঙ্কার যেহেতু আয়তন বিস্তারেরই অহংকার"—যে কেউই সেই শক্তিপূজার ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, দর্পের আয়তন বিস্তারে বাধা দিয়েছে, তাকেই শক্তির যূপকাষ্ঠে বলি হতে হয়েছে—প্রাণ বা সুখ-সম্ভোগ বিসর্জন দিতে হয়েছে। পাপের মার্জনা করতে গিয়ে, পাপীকে প্রকৃতিস্থ করতে গিয়ে, পাপীর হাতে তাকে সুদুঃসহ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

এই শাস্তি ও দুঃখভোগ বরণ ক'রে নিয়েই, জাগ্রত আত্মারা সকল মানুষের হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে থাকেন। পাপের মার্জনা না ক'রে তো তাঁদের মুক্তি নেই। কারণ যখন আত্মার জাগরণ ঘটে তখন আত্মা আত্মাকেই চায়।—"চৈতন্য যখন বরফ-গলার ঝর্ণার মতো ছুটে বেরোতে চায়, তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে না—তাকে

ক্ষয় করবার জন্যে, তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পীড়িত চৈতন্য পাপের চারদিকে ফেনিল হয়ে উঠতে থাকে।......তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে, পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি— তাকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠে।" (শান্তিনিকেতন—'পাপ')। জাগ্রত আত্মার পক্ষে পাপের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম অনিবার্য। কারণ তার দায়ের শেষ নেই—আত্মার সব আবরণ তাকে অপসারিত করতেই হবে। জ্ঞানে—প্রেমে—কর্মে অনন্তের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে যুক্ত ক'রে আত্মার পূর্ণ মুক্তির সাধনা তাঁকে করতেই হবে। জ্ঞান —প্রেম—কর্ম কোনটিকেই,এড়িয়ে যাবার জো নেই। জ্ঞান—প্রেম— কর্মের দায়িত্ব বহন করেই আত্মাকে মুক্তি পেতে হবে। লয়ে মুক্তি নেই, প্রকাশেই মুক্তি। জাগ্রত চেতনার গুরুদায়িত্ব যে কতখানি, ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রেই তা নিদর্শায়িত হয়েছে। ধনঞ্জয় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূর্ত মহাভাষ্য। ধনঞ্জয় সচ্চিদানন্দের উপাসক বলেই জন্ম-বৈরাগী। যে বৈরাগ্য—'স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয়-সাধন করিয়ে দেয়, এবং যার ফলেই... সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রস পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে"—ধনঞ্জয়ের বৈরাগ্য সেই বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্য সংসারকে ত্যাগ করতে শেখায় না, সংসারকে আত্মার আনন্দ-নিকেতন ব'লে গ্রহণ করতে দীক্ষা দেয়। এ বৈরাগ্য সংসারকে মায়া বলে অস্বীকার করে না, কারণ এ জানে—"যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত-কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই-সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয় (কর্ম); জানে—আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। (ঐ) জ্ঞান— প্রেম—শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সংগত সেখানেই আনন্দতীর্থ।

আমাদের মধ্যে জ্ঞান—প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণ পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ...পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম **"না-রূপে মুক্ত ন'ন, তিনি হাঁ-রূপেই** মুক্ত।" (শক্তি)। ধনঞ্জয়ের কাছে, মুক্তির সাধনা তা'ই ধ্যানমাত্র নয়, তরল ভাবালুতামাত্র নয়, আবার ধ্যান-ভাব বিবর্জিত কর্মমাত্রও নয়। তাঁর অন্তরে ধ্যান, বাহিরে কর্ম। প্রতি-নিমেষের কর্মের সঙ্গে তাঁর মুক্তির সমস্যা জড়িত। সে জানে, জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ কর্মস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাধনা—প্রতি মুহূর্তের জীবন-সাধনা থেকে পৃথক কোনো জপতপ, আচার-অনুষ্ঠান নয়। এ সাধনা, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিয়মরূপে যিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, প্রকৃতির সেই নিয়মকে জেনে তাঁর সত্যমূর্তিকে জানার সাধনা, মানবপ্রকৃতির মধ্যে যিনি 'প্রেম'রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন সেই প্রেমের মাধুর্য্য উপলব্ধি ক'রে সামাজিক জীবনে প্রেমপূর্ণ সাম্যের সুষমা তথা ব্রহ্মের মঙ্গলমূর্তি স্থাপিত করার সাধনা এবং জগৎপ্রকৃতির, জীবপ্রকৃতির এবং মানব-প্রকৃতির ভেতর দিয়ে পরমাত্মার যে প্রকাশলীলা চলছে সেই লীলারস আস্বাদন ক'রে 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'—কে অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করার সাধনা। মুক্তির দায় এত বড়োই দায়।

এই জাতীয় মুক্তির দায়িত্বে পূর্ণ ব'লেই, ধনঞ্জয় রাজা-প্রজার সম্পর্ককে বৈষম্যমুক্ত ক'রে "সমাজে মুক্তি" পেতে চায়। সব মুক্তিরই এক পথ—আত্মবোধ—আত্মশক্তি। আত্মবোধের অভাব থেকেই সমস্ত বিকৃতির বা পাপের জন্ম। রাজার আত্মাবোধ আচ্ছন্ন হ'লেই অহংকার-স্ফীত রাজা রাজ্যকে নিজের সম্পত্তি ব'লে মনে করেন; প্রজার অধিকার অস্বীকার করেন—রাজাও যে মানুষ এই সত্যটি অস্বীকার করতে থাকেন। রাজার বিকৃতির জন্য প্রজার দায়িত্বও কম নয়। প্রজার আত্মবোধ সজাগ থাকলে রাজার পক্ষে বিকৃত হওয়া সম্ভব নয়। প্রজার আত্মবোধের তথা আত্মশক্তির অভাবের এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই

রাজা স্বৈরাচারী হ'য়ে উঠেন। সুতরাং রাজা-প্রজার সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার একমাত্র উপায়—আত্মবোধ—আত্মশক্তি জাগিয়ে রাখা। আত্ম-বোধেই আত্মশক্তি এবং প্রকৃত মুক্তি। জাগ্রতচৈতন্য ধনঞ্জয় এই আত্মবোধ বা আত্মশক্তিরই পরম বিগ্রহ। আত্মবোধ জাগ্রত, আত্ম-শক্তি উদ্বোধিত ব'লেই ধনঞ্জয় অমৃতমন্ত্রে ও অভয়মন্ত্রে সিদ্ধ।

নাটকখানি ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন অবলম্বনে লেখা ব'লে ঐতিহাসিক নাটক রূপে গণ্য হওয়ার দাবী করতে পারে বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক নাটককের ইতিহাস-আশ্রিত হ'তে হ'লে যে পরিমাণে রাজনৈতিক-আর্থ নৈতিক ঘটনা সংপৃক্ত হওয়া আবশ্যক, উপস্থাপনা-রীতির দিক দিয়ে যে পরিমাণে বস্তুতান্ত্রিক হওয়া উচিত, সেই পরিমাণ ঐতি-হাসিক-ঘটনাসাপেক্ষতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা এর নেই। এতে যে সব রাজ-আর্থ নৈতিক ঘটনা দিয়ে পটভূমি তৈরী করা হ'য়েছে তার অনেক-খানিই কাল্পনিক। আসলে, কাল্পনিক এবং আপাতত-সত্য রাজ-আর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে—পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব—(ভাব-দ্বন্দ্ব বল্‌লেই ভাল হয়) এবং তার পরিণাম দেখানো হ'য়েছে।

সুতরাং, নাটকখানির ঘটনা অনেক পরিমাণে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ব'লে, ইতিহাসের গতি-পরিণতির সঙ্গে নাটকের তেমন-কোনো যোগ নেই ব'লে, নাটকখানিকে "পারিবারিক ট্র্যাজেডি"র তালিকাতেই স্থান দেওয়া সমীচীন। তারপর, ভাব ও রূপের যে পূর্ণ সঙ্গতি ঘটলে অতিবাস্তব জীবনের রূপটি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ভাবব্যঞ্জনা ফুটে উঠে, সেই ধরণের সঙ্গতি এখানে পাওয়া যায় না। ভাব এখানে রূপাতিশায়ী। ফলে উপস্থাপনা ভাবতান্ত্রিক হ'য়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ধনঞ্জয়ের মতো বাউল বা বৈরাগী আমাদের দেশে অসম্ভব ব্যক্তি নয় বটে কিন্তু এখানে চরিত্রহিসাবে "ধনঞ্জয়"কে যতখানি প্রশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে, তা'তে জীবনের রূপ বা রস অপেক্ষা ভাবই লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এখানে এইপর্যন্তই যথেষ্ট।

রাজা (১৯১০)

'রাজা' নাটকখানি লেখার পেছনে যে প্রেরণাটি কাজ করেছে, তাকে, একদিক থেকে, অরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মসাধনাকে প্রচার—করা 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'—রূপ রূপময় অরূপ তত্ত্বটিকে এবং তাঁকে লাভ করার উপায়টিকে ব্যক্ত করা—ব'লে মনে হবে; অন্যদিক থেকে অর্থাৎ দার্শনিক অভিযোজন-প্রচেষ্টা হিসাবে দেখলে দেখা যাবে—এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মদর্শনের এবং জ্ঞান-দর্শনের অন্যতম জটিলতম সমস্যাটি—বোধি ও বুদ্ধির আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্নটি—নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এইটেই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে পরমসত্য-দর্শন "বোধি" ছাড়া সম্ভব নয়। (রবীন্দ্র-মানস আলোচনা দ্রষ্টব্য)। বুদ্ধির এমন সাধ্য নেই যে সে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করবে। বড় জোর সে খণ্ডসত্যকে দেখতে পারে। অরূপ অখণ্ডকে উপলব্ধি করতে হ'লে চাই "বোধি"। এই কারণেই, বুদ্ধিই যার একমাত্র উপায়, সেই বিজ্ঞানের পক্ষে পরমতত্ত্বকে লাভ করা সম্ভব নয় এবং যে দর্শনে বুদ্ধির দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি স্বীকৃত নয়, সেই দর্শনের পক্ষে "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্"—রূপ পরমতত্ত্বটিকে—রূপময়-অরূপকে দর্শন করাও সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে শুধু যে সংশয়েরও সাকার উপাসনার বিরুদ্ধেই পরোক্ষত সংগ্রাম করা হ'য়েছে তা' নয়—বস্তুবাদী দর্শনের ব্রহ্মাস্ত্রটিকেও নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হ'য়েছে—বুদ্ধির ওপরে বোধিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এই নাটকের মূল সমস্যা—অরূপের রূপ দেখারই সমস্যা। অন্তরে যিনি অরূপ রূপে, বাহিরে যিনি রূপে রূপে বিচিত্ররূপে বিরাজ করছেন, সেই অপরূপ অনির্ব্বচনীয় বিশ্বরূপকে দেখার সমস্যা। সমস্যা এই যে, অন্তরে যে অরূপকে সহজবোধে (intuition) না দেখতে পেয়েছে, বাইরের বিশ্বরূপের মধ্যে সে তাঁকে চিনতে পারবে না—বুদ্ধির আলোকে খণ্ড

রূপকেই সে 'সমগ্র' ব'লে ভুল ক'রে বসবে। সহজবোধ ছাড়া অরূপকে বোঝা যায় না। বোঝা গেলেও বোঝানো যায় না। কারণ অনির্বচনীয়কে বচন দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়—"সব কথা তো বোঝানো যায় না।" এই সহজবোধটুকু পাওয়াই বড় ভাগ্যের কথা। এই বোধ যার ভাগ্যে ঘটে, সে 'বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ' পায়; তার—"বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।" এই বস্তু তর্কে পাওয়া যায় না—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। ঐকান্তিক বিশ্বাসের—অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের—বিনিময়েই এ সহজবোধ লাভ করা যায়। বিশেষের প্রতি আসক্তি, অহংকার ও চাঞ্চল্য এই সহজবোধের বাধা। মন একদিকে পড়ে থাকলে, মনের সহজভাব নষ্ট হ'য়ে যায়—'স্বরূপে অবস্থান' করা সম্ভব হয় না ব'লে দ্রষ্টার সহজ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। কিন্তু আত্মার চোখ যখন খুলে যায়—'অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, কিছু নয়—অমনি সহজ দেখা—অমনি আমার মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা; অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি।" (সত্যকে দেখা—শান্তিনিকেতন ২) এইভাবে পাওয়ার নামই প্রেমে-পাওয়া, প্রেমের অধিকারে পাওয়া। আত্মার নিভৃত নিকেতনে,—একলা ঘরটিতে আর-একটি মহান একলার সাথে মিলন। (শান্তিনিকেতন 'প্রেমের অধিকার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আগেই বলেছি—এই নাটকের মূল উপস্থাপ্য অরূপের রূপ দেখার সমস্যা। রাণী সুদর্শনার মধ্যে সহজবোধ জন্মেনি ব'লেই তাঁর সঙ্কল্প—"যাই বলিস তাঁকে দেখবই।" রাণী বলতে পারেনি—"চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, (প্রেমের (অধিকার)। তাই তো, "গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হ'য়ে থাকি না কেন"—রাজার এই ইচ্ছার সঙ্গে সে নিজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে

দিতে পারেনি। তাই তো তার বাসনা—"যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি, মাটিপাথর সমস্ত দেখছি, সেইখানেই তোমাকে দেখব।" কিন্তু রাণী ঐ সহজবোধেরই কাঙালিনী। সে দাসী সুরঙ্গমার মুখে—"বোঝবার জন্যে কিছুই দেখার দরকার হয় না"—এই কথা শুনে বলে—"আমার যদি তোর মতো হয়, তাহ'লে যে বেঁচে যাই।" দেখব দেখব ক'রে রাণী অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়েছিল বলেই, কেবল দেখবার দিকেই তার সমস্ত মন পড়েছিল ব'লেই, রাণীর দৃষ্টি সহজ হ'তে পারেনি।

রূপতৃষ্ণার ফাঁদে পড়ে মিথ্যাকে সত্য ব'লে মনে ক'রে, খণ্ড সত্যকে অখণ্ড সত্যের মর্যাদা দিয়ে, 'সুবর্ণ' রূপের চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে রাণী সুদর্শনা যে ভুল করেছিল, অনুতাপের আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। অহংকার ঘুচে যাওয়ার পরেই—হার মানার পরেই, সে সহজবোধের দুর্লভ দৃষ্টি পেয়েছে—চিরদিনের জন্য বেঁচে গেছে। অহংকারের আবরণ, বুদ্ধির খণ্ডদৃষ্টির অবরোধ ঘুচে যেতেই বোধির অখণ্ড দৃষ্টির আলোক তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে এবং সেই আলোকে রাণী রাজার অনুপম অরূপের—'সকল-রূপ-ডোবানো" রূপটি প্রত্যক্ষ করে ধন্য হ'য়েছে। অরূপের কালো রূপের মধ্যে ডুবিয়ে ধুয়েই রাণী তার চোখের 'রূপের কালি' ধুয়ে ফেলতে সমর্থ হ'য়েছে। অন্তরের নিভৃত নিকেতনে, সহজবোধে, পাকা-দেখা দেখার পরেই রাণী বাইরের আলোকে রাজার সঙ্গে সহজযোগে যুক্ত হ'তে পেরেছে। যখনই খণ্ডকে অখণ্ড ব'লে ভুল করবার সম্ভাবনা তিরোহিত হ'য়েছে তখনই খণ্ড-অখণ্ড নির্বিরোধে রাণীর চেতনায় স্থান পেয়েছে—কাঞ্চীরাজের সঙ্গে পথ চলতে তার বাধেনি।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ তাঁর সাধ্য ও সাধনতত্ত্বই রূপকাকারে উপস্থাপিত করেছেন এবং তা' করতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গতঃ সাকার-ঈশ্বর-উপাসনা, অন্ধবিশ্বাস বা সংস্কার, সংশয় ও নাস্তিক্য, ভগবদ্-বিশ্বাসের

নানা পর্যায়—এমনি নানা বিষয়ের অবতারণা ক'রেছেন এবং কোনটির ওপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কোনটির ওপর কটাক্ষপাত করেছেন। বলা বাহুল্য এখানেও রবীন্দ্রনাথ সাকার উপাসনার এবং অন্ধ সংস্কারের ওপর তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

এখানে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-সংস্কার অতি স্পষ্টাকারেই ব্যক্ত হ'য়েছে। ভগবানকে দয়িতরূপে, সখারূপে, দাসরূপে (এমন কি শত্রুরূপেও) ভজনা করার বৈষ্ণব-সংস্কারটিই এখানে নানা চরিত্র-কল্পনার মাঝ দিয়ে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছে। 'অন্ধকার ঘরের দাসী' সুরঙ্গমা রাজার দাসী, ঠাকুরদা রাজার বন্ধু বা প্রিয় বয়স্য, রাণী সুদর্শনা রাজার প্রেমিকা, সংশয়ী কাঞ্চীরাজ রাজার প্রতিস্পর্ধী—সকলেই নিজ নিজ ভাবের রাস্তায় রাজ-সন্দর্শনে বেরিয়েছে। সাধনার শক্তি-অনুপাতে কেউ একটু এগিয়ে গেছে, কেউ একটু পেছিয়ে আছে—এই যা পার্থক্য। ঠাকুরদা জ্ঞান-প্রেম-কর্মের যোগে সহজসিদ্ধ। দাসী সুরঙ্গমাও বিশ্বাসে আত্ম-সমর্পণে সহজবোধে রাজার সঙ্গে যুক্ত। রাণী সুদর্শনা অরূপকে পরম দয়িত ব'লেই জানতো, কিন্তু যে প্রেমে জানলে সহজবোধে অন্তরে-বাইরে জানা সম্পূর্ণ হয়, সেই প্রেম তার ছিল না। তাঁর সাধনা সহজ-বোধের সাধনা—প্রেমের সাধনা। রাণীর প্রেম-সাধনাই—জীবাত্মার অরূপ সাক্ষাৎকারের সাধনাই—এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য। আর সবই গৌণ।

আর একটি কথা ব'লেই 'রাজা'র রাজ্য থেকে বিদায় নিচ্ছি। কথাটি এই নাটকের রীতিসম্পর্কে। গোড়া থেকেই একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে—রূপের বাস্তবিকতার চেয়ে ভাবের সংকলন এবং সঞ্চারণের দিকেই, রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা একটু বেশী। 'শারদোৎসব'-এ এসে তত্ত্বপ্রবণতার মাত্রা আরো বেড়েছে এবং "রাজা"র পর্যায়ে এসে, উপ-স্থাপনা-রীতি ভাবতান্ত্রিকতার সীমা ছাড়িয়ে সংলক্ষ্যভাবে রূপক-

সংকেতের স্তরে প্রবেশ করেছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষা ধার ক'রে, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের এই সকল সাংকেতিক নাটক "অভিধামূলক ব্যঞ্জনা" নয়, "লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনা" হ'য়ে উঠেছে। অর্থাৎ নাটকে যে কাহিনী এবং যে সব চরিত্রকে 'ব্যঞ্জক' রূপে ব্যবহার করা হ'য়েছে, তাদের কোনমতেই বাস্তবকল্প ঘটনা বা বাস্তবিককল্প চরিত্র ব'লে গ্রহণ করা যায় না। এক কথায়, তারা রূপক-ধর্মী। লক্ষ্যার্থ থেকেই ব্যঙ্গ্য অর্থটি যেন ধ্বনিত হ'য়েছে। রূপকধর্মিতার অভিযোগের উত্তরে, আপত্তি জানিয়ে যদিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"With regard to the criticism of my play, the "king of the Dark chamber,......the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarsana is not more an abstraction than Lady Mackbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature "(1914) (Letters to a Friend)—তবু এ কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, লেডী ম্যাকবেথ এবং সুদর্শনা এক পর্যায়ের চরিত্র—'abstraction' নয়। লেডী ম্যাকবেথকে 'abstraction' বা ভাবমূর্তি ব'লে স্বীকার করলেও, একথা না ব'লে উপায় নেই যে ম্যাকবেথ—লেডী ম্যাকবেথের কাহিনী এবং রাজা-নাটকের রাজা-রাণীর কাহিনী বাস্তবিক-তার দিক দিয়ে সমান পর্যায়ের ঘটনা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন—তাঁর নাটক আত্মার অন্তরতম প্রদেশের ঘটনার নাটক—আত্মার 'inner drama'। এই কারণেই বোধ হয় তা এত বেশী 'abstract' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টিই কল্পনার ব্যাপার (idealized imitation) একথা অবশ্যই স্বীকার্য, তাই ব'লে প্রত্যেক সৃষ্টিকেই "কাল্পনিক" বলা হয় না এ কথাও স্বীকার করতে হবে। লেডী ম্যাকবেথ যে অর্থে বাস্তবকল্প, সুদর্শনা সে অর্থে বাস্তবকল্প নয়।

বৌদ্ধজাতকের অন্তর্গত কুশজাতকের যে কাহিনীর কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'র কাহিনী গড়েছেন সে কাহিনীটিই রূপকধর্মী। রবীন্দ্রনাথের হাতে তার রূপকতা আরো বেড়েছে। কুশজাতকের কাহিনীর ফলশ্রুতি হ'চ্ছে এই :—অন্তরের রূপটি চোখে যতক্ষণ চোখে না পড়ে, ততক্ষণই মানুষ বাইরের রূপের জন্য লালায়িত হয় ; অন্তর যার সুন্দর, সেই প্রকৃত সুন্দর। অন্তরের পরিচয়ে যেখানে দু'টি প্রাণ এক হয়, সেখানেই যথার্থ প্রেম। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মিশিয়ে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের কাহিনী রচনা করেছেন এবং তা'তে কাহিনী আরো রূপকধর্মী হ'য়ে পড়েছে। জাতকের নীতিমূলক কাহিনীকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কাহিনীতে পরিণত করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর রূপকধর্মিতা বাড়িয়ে ফেলেছেন।

অচলায়তন (১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮)

অচলায়তন নাটকখানি লেখা হয় ১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮। তিনমাস পরে প্রবাসীর পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং পর বৎসর আষাঢ় মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যে প্রেরণাবশে কবি এই নাটকখানি লেখেন, বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টাংশের 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এর মধ্যে তা' ব্যাখ্যা ক'রে বলা হ'য়েছে। বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক সমালোচক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার (আর্য্যাবর্ত্ত, কার্ত্তিক ১৩১৮) উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ললিতবাবুর কাছে যে পত্র লেখেন তাতেই রচনার প্রেরণাটুকু সুন্দরভাবে ব্যক্ত ক'রেছেন। শুধু যে 'অচলায়তন'-রচনার প্রেরণাই তা'তে প্রকাশিত হ'য়েছে তা' নয়, প্রত্যেক শিল্পরচনার মূলেই যে শিল্পীর বেদনা ও আশা কারণহিসাবে কাজ করে—এই তত্ত্বটুকুও সুন্দর ভাষা পেয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টি যে নিছক 'খেলা' নয়, 'অহেতুক লীলা' নয়, সাহিত্যে

সামাজিক মানুষের গভীর বেদনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাই যে প্রকাশিত হয়—এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ এখানে খুব জোর দিয়েই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন এবং বরাবরই ব'লে এসেছেন —ভেতরে মুক্ত হ'তে না পারলে বাইরের বদ্ধতা বা দুঃখকষ্ট—সে জাতিরই হোক বা ব্যক্তিরই হোক—কিছুতেই ঘুচতে পারে না। মুক্তির একটিমাত্র উপায়ই আছে, সে হ'চ্ছে আত্মশক্তির উদ্বোধন—আত্মার জাগরণ—জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে বাধামুক্ত হওয়া। তিনি দেখেছিলেন জাগতিক মুক্তি বা আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় ইংরেজ বা বিদেশী কোন শক্তি নয়, প্রধান অন্তরায় আমাদের—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের জড়তা। গোড়ায় গলদ এখানেই। এই গলদকে চাপা দিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার চেষ্টাকে তিনি কোনদিনই প্রশংসা করেননি। বার বার এই গলদের দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। 'অচলায়তন' এই চেষ্টারই অন্যতম ফল। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলা যাক—"দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে, শক্তিকে, ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে—সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে এবং বাহিরের সকল আঘাত সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না? কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব?.........

...আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি যে সমস্ত অপরাধ বাহিরের দিকেই; আপনাক মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে

বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছ, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে……আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি—সে শিকল আমার এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে—বাজিবে না তো কী? শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়াই হউক জানাইতে হইবে……… ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না।" এর পরে বলা বাহুল্যই যে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম যোগের বিকৃতির বিরুদ্ধে—প্রাণহীন মিথ্যা—আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, এককথায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' রচনা করেছিলেন।

'রাজা' নাটকেই দেখা যায়, নাট্যকারের মনে 'অচলায়তন'এর বীজ মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। ভবদত্ত, কৌণ্ডিল্য প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে আমরা অচলায়তনের বাসিন্দাদেরই প্রথম দেখতে পাই। 'খোলা রাস্তার দেশে' এসে অবধি তাদের সুখ নেই—দিনরাত গা ঘিন ঘিন করছে। কৌণ্ডিল্য অচলায়তনেরই একজন অভিজাত পরিবারের সন্তান। তার পরিচয় সে নিজের মুখেই দিয়েছে—"আমার বাবাকে তো জান—কত বড়ো মহাত্মালোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলেনি। মৃত্যুর পরে কথা উঠল—এই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়; সে এক বিষম মুশকিল; শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, উনপঞ্চাশে যে দু'টো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই। অতএব তাই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো

বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত।.......
এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ।" "অচলায়তন" এই কৌণ্ডিল্যদেরই দেশ। এখানে আচার আছে বিচার নেই, মন্ত্র আছে অর্থভাবনা নেই, শাস্ত্রবুদ্ধি আছে সহজ হৃদয় নেই। এ এক ধর্মসমাজ যার অহং বিকৃত—যা' চিরন্তনকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের বিধি-নিষেধের অহংকারকেই জয়ী করে। এই নাটকের ফলশ্রুতি—"আচারই ধর্ম নহে; বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন" (গ্রন্থপরিচয়)। **জ্ঞান-প্রেম কর্মযোগের সামঞ্জস্যেই ধর্মসাধনার—জীবন-সাধনারও—সম্পূর্ণতা।**

"ডাকঘর" (১৩১৮)

'ডাকঘর'—নাটিকার রচনার ইতিহাস, শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে, সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। অতএব ইতিহাস দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অচলায়তন রচনার কয়েক মাস পরে, "১৩১৮ সালের পূজার ছুটির পর, কবি শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া "ডাকঘর" লিখিয়াছিলেন।" রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে কবি নিজে যে বিবরণ দিয়েছেন তা' থেকে জানা যায়, এই সময়ে কবির মন বাহির থেকে জগৎটাকে লুট করে নেওয়ার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছিল। পথে বেড়িয়ে পড়ার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। কবির কেবলই মনে হচ্ছিল—"খোলা রাস্তার খোলা আলোয়, খোলা হাওয়ায় ডাক পড়েছে।" আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতায় তার মনে হচ্ছিল—আমার এ জীবনের ভিতরকার শক্তি নিঃশেষ হ'য়েছে এটাকে বদলে ফেলে আবার নূতন বাহন জুততে হবে—মৃত্যু ভাল কিন্তু মুক্তি চাই।" রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"**কোথায় যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে.** খুব একটা আবেগে সেই

চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম।... **এর মধ্যে গল্প নেই। এ গন্থ লিরিক**। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয় আখ্যায়িকা।" (রবীন্দ্র সংগীত—শান্তিদেব ঘোষ)।

একথা সত্য বটে "কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে" নাটিকার বাহ্য রূপটি তৈরী করেছে, কিন্তু নাটিকার অন্তরতম ভাববস্তু হচ্ছে—অমল আত্মার অনন্তের তৃষ্ণা—বিশ্বানুভূতির আবেগ—বিশ্বকে জ্ঞানে জানার আবেগ নয়, অনুভবে পাওয়ার দুর্নিবার আর্তি—বিশ্বের তত্ত্বকে জানবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শকে আস্বাদন করার ব্যাকুলতা। অচলায়তনের পঞ্চকের সঙ্গে অমলের এ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই হিসাবে, পঞ্চককে অমলেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর বলা যেতে পারে।

এই নাটিকার ভাববস্তু নিয়ে অনেক কথাই অনেকে বলেছেন, কিন্তু "এর মধ্যে গল্প নেই এ গন্থ লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয় আখ্যায়িকা", রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। কোনো কোনো সমালোচক একে নাটক বলতেই রাজি হননি, কেউ কেউ আবার একে 'সাংকেতিক নাটক' বলে নাটকের আসরে ভিন্ন পংক্তিতে স্থান দিয়েছেন। আসল সমস্যাটি যেখানে সেখানে কাহারো দৃষ্টি পড়েনি। যে রচনা এত লিরিক-ধর্মী—যাকে গন্থ-গীতিকবিতা বললেই হয়, তাকে নাটক বলা চলবে কি না এ প্রশ্নকে ঘিরেই আসল সমস্যাটি রয়েছে। 'ডাকঘর'কে নাটক বলতে হলে এই কথাই স্বীকার করতে হবে—একটা 'mood' বা ভাবাবস্থাকেও তেমন আবেগপূর্ণ করে দৃশ্যরূপ দিতে পারলে—অর্থাৎ রসপরিণতি দান করতে পারলে—'নাটক' হতে পারে। একথা যদি মিথ্যা না হয়—"এক সময়ে ইহার অনুবাদ য়ুরোপের নানাদেশে অভিনীত ও সমাদৃত হয়", এ কথা যদি সত্য হয় যে 'ডাকঘর' অভিনয়ের কালে

সমস্তক্ষণই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল জেগে থাকে এবং রসনিষ্পত্তিও যথেষ্ট মাত্রায় ঘটে, তা' হ'লে 'ডাকঘর'কে নাটক না বলার কোনো হেতু থাকতে পারে না। ভুলে গেলে চলবে না—নাটকের মধ্যেও নানা প্রজাতি আছে ; রূপক-সাংকেতিক নাটকও নাটক।

আর একটি কথা ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। ব্যঞ্জনা যেমন অভিধামূলক এবং লক্ষণা-মূলক, সাংকেতিক নাটকও তেমনি বাস্তবাশ্রয়ী এবং রূপকাশ্রয়ী—এই দুই রকম হ'তে পারে। যেখানে বাস্তবিককল্প কাহিনী থেকে কোনো তত্ত্ব সংকেতিত হয়, সেখানে সাংকেতিক নাটক বাস্তবাশ্রয়ী আর যেখানে রূপক-কাহিনী থেকে তত্ত্ব সংকেতিত হয়, সেখানে সাংকেতিক নাটক রূপকাশ্রয়ী। মেতার্লিঙ্কের "দি ইণ্টিরিয়ার" নাটিকাখানি বাস্তবাশ্রয়ী সাংকেতিক নাটকের দৃষ্টান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলির প্রায় সব কয়খানিই রূপক-সাংকেতিক। একটি জলে-ডুবে-মরা মেয়ের মৃত্যু সংবাদ মেয়েটির পিতামাতার কাছে পৌঁছে দেওয়া—ইণ্টিরিয়ার নাটকের বিষয়বস্তু। কাহিনীটি বাস্তবিককল্প। ঘটনা, পাত্র-পাত্রী কোনোটিই অবাস্তব নয়। অথচ এই বাস্তব ঘটনাটিকেই সুন্দর ব্যঞ্জনাময় রূপ দেওয়া হয়েছে। নাটিকাখানি জীবন-মৃত্যুরহস্যের ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। কাহিনীকে বাস্তবিকতার স্তরে রেখেও গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করার এই ক্ষমতা খুবই উঁচুদরের প্রতিভার নিদর্শন। 'ডাকঘর' নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিরই অনেকখানি পরিচয় দিয়েছেন। 'ডাকঘর' নাটিকার কাহিনী বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বাস্তবিককল্প। রুগ্ন শিশুর কল্পনা অবাধ গতিতে দিগ্‌বিদিকে ছুটে বেড়াবে এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। কিন্তু শেষ দিকে, বাস্তবিকতার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে কাহিনী রূপকের স্তরে উঠে গেছে। বাস্তবাশ্রয়ী সাংকেতিক হ'তে হ'তে নাটকখানি রূপক-সাংকেতিক হ'য়ে উঠেছে।

ফাল্গুনী (১৯১৬)

'ঋতু-উৎসব' উপলক্ষে যে সব নাটক-রচিত হ'য়েছে, বিশেষ ক'রে 'শারদোৎসব' থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত, তাদের ভিতরকার ধুয়োটা নাকি একই। রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ ক'রে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই।" "ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।" অবশ্য সংকুচিত হ'লেও তিনি না বুঝিয়ে ছাড়েননি—বুঝিয়ে দিয়েছেন—"ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হ'ল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা-মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবনযৌবন।......পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। .....বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হ'য়ে জন্মাছে, মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন ক'রে উপলব্ধি করছে।" (শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে লেখা পত্র, ২০ মাঘ, ১৩২২) এটাই ফাল্গুনী'র মুখ্য তত্ত্ব। এর সঙ্গে আরো অনেক তত্ত্ব মিশে আছে। সূচনায় প্রধান পাত্রদের যে পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে, তা'তেই পরোক্ষভাবে তত্ত্বগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'য়েছে।

মুক্তধারা (১৯১২)

ফাল্গুনী-রচনার পরে এবং 'মুক্তধারা' রচনার আগে, রবীন্দ্রনাথ নতুন কোন নাটক রচনার চেষ্টা করেন না; পুরাতন তিনখানি নাটকের পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯১৮ খ্রীঃ অচলায়তনের সংস্কৃত রূপ **"গুরু"**, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে "রাজা"র সংস্কৃত রূপ **"অরূপরতন"** এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শারদোৎসবের সংস্কৃতর রূপ **'ঋণশোধ'** প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে ফাল্গুনীর পরে নতুন নাটক হচ্ছে—'মুক্তধারা'। অবশ্য কেউ হয়তো বলবেন যে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সঙ্গে মুক্তধারার বেশখানিকটা আত্মিক ঐক্য আছে, অতএব মুক্তধারাকেও সম্পূর্ণ নতুন নাটক বলা চলে না। বিশেষতঃ এখানেও ধনঞ্জয় নামক গোটা একটা চরিত্র নামত এবং কার্যত উপস্থিত। এখানে, প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা নিয়েছেন "রণজিৎ", বসন্তরায়ের ভূমিকায় আছেন বিশ্বজিৎ, উদয়াদিত্যের ভূমিকা নিয়েছেন অভিজিৎ এবং এখানেও মূল দ্বন্দ্বের একপক্ষে ভৌতিক শক্তির দম্ভ অহংকার, অন্যপক্ষে আধ্যাত্মিক শক্তি বা প্রেমধর্ম—হৃদয়ধর্ম। যাই হোক, এতো সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, মুক্তধারা স্বতন্ত্র একখানি নাটক। প্রায়শ্চিত্তে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে শক্তির অহংকার এবং প্রেমধর্মের, হৃদয়ধর্মের, দ্বন্দ্ব দেখানো হ'য়েছে এবং হৃদয়ধর্মের তথা চৈতন্য-শক্তির মাহাত্ম্য স্থাপনা করা হ'য়েছে। মুক্তধারা নাটকে নাট্যকার যন্ত্র-সহায় সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের পরিবেশে, বৈজ্ঞানিক শক্তির দম্ভের সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বন্দ্ব এবং আধ্যাত্মিক শক্তির মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেছেন। দ্বন্দ্বের একপক্ষের প্রতিনিধি—যন্ত্র, মুক্তধারার বাঁধ—যন্ত্ররাজ বিভূতি; অন্যপক্ষের প্রতিনিধি—মুক্তচৈতন্যের প্রতীক ধনঞ্জয় বৈরাগী—স্বভাবমুক্ত অভিজিৎ। দেবতার মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে

যন্ত্রের চূড়া উঠবে—মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অহংকারের দ্বারা, বিষয়ের আসক্তির ও মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হবে—আত্মার পক্ষে তার চেয়ে বড়ো সঙ্কট আর কিছুই নেই। এই সঙ্কট থেকে মানব-সভ্যতাকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে, ধর্মকে বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে, বস্তুবাদী সভ্যতার উর্ধ্বে অধ্যাত্মবাদী সভ্যতার পতাকা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং রাজাকে ও প্রজাকে অধিকতর সম্বন্ধ—সচেতন করে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনা করে—"সমাজে মুক্তি" প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে, রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটক রচনা করেছেন।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন যুক্তিবাদী—বুদ্ধিবাদী বিজ্ঞানের দেব-বিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দেশ-বিদেশের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে অমানুষিক প্রাণপীড়নের আয়োজন করেছে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। যে যন্ত্র মন্দিরের চূড়ার উপরে তার চূড়া বাড়িয়ে দেয়, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা অস্বীকার করে, নৈতিক বিধি-বিধান উপেক্ষা ক'রে প্রাণের মূল্য হৃদয়-মাধুর্যের মাহাত্ম্য অস্বীকার ক'রে শুধু শক্তির দম্ভ ঘোষণা করবার জন্যই ঐকান্তিক চেষ্টিত, সে যন্ত্র অভিশপ্ত। সেই শক্তিমাহাত্ম্য যতই থাক না কেন সে সমগ্রের মঙ্গলের বিরোধী ব'লেই অশিব। যে যন্ত্র 'মুক্তধারা'র বাঁধ বেঁধে মানুষের তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেয়, সে যন্ত্রের যতো বিভূতিই থাক, সে যত ভয়ংকরই হোক, মুক্তিকামী অভিজিতের মুক্ত প্রাণের বেগধারায় সে ভেসে যাবেই যাবে। প্রাণের পীড়নে ভৈরব একদিন জাগবেনই। মুক্তির পথের সব বাধা ভৈরবের অভিশাপে একদিন ভেঙে পড়বেই। 'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির আবশ্যকতাই [illegible]

রূপকল্পনার ভেতর দিয়ে মুক্তির আদর্শকেই সংকেতিত ক'রেছেন। একঢিলে রবীন্দ্রনাথ এখানে অনেক পাখী মেরেছেন। বিজ্ঞানের দম্ভ, বস্তুবাদ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ-পীড়ন, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে সহিংস সংগ্রাম, অন্তরে মুক্ত না হ'য়ে মুক্তির সংগ্রাম—এমনি নানা বিষয়ের আলোচনা করেছেন।

গৃহপ্রবেশ (১৯২৫)

'মুক্তধারা' নাটকের পরে উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা—"গৃহপ্রবেশ"। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের আগে, ১৯২৩ খ্রীঃ **'বসন্ত'** নামে একখানি গীতি-নাট্য রচনা করেন এবং কাজি নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। কলিকাতার ম্যাডান থিয়েটারে 'বসন্ত' গীতি-নাট্যখানি অভিনীত হয় (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩)। তারপর কবি 'গল্পসপ্তক'-এর 'শেষের রাত্রি' গল্প অবলম্বনে রচনা করেন—**গৃহপ্রবেশ** (আশ্বিন, ১৩৩১)। ডাকঘরের মতো গৃহপ্রবেশও একটি 'গন্থলিরিক'। ডাকঘর-এ আমরা দেখি একটি রুগ্ন শিশুকে অবলম্বন ক'রে কল্পনাতুর চিত্তের অনন্ত অতৃপ্তি ও আর্তি ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। গৃহপ্রবেশেও দেখা যায়, আলম্বন-বিভাব যতীন রুগ্ন যুবক ; মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও—মণির প্রেমে এবং অর্থসামর্থ্যে দেউলে হ'য়েও, 'মণি-সৌধের' স্বপ্নে, জীবন-স্বপ্নে সে মগ্ন হ'য়ে আছে। স্বপ্ন দিয়েই তো জীবন-গড়া। শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত জীবনের স্বপ্নঘোর কাটে না, জীবন স্বপ্ন-সাধনা করে যায়। গৃহপ্রবেশ নাটকে এই স্বপ্ন-সাধনার বেদনাই করুণরাগিণীর আলাপের মতো ধ্বনিত হ'য়েছে।

চিরকুমারসভা (১৯২৬)

চিরকুমার সভা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নূতন নাটকীয় রূপ। এই নাটক রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"কলিকাতার পাবলিক থিয়েটরে অহীন্দ্র চৌধুরী বিখ্যাত অভিনেতা; তিনিও তাঁহার দল কবির নাটক অভিনয়ের কথা ভাবিতেছেন। সেই সংবাদ পাইয়া কবি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নূতন নাটকীয় রূপদানে প্রবৃত্ত হইলেন।" (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড)॥

চিরকুমার সভা একখানি পঞ্চাঙ্ক কমেডি-নাটক এবং "কমেডি অফ ইনট্রিগ" ধাঁচে লেখা **গে-কমেডি।** নাটকখানির প্রাণশক্তি প্রধানতঃ বাক্‌কেলির মধ্যে নিহিত র'য়েছে। কথা চালাচালি, সরস গান, আবৃত্তি, কৌতুকজনক পরিস্থিতি, বাতিকগ্রস্ত চরিত্র—সবমিলে—চিরকুমার সভা উল্লেখযোগ্য প্রহসনে পরিণত হ'য়েছে। অবশ্য এই জাতীয় প্রহসনে সব ব্যাপারেই একটু বাড়াবাড়ি থাকে এবং এখানেও তা' আছে। কথার বাড়াবাড়ির কথা ছেড়ে দিলেও, চরিত্রের অন্যান্য আচরণেও বেশ বাড়াবাড়ির লক্ষণ পাওয়া যাবে। বুদ্ধি এবং বোকামি এখানে যেন সমান প্রশ্রয়প্রাপ্ত ; মেয়ে পুরুষ সেজে এলেও বড় বুদ্ধিমানরা তা' ধরতে পারে না—এমন অবস্থা। এই নাটকের বাইরের উদ্দেশ্য চিরকুমার সভা ভেঙ্গে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এবং ভিতরের উদ্দেশ্য—চিরকুমার থেকে দেশসেবার প্রতিজ্ঞা, কামিনীত্যাগকে ধর্মসাধনার অঙ্গ ব'লে মনে করা নারীকে জীবনব্রত-উদযাপনের অন্তরায় ব'লে মনে করা—এইসব প্রচলিত সঙ্কল্প ও ধারণাকে উপহাস করা।

শোধবোধ (প্রকাশিত ১৯২৬)

'শোধবোধ' কর্মফল-গল্পের নাট্যরূপ। মূল গল্পটিতে নাট্যরীতির অর্থাৎ কথোপকথনের প্রাধান্য আগে থেকেই ছিল। তাকেই পুরো

নাট্য রূপ দিয়ে নামকরণ করেন "শোধবোধ।" 'শোধবোধ' এবং 'গৃহপ্রবেশ' নাটক সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"এগুলিকে ফরমাইশি রচনা বলা না গেলেও প্রেরণার রচনা নহে। পাবলিক থিএটরে অভিনীত হইবে এই কথাটি মনের মধ্যে ছিল বলিয়া লোকরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি গিয়াছিল—সে ত্রুটি রচনার পদে পদে ধরা পড়ে" (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড)॥ এই নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিকে, সাহেব-বনে-যাওয়া ধনী বাঙালীদের কৃত্রিম জীবনযাত্রাকে—নিষ্প্রাণ ফ্যাসান—সাহেবি কায়দা-কানুনকে, একহাত নিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভাষায় বলা যাক—'এই নাটকেও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সেই টেনিস-কোর্ট, সেই propose করা, engaged হওয়া, সেই courtship-এর রীতি, সেই birth-day-তে present করা, কৃত্রিম বিনয়পূর্ণ অতি সুললিত আলাপ প্রভৃতি কবির ব্যঙ্গ-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে।" অন্যদিকে—মা-মাসির অবুঝ এবং অন্যায় প্রশ্রয় সন্তানের মধ্যে ভোগবাসনা জাগিয়ে কিভাবে তাদের বিপথগামী ক'রে তুলে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়, তার দিকেও একটি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রেছেন। কিন্তু এই সমস্ত করার উপরেও যেটা করেছেন সে হ'চ্ছে—বাইরের কায়দা-কানুনের গণ্ডী থেকে মুক্ত ক'রে এনে আন্তরিকতার বন্ধনে দুটি হৃদয়ের মিলন—নলিনীর প্রেমের দানে সতীশের উদ্ধার—প্রথার ঊর্ধ্বে প্রাণের প্রতিষ্ঠা।

নটীর পূজা (১৯২৬)

অবদান শতকের একটি কাহিনী অবলম্বনে 'নটীর পূজা' রচিত। এই কাহিনী অবলম্বনে 'কথা ও কাহিনী'র 'পূজারিণী' কবিতাটিও রচিত। ১৩৩৩ সালের ২৫শে বৈশাখ সায়ংকালে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 'নটীর পূজা' প্রথম অভিনীত হয়... ....

"প্রথম অভিনয়ে উপালি চরিত্র ছিল না, উপালি চরিত্র-সংবলিত সূচনা-অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের সময় ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ই মাঘ কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ওই অংশ যোজিত হয়; উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন" —(গ্রন্থ-পরিচয়)॥

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ পরিচ্ছদ পরিয়ে বিসর্জন-নাটকের ভাববিগ্রহটিকেই যেন উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। এখানেও সেই প্রেম-ধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে,—শক্তির উপরে প্রীতিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানেও, গোবিন্দমাণিক্যের মতো, রাজা বিম্বিসার ধর্মরক্ষার জন্য রাজ্য ত্যাগ করেছেন—হিংসার কলুষকে, পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব-রূপ পাপকে, প্রেম ও ত্যাগ দিয়ে জয় করতে চেষ্টা করেছেন। এখানেও, রাণী গুণবতীর মতোই, রাণী লোকেশ্বরী ধর্মের জন্যই ধর্মকে আশ্রয় না করে—বিত্তের জন্য, পুত্রের জন্য, মানের জন্য, এককথায় স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবেই ধর্মকে আশ্রয় করেছেন এবং করেছেন ব'লেই পুত্রের সন্ন্যাসে বিচলিত হয়ে সত্য ধর্মে আস্থা রাখতে পারেননি। এখানেও ধর্মের পূজা হয়েছে শ্রেষ্ঠদান দিয়ে—সবকিছু ত্যাগ ক'রে ধর্মের কাছে আত্মনিবেদন ক'রে। পূজার অধিকার তারই যে ধর্মের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দান করতে, আত্মত্যাগ করতে, প্রস্তুত—ধর্মের মুখ চেয়ে যে আর সবার দিক থেকেই মুখ ফেরাতে পারে; যে মনে করে 'ধর্মেই ধর্মের 'শেষ'। যে দেবতা এমন পূজারী পায় তাঁর পূজা বন্ধ করবে কে?

এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম-প্রীতির এবং খ্রীষ্টধর্ম-প্রীতির কথাটা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শন এবং বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় পরাদর্শন মূলত পৃথক। সুতরাং এই প্রীতির কারণ পরাদর্শনের ঐক্য নয়। এই প্রীতির কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্ট-ধর্মের মূল ভিত্তি হ'চ্ছে **প্রীতি**

এবং রবীন্দ্রনাথের কাছেও—এই বিশ্ব হ'চ্ছে 'প্রীতির প্রকাশ'; 'শক্তির প্রকাশ' নয়। এখানেই উভয়পক্ষের ঐক্য। যাঁরা বিশ্বকে প্রীতির 'প্রকাশ' মনে না ক'রে 'শক্তির প্রকাশ' ব'লে মনে করেন, এককথায় ধর্মদর্শনের দিক দিয়ে যাঁরা শাক্ত, তাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধর্মের, খ্রীষ্টধর্মের, বৈষ্ণবধর্মের এবং রবীন্দ্রনাথেরও মৌলিক সিদ্ধান্তে পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ও প্রেম, প্রেম-সাধক রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের অনুকূল ছিল ব'লেই, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। অবদানশতকের এই কাহিনীটিতে, শক্তির বিরুদ্ধে ভক্তির দ্বন্দ্ব, পরানুরাগের কোমল অথচ অমোঘ শক্তি এবং প্রেমের বিজয়িনী রূপ দেখানোর অবকাশ আছে দেখেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটি অবলম্বন করেছেন এবং 'নটীর পূজা' রচনা করেছেন। এই নাটকেও প্রেম-ধর্মের কাছে শাক্তধর্মের পরাজয় দেখানো হ'য়েছে। নটীর পূজার মাঝ দিয়েই প্রেমধর্মের শিখাকে উজ্জ্বলতরপ্রভায় জ্বালিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। এই পূজায় সব অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস সত্যধর্মের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিয়েছে।

রক্তকরবী (১৯২৬)

'নটীর পূজা'র পরে বিশেষ:উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা—রক্তকরবী। গ্রন্থপরিচয়ে নাটকখানির রচনার ইতিহাস: বিবৃত করা হ'য়েছে—"রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে [১৯২৬ ডিসেম্বর] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে, শিলঙবাসকালে, রবীন্দ্রনাথ নাটকটি "যক্ষপুরী" নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়াছিলেন—"নন্দিনী"। ১৩৩১ সালের আশ্বিনমাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল।"* এই ইতিহাসটুকুর সঙ্গে, শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কাছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৪৮ খ্রীঃ ২৫

অক্‌টোবর তারিখে যে কথা বলেছিলেন, তা' যোগ করলে, কবি-কল্পনার অন্দরমহলের খবর পাওয়া যায়। প্রভাতবাবু এ সম্বন্ধে লিখেছেন. "কবি শিল্পকেন্দ্রসমূহের বীভৎস রূপের বর্ণনা পান অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে...রাধাকমল অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, এই সময়ে তিনি শিলঙে। কবির কাছে প্রায় আসেন ও নানা কথাবার্তার মধ্যে এই প্রসঙ্গটি আসিয়া পড়ে।......কবি খুব মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন। (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড)॥ প্রভাতবাবুর কথার ওপরে আস্থা রেখে অবশ্যই এ কথা বলা যায় যে, রাধাকমলবাবুর বিবরণ শোনার ফলেই, কবি 'শোষণজীবী সভ্যতা'র সমালোচনা করবার জন্য একদিকে যক্ষপুরী 'রাজা' ও তার অনুচরবর্গ, অন্যদিকে শোষিত শ্রমিক প্রভৃতির কল্পনা করেছেন।

শোষণজীবী সভ্যতার কেন্দ্র-পুরুষটিকে তিনি 'যক্ষপুরীর রাজা' রূপে কল্পনা করেছেন এবং সেই কল্পনার উপকরণ যুগিয়েছে—হৃদয়হীন খনির-মালিকরা—শোষণৈকব্রত পুঁজিপতিরা, এককথায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। যে সমাজ-ব্যবস্থায় রাজা-প্রজার মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই, শুধু খাজনার সম্পর্ক, শুধু খাটুনির সম্পর্কই বর্তমান, সেই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি হ'চ্ছে শোষণ ও শাসন ; সে ব্যবস্থা যেমন শাসকের তেমনি শাসিতেরও মনুষ্যত্ব হরণ করে। এমনি শাসনজীবী ও শোষণজীবী সমাজব্যবস্থায় মানুষ মুক্তির আনন্দ পেতে পারে না ; মুক্তির আনন্দ থেকে শোষক ও শোষিত উভয়েই বঞ্চিত থাকে। যে শাসন-ব্যবস্থায় রাজা-প্রজার হৃদয়ের সম্পর্ক নেই, তাকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ও সুস্থ ব্যবস্থা ব'লে স্বীকার করতে পারেননি। যে ব্যবস্থায় রাজা মনুষ্যত্ব বর্জিত হয়, প্রজার মনুষ্যত্ব আচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়, সে ব্যবস্থাকে ভাল ব্যবস্থা—মুক্ত অবস্থা—বলে গ্রহণ করা চলে না। সে ব্যবস্থায় 'সমাজে

মুক্তি' অসম্ভব। 'সমাজে মুক্তি'র জন্য চাই রাজা-প্রজা উভয়েরই মনুষ্যত্ব। মুক্ত অবস্থা রক্ষা করবার দায়িত্ব—উভয়েরই'। একের বিকৃতি বাদ দিয়ে অন্যের বিকৃতি ধারণা করা যায় না। প্রজা মুক্ত, রাজা বিকৃত, অথবা রাজা মুক্ত প্রজা বন্ধ—এমন অবস্থা সম্ভব নয়। প্রজার চেতনা আচ্ছন্ন না হ'লে রাজার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে পারে না। প্রজা যেখানে ভয়ে অথবা লোভে নিজের মনুষ্যত্বকে বর্জন করে, সেখানেই রাজার পক্ষে ভয়ংকর বা লুব্ধ হওয়া সম্ভব। রাজার "অহং" ক্ষমতা-মোহেই বিকৃত হো'ক আর ধনলোভেই বিকৃত হো'ক—বিকৃতি প্রশ্রয় পায় প্রজার দুর্বল চিত্তের মধ্যেই।

"সমাজে মুক্তি" শুধু এখনই ব্যাহত হয়নি। 'রাজা'র অহংকার রিপুর বশবর্তী থাকা পর্যন্ত, কিছুতেই প্রজার সঙ্গে সহজ যোগে, সহজ মানুষের মতো যুক্ত হ'তে পারবে না—কোনকালেই পারেনি। অমানুষ রাজাকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেখা গেছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে কৃষিবাণিজ্য যুগেও দেখা গেছে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও দেখা যাচ্ছে। অ-মানুষ রাজা ও প্রজার রূপ রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা এবং রক্তকরবী এই তিনখানি নাটকেই উপস্থাপিত করেছেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে যে অ-মানুষ রাজাকে পাওয়া যায় সে রাজা ভূস্বামী কৃষক-কুলের রাজা; মুক্তধারা নাটকে রণজিৎ-চরিত্রে যে রাজাকে পাওয়া যায়, সে রাজা যন্ত্ররাজ-সহায় বা 'যন্ত্রবিভূতিসম্পন্ন, সাম্রাজ্যলোভী এবং রক্তকরবীতে যে রাজাকে পাওয়া যায় সে হ'চ্ছে—খনিজসম্পদের অধিকারী—শিল্প-যুগের পুঁজিবাদী ধনশক্তি-মদমত্ত শাসক। এই তিন 'রাজা' অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ, কৃষিকেন্দ্রিক, বাণিজ্য-কেন্দ্রিক এবং শিল্পকেন্দ্রিক এই তিন স্তরের বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। যদিও কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী সভ্যতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণজীবী সভ্যতাকেই বেশী নিন্দা করেছেন, বার বার

তিনি বলেছেন—কারখানা কৃষিপল্লীকে উজাড় করে দিচ্ছে এবং কৃষকের দাসত্বের চেয়ে কারখানার শ্রমিকের দাসত্ব আরো ঠাসবুনোনি তাই বলে এ কথা সত্য নয়—কৃষিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থামাত্রই রবীন্দ্রনাথের কাছে আদর্শ ব্যবস্থা। "সমাজে মুক্তির" সমস্যা কোনো বিশেষ এক যুগের সমস্যা নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে—"আধুনিক সমস্যা ব'লে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের"। মানুষের জীবনে, এক হিসাবে একটিমাত্র সমস্যাই আছে—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের যোগে মনুষ্যত্ব—সাধনার সমস্যা; আত্মপ্রকাশের পথে যত বাধা আছে সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়ার সমস্যা। আজন্ম মানুষের জীবনে এই সমস্যাই র'য়েছে এবং এর সমাধানেই জীবনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য—মুক্তির আনন্দ। মনুষ্যত্বের প্রকৃতি থেকে মানুষ যত দূরে যায় ততই তার অহং বিকৃতি হয়। শক্তিমত্ততায় সে হয় **অপ-মানুষ** জড়তায় সে হয় **অব-মানুষ**। **সুতরাং সব যুগেই মানুষের আসল সমস্যা অহং-এর বিকৃতির সমস্যা; অপ মানুষ অথবা অব-মানুষ—এক কথায় অ-মানুষ হওয়ার সমস্যা।**

এই মূল সমস্যার দিকেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বরাবর নিবদ্ধ। তা'ই 'রক্তকরবী' লেখার অনেক আগেই শক্তিপ্রমত্ত অপ-মানুষের এবং দুর্বলচিত্ত অব-মানুষের রূপ তিনি একাধিকবার এঁকেছেন।

রক্তকরবীর রাজার বীজ অনেকআগেই 'শারদোৎসব' নাটকে পাওয়া যায়। সেখানেই বলা হ'য়েছে—অহংকারের বর্ম-চর্মের ঢাকা খুলে দিলে দেখা যাবে—রাজা "নিতান্তই সাধারণ মানুষ"—কিন্তু সর্দার-সেনাপতিরা রাজার ছদ্মবেশ কিছুতেই খুলতে দিতে রাজি নয়—কারণ 'ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে।' সন্ন্যাসীর-ছদ্মবেশ-পরা রাজা আত্মপরিচয় দিয়ে বলছে—"তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে

তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষি গৃহস্থরা বনে গিয়ে সীতার পূজা করে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়। সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে খাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকরবাকরদের মনে রাজগিরির উচ্চভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হ'তে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে যে ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। এইজন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে।" এই বিজয়াদিত্যকেই আত্মাভিমানের জাল দিয়ে ঘিরে—সর্দারবাহিনীর আবেষ্টনী দিয়ে, দুর্নিবার ভয়ংকর অত্যাচারী এবং শোষক করে তুলে, ধন-শক্তিমদে প্রমত্ত অথচ অন্তরে অন্তরে আনন্দের ও মুক্তি কাঙ্গাল ক'রে—রক্তকরবীর রাজাকে তৈরী করা হ'য়েছে। এ রাজা হ'চ্ছে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শাসক-শ্রেণী—যাঁরা অর্থকেই পরমপুরুষার্থ ব'লে মনে করে লোভের জালে জড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত বাসনাকে অর্থের কেন্দ্রে ঘনীভূত ক'রে সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকেই বড়ো ক'রে তুলতে চেষ্টা করছে—অর্থের লোভে অপরকে শোষণ-শাসন করতে গিয়ে নিজের আত্মাকেই হনন করছে—আত্মার সহজ আনন্দ ও সৌন্দর্যানুভূতি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছে—প্রতাপ দিয়ে মুক্তির আনন্দ ও সৌন্দর্য লাভ করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করছে। এরা শক্তিমদে এতই মত্ত যে যাকে হৃদয় দিয়ে ছাড়া আর কোন উপায়েই পাওয়া যায় না সেই আনন্দকে ও সৌন্দর্যকে তারা পেতে চায় শক্তির মুঠিতে। যে মুক্ত প্রাণের সঙ্গে মুক্তির আনন্দের হৃদয়ের যোগ, সেই মুক্তপ্রাণের সঙ্গে বিরোধ ক'রেই এরা মুক্তির আনন্দ পেতে চায়। জানে না—বোঝে

না—শক্তি ও আনন্দের মধ্যে যে পার্থক্য তা' পরিমাণগত নয়—গুণগত, প্রকৃতিগত ; মুক্তির আনন্দকে পেতে গেলে প্রাণের সঙ্গে মরণখেলা খেলতে প্রস্তুত থাকা চাই। নন্দিনীর প্রাণেশ্বর সেই রঞ্জনই—দুর্নিবার যার যৌবনের প্রাণবেগ, প্রাণাবেগের আনন্দ দিয়ে যে আত্মার সব বাধাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

রক্তকরবী-নাটকে তিনটি পক্ষ আছে। একদিকে আছে রাজা—এবং তার অনুচরবৃন্দ সর্দার, অধ্যাপক গোসাঁই প্রভৃতি ; অন্যদিকে আছে শোষণ-জর্জরিত প্রাণহীন খোদাইকরগণ এবং এই দু'পক্ষের মাঝখানে আছে 'নন্দিনী'। শোষকপক্ষ ও শোষিত পক্ষ—উভয়েই প্রাণের সহজ আনন্দ—মুক্তির আনন্দ হারিয়েছে। সেই হিসাবে উভয়েই বদ্ধ। মুক্তির আনন্দের জন্য উভয়পক্ষই বেশী-কম গোপন কামনা আছে। নন্দিনীর প্রতি এদের সহজ আকর্ষণ আছে। নাটকের মুল অভিপ্রায় নন্দিনীই ব্যক্ত করেছে—"তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে **মানুষটাকে উদ্ধার** করি সুতরাং, এ কথা বলা যায়, সমস্ত বিকৃতির কারাগার থেকে মানুষকে উদ্ধার করা—মানুষকে মনুষ্যত্বের সহজ বা প্রকৃত অধিকারে ফিরিয়ে নিয়ে আসা—রক্তকরবী নাটকের মূল উদ্দেশ্য। এক কথায়, রক্তকরবী 'মানুষ-উদ্ধার' পালা। রাজা-প্রজা উভয়কেই উদ্ধার করেছে নন্দিনী—উভয়েরই মরা পাঁজরের ভিতরে প্রাণ নেচে উঠেছে। রক্তকরবী-নাটক বহু ব্যঞ্জনাময় বহু ভাবময় এক অপূর্ব সৃষ্টি—যেন একখানি বহুকোণিক কেলাস (Crystal)—কোণে কোণে পর্বে পর্বে যার বিচিত্র ভাব-বিভঙ্গ। মানবাত্মার মুক্তির তত্ত্ব রূপ সূত্রকে কেন্দ্র ক'রে এখানে বহুভাব দানা বেঁধে উঠেছে। নাটকের বহিরঙ্গে রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার শাসন-শোষণের কৌশল এবং শ্রমিক-বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে রাজা-

প্রজার সম্পর্কের মধ্যে সাম্য তথা মুক্তিপ্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। নাটকের অন্তরঙ্গে র'য়েছে—বদ্ধ মানুষের মুক্তির পিপাসা—খণ্ডিত আত্মার পূর্ণতা-লাভের প্রয়াস—জ্ঞান-প্রেম-শক্তির সামঞ্জস্যের সুষমায় আত্মার যে পূর্ণতা সেই পূর্ণতার জন্য মানবাত্মার সংগ্রাম। নাটকের বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে আরো অনেক তত্ত্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে আছে। পুরাতন 'বোধি' ও 'বুদ্ধি'র দ্বন্দ্বের সমস্যাটিকেও স্থান ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। 'মন দিয়ে জানা' আর 'প্রাণ দিয়ে বোঝা' এক জিনিস নয় এবং আনন্দ ও সৌন্দর্যের মতো বস্তুকে যে মন দিয়ে জানা যায় না; প্রাণ দিয়ে বুঝতে হয়—এ তত্ত্বটিও নন্দিনী ও রাজার কথোপকথনে ব্যক্ত করা হ'য়েছে।

আর একটি কথা বলেই উপসংহার করা যাক। কথাটি নাটকের 'জাতি-বিচার-সম্পর্কিত। গ্রন্থ-পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের যে 'অভিভাষণ' (১৩৩১ সালে লিখিত) মুদ্রিত হ'য়েছে তা'তে কবি লিখেছেন—"কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয় আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপক নাট্য নয়।.........রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আর একদিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর।......এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি"॥

এই বিষয়ে আমি নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যে আলোচনা করেছি তা' এখানে উদ্ধৃত করতে চাইনে। এখানে শুধু এই কথাটি বলতে চাই—রবীন্দ্রনাথের 'পরিহাসবিজল্পিত'কে পরমার্থতঃ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—রামায়ণে 'ব্যক্তিগত মানুষ'কে যতখানি পাওয়া যায়, রক্তকরবীর কোন চরিত্রই ততখানি ব্যক্তিগত মানুষ হ'তে পারেনি। একটি উপমার সাহায্য নিয়ে বললে বলা যায়—রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি ভাবের গুটি

কেটে বেরিয়ে প্রজাপতি হ'তে পারেনি—তত্ত্বের-বাহনত্ব বর্জন ক'রে রক্তমাংসের জীবন্ত রূপ হ'য়ে উঠেনি। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে হয়ত বলা হবে—

"কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষ কী
কিন্তু চমৎকার
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবু কি সত্য নয় ?"
(রবীন্দ্রনাথ)

বলা হবে—যেমন শ্রীযুক্ত অশোক সেন মহাশয় বলেছেন—"অধিচেতন মনের সাহায্যে কবি বস্তুর বা ব্যক্তির একেবারে অন্তরতম রূপের পরিচয় পাইতেছেন। এই রূপই তাঁহার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব—সরল, সত্য ও সহজ।.........আমাদের নিকট যাহা অপ্রত্যক্ষ বা অস্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের মতো Supra-Conscious মনোশক্তিসম্পন্ন মহাকবির কাছে তাহাই অতিশয় স্পষ্ট, real এবং natural এই সকল কারণেই, 'রক্তকরবী'কে তিনি রূপক সংজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।" কবি অস্বীকার করলেও, অশোকবাবু কিন্তু সিদ্ধান্ত করেছেন—'রক্তকরবীতে রূপক এবং সংকেতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।" অর্থাৎ মহাকবির 'স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব'কে শ্রীযুক্ত সেন 'real এবং natural' ব'লতে পারছেন না। কারণ সাহিত্যের কথা সবই বানানো কথা হলেও "হীরে-বসানো সোনার ফুল"কে সত্য বলে মানা হয় না।

"রক্তকরবী"র পরে—রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ খ্রীঃ **'ঋতুরঙ্গ'** নামে একখানা গীতিনাট্য রচনা করেন, ১৯২৮ খ্রীঃ 'গোড়ায় গলদ' সংস্কৃত ক'রে **'শেষরক্ষা'** রচনা করেন এবং ১৯২৯ খ্রীঃ 'প্রায়শ্চিত্ত' সংস্কৃত ক'রে **"পরিত্রাণ"** এবং "রাজা ও রাণী" সংস্কৃত ক'রে **"তপতী"** নাটক রচনা করেন। এদের মধ্যে "তপতী" বিশেষ আলোচনা দাবী করতে পারে।

"তপতী" (১৯২৯) রচনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখেছেন—অনেকদিন ধরে রাজা ও রাণীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।......দেখলুম...অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি"। 'রাজা ও রাণী'র ত্রুটি সম্বন্ধে কবি আলোচনা করে লিখেছেন—"কুমার ও ইলার বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যুর দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।" রবীন্দ্রনাথের আলোচনার নিষ্কর্ষ দাঁড়াচ্ছে এই :—

(ক) কুমার ও ইলার বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক

(খ) শেষ অংশে কুমারের প্রাধান্যে বিষয় ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত

(গ) কুমারের মৃত্যু চমকপ্রদ কিন্তু অনিবার্য নয়।

'রাজা ও রাণী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি এই কথাই বলে এসেছি যে—"রাজা ও রাণী" এবং 'তপতী' আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে মনে হ'লেও, আসলে এরা একই বিষয় নিয়ে লেখা দু'খানি স্বতন্ত্র রচনা। 'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতী' নাটকের বৃত্ত পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য করলেই পার্থক্যটুকু পরিষ্কার ধরা পড়বে।

(ক) 'রাজা ও রাণী'তে—বিক্রমদেব ও সুমিত্রার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বহুদিনের—বাল্যকালেই দু'জনের মিলন হয়েছিল। সুমিত্রার মুখেই শোনা যায়—"তখন ছিলাম শুধু ছোট দুটি বালকবালিকা..." (২২ পৃষ্ঠা)॥ কিন্তু তপতী-নাটকে সুমিত্রা ১৬ বছর বয়সে জালন্ধরে আসেন—কাশ্মীর-বিজয়ী বিক্রমদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'য়ে এবং বিক্রম-

দেবের হাত থেকে কাশ্মীরবাসীদের রক্ষা করবার জন্য। তার বিবাহ হয়েছিল মৃত্যুর আগুনকে সাক্ষী ক'রে।

(খ) 'রাজা ও রাণী'তে—বিক্রমদেবের ও সুমিত্রার সম্পর্কে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে—সে বিরোধের মূল কারণ এই যে রাজা তাঁর প্রেমিক-সত্তার সঙ্গে রাজ-সত্তার সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেননি। পারেননি বলেই—রাণী-সুমিত্রার—ধর্মপত্নী-সুমিত্রার সঙ্গে তার মিলন সম্ভব হয়নি। সুমিত্রা রাজাকে ভালবাসেন বলেই রাজার মহিষী হয়ে প্রেমকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখতে তথা সার্থক করতে চান। এতেই বিরোধ। কিন্তু 'তপতী'-নাটকে সুমিত্রা 'জালন্ধরের রাণী' হতে চান কাশ্মীরের গৌরব রক্ষার জন্যই—"দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক" যাতে মাখতে না হয় সেই অভিমানেই। সুমিত্রা কর্তব্যের গৌরব রাখতে চান কাশ্মীরের গৌরব রক্ষার জন্যই। বিবাহের আগে কৈলাসনাথের মন্দিরে সুমিত্রা যে কারণে তপস্যা করেছিলেন, নিজেই তা ব্যক্ত করেছেন—"এই শক্তি চেয়েছিলুম, রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনদিন কিছুর জন্যেই যেন লোভ না করি ; তবে আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।" তপতী নিজের অপমান সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন।

(গ) "রাজা ও রাণী"-নাটকে রাজ্য সহস্ররাজক হয়েছে—রাজার মোহের সুযোগ নিয়ে। মোহগ্রস্ত রাজা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকায় শাসনকর্তারা প্রজাপীড়নের সুযোগ পেয়েছে—রাজার ক্ষমতা নিজেরা আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু 'তপতী-নাটকে রাজা শাসনকর্তাদের হাতে রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছেন—'দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায়।" বিপাশার ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়—"প্রেমের গৌরব খুব প্রকাণ্ড করে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, খুব দুর্মূল্য দান দুঃসাহসের সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাঁচতেন।......ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায়

সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি।......রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন ঐ কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে—মনে করলেন তোমাকেই দেওয়া হল।............ রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত করে দেবেন।" অর্থাৎ শক্তি দিয়ে সুমিত্রার দেহ জয় করবার পরে, দাক্ষিণ্য দিয়ে অন্তর জয় করবার জন্যই যেন রাজা সাধনা করেছেন। সেখানেই নিরাসক্ত সুমিত্রার সঙ্গে রাজার বিরোধ বেধেছে। রাজা সুমিত্রাকে শুধু রাজার হৃদয়েই অধিকার দিতে প্রস্তুত, রাজার কর্ত্তব্যে অধিকার দিতে প্রস্তুত নন; কিন্তু সুমিত্রা রাজার কর্ত্তব্যেই অধিকার চেয়েছেন—মহিষীর অধিকার চেয়েছেন। এখানেই উভয়ের বিরোধ। বিপাশার কথায়—"মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে।"

(প) 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রার—"অন্তরে প্রেয়সী" এবং 'বাহিরে মহিষী' হতে চাওয়া এবং 'তপতী'র সুমিত্রার "রাজার কর্তব্যে অধিকার চাওয়া" আপাতদৃষ্টিতে একমনে হলেও সর্বাংশে এক নয়। "রাজা ও রাণী"র সুমিত্রা একদিকে প্রেয়সী অন্যদিকে রাজকুলবধূ এবং মহিষী—হয়ে আপনার সার্থকতা চেয়েছেন। রাজার প্রেমেই, রাজার সংসারকে মঙ্গলময় করতেই তিনি রাজার কাছ থেকে দূরে গিয়েছেন—গৃহকাজে, সংসারের কাজে, আত্মনিয়োগ করে প্রেমকে মঙ্গলময় করতে চেয়েছেন। তাঁর মহিষী হতে চাওয়ার মধ্যে—অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মনের দাসত্ব এড়ানোর অভিপ্রায় প্রধানভাবে কাজ করছে না। অন্যদিকে তপতীর সুমিত্রার দাবীতে, কাশ্মীর-কন্যার মহিমাপ্রদর্শনের চেষ্টা—মনের দাসত্ব ও অপমান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। সুমিত্রা সে কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন—"তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাশ্মীর

থেকে—সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও—আমাকে রাণীর পদ দিতে হবে।”

(ঙ) ‘রাজা ও রাণী’-নাটকে রাণী রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন—রাজার প্রেমেই—রাজাকে রাজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্যেই—রাজাকে মোহমুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই—‘পতিসত্যপালনের লাগি’। এই নাটকে রাণী বলেছেন—“ধিক এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা। ধিক আমি, এ রাজ্যের রাণী”—এ কথা বলেছেন রাজার মোহ ও দুর্বলতা এবং প্রজার দুঃখদুর্দ্দশা ঘোচাতে না পেরেই। কিন্তু ‘তপতী’-তে রাণীর উক্তি—‘ধিক এই রাজ্য। ধিক আমি এ-রাজ্যের রাণী”—প্রধানতঃ রাণীর অধিকার না পাওয়ার ফলেই উচ্চারিত হয়েছে। রাজার কঠোর ভর্ৎসনার, কঠোর আদেশের প্রতিক্রিয়াতেই রাণী যেন রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। বিক্রমদেবের—“এ সব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও নয়……যাও রাজার আদেশ এখনই বেশ পরিবর্তন করগে।—এই উক্তির প্রতিক্রিয়াতেই, মনে হয়, রাণী প্রস্থান করেছেন।

রাজা ছেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যও দু’জনের এক নয়। ‘রাজা ও রাণী’র সুমিত্রা রাজ্য ছেড়ে গেছেন—“জালন্ধরের রাণী”কে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য—কাশ্মীর থেকে সৈন্য নিয়ে এসে বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে প্রজাদের মুক্ত করবার জন্য—রাজার কর্তব্যে আপনার শক্তি নিয়োগ করবার জন্য। আর “তপতী”-নাটকে সুমিত্রা রাজ্য ছেড়ে গেছেন—ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেবের উপাসিকা হওয়ার জন্য। সুমিত্রার পত্রখানি পড়লেই দেখা যায়—সুমিত্রার জীবন দেবতার কাছে নিবেদিত। তাই দেবতাকে প্রসন্ন করে রাজার মঙ্গল করার জন্যই সুমিত্রা তপস্যায় আত্মনিয়োগ করতে গেছেন। কাশ্মীরকন্যা মার্তণ্ডদেবের উপাসনায় জীবনের চরিতার্থতা খুঁজেছেন—‘নূতন প্রাণ পেয়েছেন। বিপাশার ভাষায় বলা যায়—“আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভাণ্ডারে তাদের বন্ধন

রুদ্রদেব সহ্য করতে পারেন না" ; তাই সুমিত্রা সূর্যের তপস্যায় দেহমন শুদ্ধ করতে—আত্মনিবেদন করতে গেছেন। এ তার অনেকদিনের সঙ্কল্প—রুদ্রের পরম তেজে নিজের তেজ মিলিয়ে দেবেন। এইভাবে দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করে তিনি রাজার মোহগ্রন্থি ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

বলা বাহুল্য, 'তপতী'র সুমিত্রা অতিপ্রাকৃত চেতনার ধাতু দিয়ে গড়া—স্বভাবে তপতী—দেবদাসী—দেবতার ধন। আর "রাজা ও রাণী"র সুমিত্রা কাশ্মীর-কন্যা জালন্ধর-রাণী, আদর্শপ্রাণা নারীবিশেষ। দৈব-প্রেরণা বা দৈবপ্রবণতার ক্রিয়া তার মধ্যে নেই। সে মর্ত্যের মানুষ। স্বর্গের দেবতা তার হৃদয়ে ভোগাধিকার দাবী করেনি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সেই নাম রইল সেই রূপ রইল না।"

সেই নাম রইল সেই রূপ রইল না—এ কথা যে শুধু 'রাণী' সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তা' নয় ; 'রাজা'র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। "রাজা ও রাণী"র বিক্রমদেবে যে পরিমাণে কামমুগ্ধ আসঙ্গলিপ্সু এক মোহগ্রস্তের রূপ ফুটে উঠেছে তপতীর বিক্রমদেবে তা' ফুটে উঠেনি। 'তপতী'র বিক্রমদেব সম্বন্ধে নরেশ যে মন্তব্য করেছে—"কোনো আকারে মোহ-মাদকতা চাই নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি"—তা' সর্বাংশে সত্য নয়। তপতীর বিক্রমদেবে—মোহ কম, মাদকতা বেশী।

তারপর, 'রাজা ও রাণী'র বিক্রমদেবে মোহ ও মোহমুক্তির বৃত্তটি সম্পূর্ণ আকার লাভ করেছে এবং কূলে এসে ভরাডুবি হওয়ার যে শোচনীয় পরিণাম সেই পরিণাম দেখা দিয়েছে। "তপতী"র বিক্রমদেবের পরিণাম অস্পষ্ট। তপতীর মৃত্যুর আঘাত বিক্রমদেবের মোহগ্রন্থি ছিন্ন করল কি করল না তা' বুঝা যায় না। বিক্রমদেবের পরিণাম এখানে অনুমানগম্য হ'য়ে আছে। বিক্রমদেবের আগের একটি উক্তিই এখানে একমাত্র সম্বল—"তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি

আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিষ্কৃতি।" অনুমান করে নিতে হয়—তপতীর মৃত্যুই রাজাকে এই নিষ্কৃতি দান করেছে। 'রাজা ও রাণী'র উপসংহারে চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে এ কথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য ট্র্যাজেডি-সংবেদনার তীব্রতাও বেশী আছে। 'তপতী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজের মুখেই 'সর্বাঙ্গসুন্দর' বিশেষণটি জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন বটে, কিন্তু সমালোচকরা তত জোর দিয়ে "সর্বাঙ্গ-সুন্দর" বিশেষণটি প্রয়োগ করতে পারেননি।

"তপতী"র পরে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা বলতে, **কালের যাত্রা** (১৯৩২), **চণ্ডালিকা, তাসের দেশ** এবং **বাঁশরী** (১৯৩৩)। শেষের তিনখানি নৃত্যনাট্য বাদ দিয়েই এ কথা বলছি।

কালের যাত্রা নাটিকার মধ্যে রথের রশ্মি ও কবির দীক্ষা এই দু'খানি একাঙ্কিকাকল্প নাট্যরচনা অন্তর্ভুক্ত। "রথের রশ্মি" একাঙ্কিকায় রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন—সমাজে শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্যের ব্যবধান ও তিক্ততা যখনই বেড়ে যায়, তখনই সমাজ-রথ আর চলে না—বিপ্লব আসে; তখন নতুন চালকের আবির্ভাব হয়, এবং তার হাতের টানেই রথ চলতে থাকে। পুরোহিতরা মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে একদিন সমাজের নায়ক ছিলেন; তারপর এলেন রাজারা তাঁদের শক্তি-যন্ত্র নিয়ে। কিন্তু "মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন তাকে ওরা মানেনি"—যাদের শ্রমে সমাজ চলে তাদেরই এরা করে এসেছে উপেক্ষা, তাই আজ সাধারণ মানুষ—একদিন যারা শূদ্রের মতোই ছিল অস্পৃশ্য—তারা জেগেছে। তাদের হাতেই আজ সমাজের পরিচালনা ছেড়ে দিতে হবে। সমাজ যে পর্য্যায়েই থাক, তার শ্রেণী-সম্পর্কের, ব্যক্তি-সম্পর্কের মধ্যে সাম্য, সামঞ্জস্য থাকা চাইই চাই। সমাজ-রথকে যে দঁড়িতে টেনে নিয়ে যায়, সে তো বাইরের কিছু নয়, "সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে

দেহে প্রাণে প্রাণে"। এই ঐক্যের সম্পর্ক, এই সামঞ্জস্যের ছন্দ, নষ্ট হ'য়ে গেলেই ঠাকুর তার আসনটি সমান করে নেন। কিন্তু সেখানেই রথ-যাত্রার শেষ নয়। উঁচুতে-নিচুতে বোঝাপড়া হ'তে হ'তে সমাজ বিবর্তনের পথে এগিয়ে যাবেই। সুতরাং শ্রেণী-সম্পর্কের বাঁধনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেই হবে। কবির মুখে রবীন্দ্রনাথেরই—'ভরত' বাক্য ঃ—

যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তাঁরা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

কবির দীক্ষা—কবি ও আর একজন অজ্ঞাতনামা—উহ্য ব্যক্তির কথোপকথন। আপাতদৃষ্টিতে তা'ই 'দৃশ্য' বলে মনে হয় না। তবে দৃশ্য হ'লেও খুবই ছোট একটা দৃশ্য বলা যায়। সংলাপ (ডায়ালোগ)—সাহিত্যেরই নমুনা বিশেষ। কবির কাব্যর্তকেই কবি এখানে সংলাপ-আকারে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এ কথা সত্য বটে যে, কবির দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা, না আছে পরমার্থের আশা, কিন্তু কবি স্বীকার করেছেন কবিরাও 'শৈব'—কারণ শিবেরই তো জগৎজোড়া নাচগানের পালা—আনন্দলীলা। কবির ত্যাগ ভিক্ষুকের ত্যাগ নয়, পূর্ণতার ত্যাগ। এই ত্যাগের জন্যেই চাই রস—আনন্দ, যাকে বলা যায় প্রাণের ধন। কারণ—"ফল ফলে না রস না হলে।"

কবির দীক্ষা—প্রলয়ের দীক্ষা নয়—নবজীবনের দীক্ষা।

কবির দীক্ষা—ত্যাগের দীক্ষা নয়—গ্রহণের দীক্ষ।

কবির দীক্ষা—নিষ্কিঞ্চন হওয়ার দীক্ষা নয়—ঐশ্বর্যশালী হওয়ার দীক্ষা।

কবির দীক্ষা—মৃত্যু-বিলাসের দীক্ষা নয়—মৃত্যুজয়ের দীক্ষা।

'চণ্ডালিকা' নাটিকার কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত শার্দুলকর্ণাবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। শুধু যে গল্পটি বলার জন্যেই কবি গল্পটি নিয়েছেন

বা যে উদ্দেশ্যে সেখানে বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই বলেছেন, তা' নয়, গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক সমাজ-জীবনের সমালোচনায় পরিণত• করেছেন অর্থাৎ নতুন আদর্শে আদর্শায়িত করেছেন। হিন্দু-সমাজের জাতি-ভেদ বা বর্ণভেদ, বিশেষ ক'রে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-ভেদজ্ঞান, চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের কাছে নিন্দা পেয়ে এসেছে। ঘৃণার ওপরে ধর্মের ভিত্তি স্থাপনা করাকে তিনি চরম অধর্ম বলেই নিন্দা করেছেন। এই কারণেই, অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলনকে তিনি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'চণ্ডালিকায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবসত্যই প্রচার করতে চেয়েছেন :— "যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে"...আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশী,, ...যে মনে ভাবে সে দাসী সেই দাসী, যে মনে ভাবে সে চণ্ডাল সেই চণ্ডাল। বিধাতার সংসারে সকলেরই সেবার অধিকার আছে ; নিজের অধিকার জানাতেই মুক্তি—অধিকার-চেতনাকে সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখতে হবে। যিনি এই অধিকার স্বীকার করবেন শুধু তাঁকেই মানতে হবে।—বলতে হবে—"তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন।" মুক্তি সর্বাত্মক ব্যাপার। একটি আত্মা বদ্ধ থাকা পর্যন্ত কোনো আত্মার পক্ষেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। (চণ্ডালিকার ঘোষণা।—আমি যদি মুক্তি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে ?) তবে নাটিকাটিতে ভাব-ভাষার আকর্ষণ যতই থাক, বাস্তবিককল্প জীবন্ত চরিত্রের অভাব খুবই বেশী। যেমন চণ্ডালিকা তেমন তার মা দুজনেই 'ভাবে ভরা ফানুস' হয়েছে। রক্তমাংসের মানুষ হতে পারেনি।

তাসের দেশ—(১৩৪০) নাটকখানি রীতিমত একখানি 'ফ্যাণ্টা-সিয়া' গোছের উৎকাল্পনিক রূপকথাকল্প রচনা। রূপকথার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য এই যে রূপকথার মুখ্য উদ্দেশ্য যেখানে রূপ দিয়ে মন ভোলানো, 'তাশের দেশে'র মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে—অচলায়তন-নিষ্প্রাণ জাতীয় সমাজের সমালোচনা—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে 'স্বদেশের চিত্তে

নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার চেষ্টা।' তাসানীদের মুখেই রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা যায়—"ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই সব নিরর্থকের আবর্জনা।" অর্থহীন নিয়ম, মননশূন্য মন্ত্র, চলন শূন্য চাল, জ্ঞান অনুভব ইচ্ছার অবরোধ—এই সব বিকৃতি ও কুসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতিকে বহুবার বহুভাবে সতর্ক করতে চেষ্টা করেছেন। 'তাসের দেশ'—সেই সব চেষ্টারই অন্যতম ফল। ব্যঙ্গ-নাটক হিসাবে, তাসের দেশ-এর সুনাম এবং অভিনয়খ্যাতি উল্লেখযোগ্য।

বাঁশরী (১৯৩৩)

রবীন্দ্রনাথের অল্পসংখ্যক সামাজিক নাটকের মধ্যে 'বাশরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য একখানি নাটক। এই নাটকখানির খশড়ায় নাম ছিল—'ললাটের লিখন'। 'বাশরী' নামকরণ করা হয়েছিল প্রকাশের সময়। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে (১৩৪০ কার্ত্তিক—পৌষ) বাঁশরী নামে নাটকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাকালে ক্ষিতীশের নাম দেওয়া হয়েছিল—পৃথ্বীশ।

ক্ষিতীশকে পৃথীশ করা তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবশ্য নয়; কিন্তু "ললাটের লিখন" বদলানো অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বদলানো ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিবর্তনের মধ্যে নাট্যকারের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের পরিবর্তনই প্রতিফলিত হয়েছে। 'ললাটের লিখন' নামকরণে, নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল—বাঁশরীর জীবনের 'কালো আগুনে'-এর ট্র্যাজেডির দিকে—ভালোবাসার ধনকে—মনের মানুষকে হারানোর বেদনার দিকে—ভালোবাসাবিহীন দাম্পত্য-বন্ধনের শোচনীয় নিয়তির দিকে। 'বাঁশরী-নামকরণে, লক্ষ্য সরে গেছে ট্র্যাজেডি-রসলোকের উর্ধ্বে বিশেষ একটি ভাবলোকে—যে ভাবলোকে বাঁশরী (আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত বলে মনে হলেও) বিজয়িনী ; সোম-

শংকরের সঙ্গে চিরকালের জন্য ভাবে-সম্মিলিত। এই ভাববৃন্দাবন ছেড়ে সোমশংকর একপদও বাইরে যায়নি। দুটি হৃদয়ের নিত্য-মিলনের বৃন্দাবন এই ভাবলোক। এই হিসাবে—বাঁশরী ভাব-সম্মিলনেরই আধুনিক একটি পালা। ললাটের লিখন যাই যার থাক এই নাটকে ভালোবাসার প্রতিনিধি বাঁশরী এবং কর্তব্যের প্রতিনিধি পুরন্দর এই দুই অতিকোটিক আদর্শ ও আবেগের সমন্বয় ঘটানো হ'য়েছে। বাঁশরীর ভালোবাসা আসক্তি-মুক্ত হ'য়েই প্রেমে পরিণত হ'য়েছে এবং পুরন্দর আসক্তি-মুক্ত প্রেমকে কর্তব্যের প্রেরণা-শক্তি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন—'দুর্গম পথের পাথেয়' ব'লে জয়পত্র দিয়েছেন। বাঁশরী প্রেমের আনন্দলোকে পৌঁছেই, সোমশংকরের ব্রতপালনের প্রেরণা হবার অধিকার পেয়েছে, পুরন্দর ও শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন—কর্তব্যের দুর্গম পথের পাথেয় যে শক্তি তা' আনন্দেরই দান। যে আনন্দ এই শক্তি দেবে—সে আনন্দকে বঞ্চিত জীবনের দুঃখ জয়ের আনন্দ হ'লে চলবে না, তাকে পরিতৃপ্ত জীবনেরই আনন্দ হ'তে হবে। মানবপ্রকৃতি সবকিছুর ভেতর দিয়ে এই আনন্দকেই চাইছে। সবকিছুর উপরে আত্মার আনন্দ। এর জন্য সে ভালোবাসা, সুখ এমন কি প্রাণকেও উপেক্ষা করতে পারে। ভোগসুখে পশু তৃপ্ত হ'তে পারে—মানুষের আনন্দ শুধু ভোগেই সীমাবদ্ধ নয়—জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন না করতে পারলে তার আনন্দই নেই। পশুপ্রকৃতি দেহ বা বস্তু পেলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু মানব-প্রকৃতি চায় অন্তরকে, তার স্বভাবকে। এই অন্তরকে পাওয়াই তো আসল পাওয়া। এই পাওয়া যে পায় সেই পায় প্রকৃত আনন্দকে। প্রকৃত পরাজয় তারই যে অন্তরকে না পেয়ে দেহ নিয়েই কাড়াকাড়ি করে; আর শত পরাজয়েও তারই জয় যে পায় সবচেয়ে বড় পাওয়া—অন্তরের প্রেমকে। কারণ এই পাওয়ায় সে আনন্দকেই পায়।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ—ভালোবাসাকে প্রেমের বীর্যের মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন এবং কর্তব্যের 'আইডিয়া'কে প্রেমের আনন্দে পূর্ণ করে মধুর করে তুলেছেন। দেখিয়েছেন—কর্তব্যবিমুখ স্বার্থপর ভালোবাসা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি প্রেমহীন কর্তব্যও অপূর্ণ।

শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়—বাঁশরী সম্বন্ধে লিখেছেন—নাটকে জীবনের প্রতি কবির নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ খুব স্পষ্ট।........ 'দুই বোন' 'মালঞ্চ' ও 'বাঁশরী—এই তিনখানি বইতে কবি 'প্রেম' ও 'ভালোবাসা'র মধ্যে সূক্ষ্মরেখা টানিবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাহিরে সামাজিকভাবে নিঃসংপৃক্ত নরনারীর আকর্ষণজনিত প্রেমেরও ক্ষেত্র আছে, সে প্রেম দেহসম্বন্ধে নিরপেক্ষ সাধারণ যৌন লক্ষণের ঊর্ধ্বে"। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর সমালোচনাকে আরো বিস্তারিত করেছেন শ্রদ্ধেয় সমালোচক অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। বাঁশরী নাটক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সমালোচনা যেমন ব্যাপক তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনেক কথা বলার পরে লিখেছেন—কবির ধারণা,—এই অসীম, অনির্ব্বচনীয় ভাবময় প্রেম গৃহপ্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে তাহার স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকে না, প্রণয়িনী গৃহিণী হইলে, প্রতিদিবসের সংসারচক্রের ধূলি-কর্দমে তাহার মনোহর রসমাধুর্য—তাহার ভাবলোকের লীলা-সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায়। প্রেম থাকিবে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ধূলিধূসর দিকচক্রবালের ঊর্ধ্বে মায়াময় স্বপ্নলোকে, নিবিড় ধ্যানলোকে, দুর্লভ অপ্রাপ্য বস্তুর মতো,......ইহাতেই প্রেম হইবে চিরমুক্ত—অব্যাহত থাকিবে তাহার অসীম সত্তা........ ..একই আধারে প্রেমের দ্বৈতরূপ—প্রণয়িনী-গৃহিণী—সম্ভব নয়। বরং বিবাহের বন্ধন প্রেমহীন হওয়াই ভাল......"। কবির ধারণাকে সমালোচনা করে লিখেছেন—"ব্যক্তিগত দাম্পত্য-প্রেমকে প্রবৃত্তিপঙ্কিল মনে করা ও প্রেমহীন বিবাহের আদর্শ

খাড়া করা নিতান্তই কাল্পনিক ও অবাস্তব। বিবাহবন্ধনের মধ্যে আসিলেই প্রেমের জাতিচ্যুতি ঘটিল আর বাহিরে থাকিলেই তাহার কৌলীন্য বজায় রহিল—ইহা যুক্তিহীন এবং অর্থহীন (রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা—৪৮০ পৃষ্ঠা)

আমার ধারণা—বাঁশরী নাটকে রবীন্দ্রনাথ—"যাকে ভালোবাস তাকে বিবাহ করো না"—এ তত্ত্ব প্রচার করতে চেষ্টা করেননি অথবা দাম্পত্যজীবনের বাইরে প্রেমের ক্ষেত্র তৈরী করার প্ররোচনা দেননি। যা' করতে চেয়েছেন তা' আগেই বলেছি—এখানে এই কথা ব'লেই শেষ করছি—রবীন্দ্রনাথ—সকলেরই গলায় "ভালোবাসার সূত্রে গেঁথে ব্রতের হার" পরিয়ে দিয়েছেন।

বাঁশরী-নাটকের পরে রবীন্দ্রন া—শ্রাবণগাথা গীতিনাট্য (১৯৩৪), চিত্রাঙ্গদা [নৃত্যনাট্য—১৯৩৬], চণ্ডালিকা [নৃত্যনাট্য—১৯৩৮], মুক্তির উপায় [কৌতুক নাট্য—১৯৩৮] এবং শ্যামা [নৃত্যনাট্য—১৯৩৯]—এই ক'খানি নাটিকা রচনা করেন। গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভার উন্মীলন এবং নৃত্যনাট্যে নিমীলন। নৃত্যনাট্যগুলি বিচার করবার সময় কবির সতর্কবাণী স্মরণে রাখা আবশ্যক—'এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়।" (চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা)॥ শ্রদ্ধেয়া প্রতিমাদেবীর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য—নৃত্যনাট্যে কলা-কৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল সুর ও তাল, ভাব খেলে তার দেহরেখায়।.........কবিতা ও গদ্যে যে তফাত, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকমই পার্থক্য [প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র—"নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা"]

শুধু যে এই জাতীয় নাটকের বিচারেই আগে জাতি নির্ধারণ করে,

তার বাহন স্থির করে নিতে হবে তা' নয়; সব নাটকের বিচারেই এই নিয়ম মানতে হবে। যেমন মনে রাখতে হবে নৃত্যনাট্যে নৃত্যই হ'চ্ছে বাহন, তেমনি মনে রাখতে হবে—গীতিনাট্যে গীতি কাব্যিক নাটকে কাব্য এবং গদ্যনাটকে গদ্যই হ'চ্ছে নাট্যের বাহন বা ভাষা। বিচারে বাহনের প্রকৃতিটির দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনি উপস্থাপনা-রীতির দিকেও দৃষ্টি না রাখলে চলবে না—অর্থাৎ উপস্থাপনা বস্তুতান্ত্রিক, ভাবতান্ত্রিক, সাংকেতিক,—এই তিনের কোন্‌টি, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর, বাহন উপস্থাপনাকে কি করে প্রভাবিত করে, উভয়ের সম্পর্ক কি, সে বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে। মোট কথা—বিচারের আদর্শ ঠিক ক'রে নিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে হবে।

"রবীন্দ্রনাট্যের ধারা"র এখানেই উপসংহার। গ্রন্থের উপসংহারও এখানেই। মাত্র দু'টি কথা বলেই গ্রন্থের উপসংহার করব। প্রথম কথাটি—বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় কথাটি রবীন্দ্রনাটকের রীতি সম্পর্কে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্র-নাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে দানের পরিমাণের কথা। ছোট বড় মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকরচনার সংখ্যা (সংলাপ-কাব্য বাদ দিয়ে) মোট আটচল্লিশ। তারপর মনে আসে—তাঁর শ্রেষ্ঠ দান রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির কথা এবং গীতি-নাট্য ও নৃত্যনাট্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। অতিসংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে হ'লে এই কথাই বলতে হবে—বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ চির-স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন—তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির জন্যেই। বাস্তবিক, বিশ্বনাট্য প্রদর্শনীতে নাটক পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং তার জন্য নাটক নির্বাচন করতে গেলে দেখা যাবে—রবীন্দ্রনাথ এমন কোন সামাজিক নাটক লেখেননি যা'কে দেহে-মনে সামাজিক ব'লে গ্রহণ করা যায়; তেমনি তেমন কোন ঐতিহাসিক নাটক লেখেননি

যা'কে যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে। সামাজিক সমস্যা বা ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রী নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেননি তা' নয়, কিন্তু নিজের ভাবতান্ত্রিক প্রবণতার দোষে, সব নাটকই ভাবাবিষ্ট বা তত্ত্ব-মুখ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে বাস্তবনিষ্ঠা থাকলে ভাব ও রূপের মধ্যে অদ্বৈতযোগ ঘটানো সম্ভব হয়, ভাবলোককে জীবলোকে পরিণত করা যায় সেই বাস্তবনিষ্ঠার অভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে ভাব ও রূপের সমন্বয় ঘটতে পারেনি। তাঁর সৃষ্টির বড় ত্রুটি, তাঁরই ভাষা ধার ক'রেই বলা যাক—যোগাযোগের ট্র্যাজেডি—যোগের মধ্যেও অযোগের বিচ্ছেদ অর্থাৎ ভাবের সঙ্গে রূপের সামবায়িক সম্বন্ধের অভাব। তাই তাঁর হাতে ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক—সবই ভাবপ্রধান বা তত্ত্ব-মুখ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে, যে ভাবতান্ত্রিক প্রবণতা খাঁটি ঐতিহাসিক বা খাঁটি সামাজিক নাটক লেখার পথে অন্তরায় হ'য়েছে, সেই প্রবণতাই রূপক-সাংকেতিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরম সহায় হ'য়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে যা' ছিল দোষ বা দুর্বলতা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাই হ'য়েছে গুণ বা শক্তি। একক্ষেত্রে যা' বাধা সৃষ্টি ক'রেছে, অন্যক্ষেত্রে তাই দিয়েছে মুক্তি। স্বীকার করতেই হবে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকার-প্রতিভা—রূপক-সাংকেতিক নাটকের ক্ষেত্রে যতখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে, অন্যক্ষেত্রে ততখানি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেনি। এমন কি, 'কাব্যিক নাটক'-এর ক্ষেত্রেও—যেখানে কবির আত্মপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা বেশী, কবি মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন—ভাব-চেতনা এবং রূপ-চেতনার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন—রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনা এক একটা হীরের টুকরো—যেটুকু তিনি বলেন ভাষা-শিল্প হিসাবে তা' বহুমূল্য, বলা চলে, অদ্বিতীয়। ভাব, ভাবনা ও ভাষা কোনো-কিছুরই অভাব তাঁর নেই। কিন্তু এ কথাও তেমনি

অস্বীকার করার উপায় নেই যে এত সব থাকতেও রবীন্দ্রনাথ শেকসপীয়র বা ইবসেন বা বার্ণার্ডশ হ'তে পারেননি—মেতার্লিঙ্ক-ষ্ট্রীণ্ডবার্গ-হউপ্টম্যান গোষ্ঠীরই একজন হ'য়ে আছেন। কেন এমনটি হ'ল—এ প্রশ্ন মনে জাগতেই মনে পড়ে যায়—উনবিংশ শতাব্দীর রোমাণ্টিক কবিদের নাটক-রচনার ব্যর্থতার কথা এবংসঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় নিকল প্রমুখ সমালোচকরা এই ব্যর্থতার যে যে কারণ নির্দেশ করেছেন সেই সব কারণগুলির কথা। বড় কবি হ'লেই যে বড় নাটক লিখতে পারবেন এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তার প্রমাণ উইলিয়াম ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, সাদি, কোলরিজ, বায়রণ, শেলী, কীটস্ লেসিঙ, গ্যেটে প্রভৃতি। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের "দি বর্ডারার্স (১৭৯৫-৯৬), রবার্ট সাদি+কোলরিজ-এর "দি ফল অফ্ রোবস্পিয়ের" (১৭৯৪), কোলরিজের রিমোর্স (১৮১৩), লর্ড বায়রণের—ম্যানফ্রেড্ (১৮১৭), মেরিনো ফলিয়েরো (১৮২০), সর্দানাপেলাস্ (১৮২১), শেলীর সেন্সি (১৮১৮), কীটসের ওথো দি গ্রেট (১৮১৯), লেসিঙের—এমিলিয়া গেলোত্তি (১৮৭), নাথান্ ডের ওয়াইজ (১৭৭৯) প্রভৃতি, গ্যেটের—Goetz Von Berlinchingen (১৭৭৩), Clavigo (১৭৭৪), Stelln (১৭৭৫), Iphigenia auf Tauris(১৭৪৭), Toarquata Tasso—(১৭৯০), Egmont (১৭৮৭), এবং Faust (১৮০৮, ১৮৩১):প্রভৃতি, নাটক হিসাবে ব্যর্থ সৃষ্টি হ'য়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক নিকল লিখেছেন—'What prevents them from assuming higher power is the intensely **subjective tendency**...This was a a Common Feature of the remantic temper..." (The world Drama—413.) ; আর একটি কারণ অনেকক্ষেত্রেই—**cleavage between the poets and the theatre.** অন্য কারণ—শেকস-পীয়রকে অনুকরণ করার প্রবৃত্তি। জার্মান কবি-নাট্যকারদের ব্যর্থতার কারণ

নির্ধারণ করার প্রসঙ্গে লেসিঙ সম্বন্ধে গেটে যে উক্তি করেছিলেন নিকল সেই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। গেটে বলেছিলেন—**"Philosophy injured his, poetry, because this led to Consider the idea far higher than all Nature ; indeed, thus to annihilate Nature. He believed that what he was able to Conceive must happen, whether it were in conformity with nature or not"** অবশ্য নিকল বলেছেন—গেটে নিজেও এই দোষে দোষী ; থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্বেও, গেটের থিয়েটার-সংস্কার জন্মেনি, কারণ—"Ideas tend to rule in his plays, and intellectual discussions to take the place of action, the true transcendence of the dramatist is lost in the romantic subjectiveness of his art"—(The World Drama) রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই যুক্তিগুলি মোটামুটি খাটে। 'রোমান্টিক ধাতের প্রাবল্যের জন্যই তিনি বিশুদ্ধ বাস্তবিক নাটক সৃষ্টি করতে পারেননি ; পেরেছেন রূপক-সাংকেতিক নাটক সৃষ্টি করতে এবং প্রবণায়িত হয়েছেন—বাস্তবিক জগতের জীবনের রূপের অর্থাৎ বাস্তবিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে, রূপকের বিমানে চড়ে এবং সংকেতের পাখা মেলে ভাবের রহস্যলোকে উধাও হয়ে যেতে। এই একই কারণেই, রূপক সংকেতের ক্ষেত্রেও, যে সব পাত্র-পাত্রী তিনি সৃষ্টি করেছেন তারা যতটা প্রতীক হ'য়েছে ততটা রক্তমাংসের মানুষ হ'তে পারেনি। অধ্যাপক নিকলের অনুকরণে বলা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথ has not succeeded—"in making the symbol Concrete and in clothing a living charater with the robes of the idea"। তবে, রবীন্দ্রনাথ রূপকে বাস্তবিককল্প করতে পারেননি এই কথা না বলে, করতে চাননি বলাই, বোধহয়, ভাল। সত্যই, রবীন্দ্রনাথ চাননি ব'লেই তা' করেননি। কারণ তাঁর কাছে—কাব্যিক সত্য—

কল্পনার সত্য, ভাবের সত্য। "He believed that what he was able to conceive must happen......" তাঁর কাছে ভাবের সংকেতনেই রূপের সার্থকতা এবং তা'তেই রূপের সত্যতা।

যাই হো'ক, রোমান্টিকতার আধিক্যের জন্যই হো'ক, আর অতিরিক্ত "ভাব"-প্রসক্তির জন্যই হো'ক, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে **অতিবাস্তবিক** সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটক লেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে এ কথা বললে চলবে না যে তিনি নাটকই লেখেননি। তাঁর রূপক-সাংকেতিক'-জাতীয় নাটকগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যের কেন, বিশ্বসাহিত্যেরও দুর্লভ ঐশ্বর্য। তারপর এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না—নাটকের বিভিন্ন রূপ নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার মূল্যও যথেষ্ট। নাটককে কতখানি subjective করা যেতে পারে, একটা mood বা ভাবাবেশকে নাটকীয় রূপ দেওয়া যায় কি না, বর্ণনাকে আবেগগর্ভ ক'রে নাটকীয় কৌতূহল বজায় রাখা যায় কি না—এই সব নানা সমস্যা নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সাফল্যও লাভ করেছেন। তাঁর সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটকের যে মূল্যই নির্ধারিত হোক তাঁর গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, সাংকেতিক নাট্য এবং কমেডিগুলি যে বাংলা নাট্যসাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি নিয়ে বিরাজ করবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবার **রবীন্দ্রনাট্যের রীতি** সম্বন্ধে দু'একটি কথা ব'লেই আলোচনা শেষ করছি। আগের আলোচনা থেকেই এ কথা স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথের রীতি প্রধানত ভাবতান্ত্রিক (idealistic) রূপকধর্মী (allegorical) এবং সাংকেতিক (symbolic)। ভাবতান্ত্রিক শিল্পীর বড় আপাই এই যে তিনি ভাবাবেশে মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন না এবং abstraction-এর ঝোঁক তাঁর মধ্যেবেশী থাকে। এই

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ব্যাপার ঘটেছে। যদিও ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়বস্তুকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবতান্ত্রিকতার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছেন, তবু যেখানেই কোনো বিশেষ তত্ত্বকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সেখানেই তিনি উপস্থাপনাকে রূপকের ও সংকেতের স্তরে নিয়ে গেছেন। এই কারণেই, রূপক ও সাংকেতিক—এই দুই উপস্থাপনা-রীতিই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আশ্রয় হয়েছে। রূপক এবং সাংকেতিক রীতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রায় প্রত্যেক রবীন্দ্রনাট্যসমালোচকই বেশী-কম আলোচনা করেছেন। 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক-বিচার' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'রক্তকরবী'-আলোচনা প্রসঙ্গে, আমিও এ সমন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে।

উপস্থাপনা-রীতির রূপক-সংকেতপ্রবণতার পরেই, মনে আসে—**গীতিপ্রবণতার** কথা। এমন খুব কম নাটকই আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ গানকে সংলাপের পরিপূরক হিসাবে প্রয়োগ করতে অথবা গানের জন্যই গান যোজনা করতে চেষ্টা না করেছেন। শুধু যে গীতি-নাট্যেই তিনি গানকে সংলাপের পদ দিয়েছেন তা' নয়, অন্যান্য অনেক নাটকেও তিনি পাত্র-পাত্রীদের গানের সুরে কথা বলিয়েছেন। যদিও রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে, গীতি-সংলাপ নাটকের আত্মাকে তেমন ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি, তবু সর্বক্ষেত্রেই যে গান সুপ্রযুক্ত হয়েছে সে কথা বলা চলে না।

আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রাণশক্তি বাহ্যঘটনার চমৎকারিত্বের মধ্যে নিহিত নয় ব'লে, প্রধানতঃ ভাবদ্বন্দ্ব, ভাবাবেশ বা আত্মার গভীর আর্তির ঐকান্তিকতার মধ্যে প্রাণশক্তি নিহিত ব'লে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে ব্যঞ্জনাময় সংলাপ, ভাবের সূক্ষ্ম

ক'রে আছে। এই ভাবদ্বন্দ্ব এবং আবেশ সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে কোন প্রযোজকই রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনা ক'রে সামাজিকের পরিতোষ-বিধান করতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে—সর্বতোভাবে অবস্থানুকরণেরই নাম অভিনয় এবং রবীন্দ্রনাটকের "অবস্থা" সাধারণ নাটকের অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। তাই তার অভিনয়ে ঐ স্বাতন্ত্র্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেই হবে। যাই হো'ক সবশেষে এই একটি কথাই বলার আছে—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা কি কি পাইনি তার হিসাব ক'রে কোন লাভ নেই। এই কথাই বার বার আমাদের বলতে হবে—"যা পেয়েছি, যা দেখেছি তুলনা তার নেই।" রবীন্দ্রনাথ শেকসপীয়র বা গেটে বা ইবসেন বা বার্ণার্ড'শ হননি—এ নিয়ে বৃথা আক্ষেপ করে আমরা কালহরণ করব না। বরং এই কথা বলেই গর্ববোধ করব—যে শেকসপীয়র, গেটে, ইবসেন, বার্ণার্ড'শ' এঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের মতো রূপক-সাংকেতিক তত্ত্ব-নাটক লিখতে পারেননি। মহাকালের সোনার তরীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য-কৃষ্টি থরে বিথরে সাজিয়ে দিয়েছেন। মহাকালের প্রসন্ন দৃষ্টি যাদের উপরে পড়েছে তারা টিকবেই। আমাদের শত ধিক্কারে বা সহস্র প্রশংসাতেও কালের মন টলবে না।

———

প্রথম অধ্যায়

"রবীন্দ্র প্রতিভা"-দর্শনের দৃষ্টিকোণ

দার্শনিকপ্রবর শোপেনহাওয়ার, "অন্ জিনিয়াস"—প্রবন্ধে, প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা' থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত ক'রে প্রতিভাদর্শনের দৃষ্টিকোণের উপর সাধারণ ভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে—

"Those who emerge from the multitude, those who are called men of genius are merely the "lucida intervalla" of the whole human race. They achieve that which others could not possibly achieve. There originality is so great that not only in their divergence from others obvious, but their individuality is expressed with such force that all the men of genius who have ever existed show, every one of them, peculiarities of character and mind, so that the gift of his works is one which he alone of all men could have presented to the world."। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতিটি প্রতিভার অসাধারণত্বকে খুব জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করছে। প্রতিভাবানরা সমগ্র মানবজাতির 'আলোকস্তম্ভ'—অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তির আধার,—অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার অধিকারী—মৌলিকতায় অসাধারণ—ব্যক্তিত্বে দুর্বার, চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যে বিলক্ষণ—একজাতীয়

মন্তব্যগুলো নিঃসন্দেহে প্রতিভার অলোকসামান্যত্বই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, প্রতিভাকে অসাধারণ বলে প্রচার করলেও তিনি তাকে অলৌকিক বলে ঘোষণা করেননি। সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিভাবানের পার্থক্য যে শক্তির বা বৃত্তির মাত্রগত পার্থক্যমাত্র—গুণগত পার্থক্য নয়, এ কথা তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করেছেন—লিখেছেন—"The difference between the genius and the ordinary man, is no doubt, a quantitative one" (একই প্রবন্ধ)। অবশ্য এ কথাও বলতে ভোলেননি—মাত্রাগত পার্থক্য এত বেশী যে তাকে সাধারণতঃ লোকে গুণগত পার্থক্য বলেই মনে করে থাকে।

প্রতিভা যে অলৌকিক কোন কিছু নয়, কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও সে কথা বলেছেন। অকবির সঙ্গে কবির পার্থক্য অবশ্যই আছে ; কিন্তু সে পার্থক্য—"Greater promptness to think and feel without immediate external excitement and greater power in expressing such thoughts and feelings as are produced in him in that manner"—এ ছাড়া বেশী কিছু নয়। কবিও সমাজের দশজনের একজন—এক কথায় সামাজিক ব্যক্তি, তবে এমন বিশেষ একজন সামাজিক যিনি মানব প্রকৃতিকে বিশেষ গভীর ও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেছেন, যাঁর চিত্তের স্পর্শকাতরতা ও সহৃদয়তা খুবই বেশী এবং যাঁর আত্মা অধিকতর উন্মুক্ত উদার ও সর্বগ্রাহী—কবির নিজের ভাষায়—"a man, it is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind" (Poetry and Poetic Diction)

শিল্পতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ বেনিডেটো ক্রোচের সিদ্ধান্তও স্মরণীয়—"Nor can we admit that the word genius or artistic genius as distinct from the non-genius of the ordinary man, possesses more than a quantitative signification, ...

The cult of the genius with all its attendant superstitions has arisen from this quantitative difference having been taken as a difference of quality. It has been forgotten that genius is not something that has fallen from heaven, but humanity itself." অর্থাৎ প্রতিভাবান এবং অপ্রতিভাবানদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা শক্তির গুণগত কোন বৈশিষ্ট্য নয়, মাত্রাগত বৈশিষ্ট্য। প্রতিভাবান আকাশ থেকে পড়েন না। তিনি সামাজিক মানুষেরই একজন। যা হোক—দেখা যাচ্ছে—প্রতিভা দুর্লভ, শক্তিমান প্রতিভা আরো সুদুর্লভ—এ সিদ্ধান্তে অবিচলিত থেকেও, শোপেনহাওয়ারের মতো ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতো এবং ক্রোচের মতো মনীষীরা প্রতিভার লৌকিকত্বে পূর্ণ আস্থাই রেখেছেন।

কিন্তু সকলেই যে প্রতিভাকে লৌকিক বলতে রাজি হয়েছেন তা নয়। যাঁরা দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী—অধ্যাত্মবাদী দর্শনের দৃষ্টি কোণ দিয়ে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাখ্যা করতে চান—সবকিছুর মধ্যেই দৈব ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আবিষ্কার করতে সচেষ্ট, তাঁরা প্রতিভাকে লৌকিক ব্যাপার বলে মনে করতে পারেননি। প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব দেখে, শক্তির বিভূতির দিকে চেয়ে, অপার বিস্ময়ে তাঁরা ডুবে গেছেন—বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন এবং সমস্ত কারণের পরমকারণ বলে যাঁকে ধরে রেখেছেন তারই শরণ নিয়ে অন্যান্য রহস্যের মতো প্রতিভা-রহস্যেরও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। সহজ সিদ্ধান্ত করেছেন—প্রতিভা বিধিদত্ত অধিকার—

বিধাতার বিশেষ দান—দৈবপ্রেরণারই নামান্তর—"তেজোহংশসম্ভব"। এঁদের কাছে, প্রতিভা অলৌকিক বলেই সুদুর্লভ। প্রতিভা যেন এক পরম দিব্যদৃষ্টি—এবং শুধু তাঁরই সে দৃষ্টি থাকে—"যমেবৈষো বৃণুতে"—যাঁকে তিনি বরণ করে নেন—লীলাবশে কৃপা করেন। বাস্তবিক, দৈব বিধান বা চৈতন্যময় ব্রহ্মের মতো কোন অলৌকিক পুরুষের কামনাকেই সৃষ্টি-স্থিতি -লয়ের পরমকারণ বলে মেনে নিলে প্রতিভাকে অলৌকিক শক্তি ব'লতে বাধা আসতে পারেনা। জাগতিক ব্যাপারকে যাঁরা অতিজাগতিক কোন রহস্যময় শক্তির ইচ্ছাধীন বলে মনে করেন, তাঁদের হাতে বিশ্বের সব রহস্যের চাবিই তো রয়েছে। 'তাঁর ইচ্ছা'র মহাসূত্র দিয়েই তাঁরা সব কিছুরই—এক কথায় সব জটিল তত্ত্বেরই,সমাধান করতে পারেন—তাই করেও থাকেন। বিধাতার ইচ্ছা বা কৃপা বাদ দিয়ে, কোনো অসাধারণেকেই তারা ব্যাখ্যা করতে পারেন না; দৈব ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই তারা কারণ হিসাবে খুঁজে পান না। বিশেষত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া নিয়েই মহাসমস্যা! সে সমস্যার সমাধান তাঁরা ঐ এক কথায়ই করেন।

এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখেই কবি এরিয়েষ্টো একটা স্মরণীয় উক্তি করেছিলেন—"Natura lo face e poi ruppe lo stampo: After Nature stamps a man of genius she breaks the die" প্রকৃতি এক ছাঁচে একের অধিক প্রতিভা গড়েন না, একটি প্রতিভা গড়ার পরেই ছাঁচখানি ভেঙ্গে ফেলে দেন। বড় বড় প্রতিভার বিভূতি দেখে এরিয়োষ্টোর কথাটা বার বার মনে করতে ইচ্ছে হবে বই কি! শক্তির এমন নিপুণ প্রক্রিয়া, অদ্ভুত সমারোহ, উপাদানের এমন বিস্ময়কর সমাহার সংশ্লেষণ—গীতার ভাষায় বলা যাক—এমন "বিভূতিমৎ সত্ত্বমূর্জ্জিতমেব" দেখে ব্যাপারটিকে আলৌলিক 'তেজোহংশসম্ভব' ব'লে মনে করার ঝোঁক যদি দেখাই দেয়, অধ্যাত্মবিশ্বাস-অভ্যস্ত মনকে তার জন্য খুব

দোষী করা যায় না। বহুদিনের অভ্যাস কি একদিনে মরে? শক্তির বিশেষ পরিস্ফুরণ—সে স্ফুরণ জড়জগতেই ঘটুক আর চৈতন্যের জগতেই ঘটুক—বিস্ময়বোধকে উদ্দীপিত করবেই করবে।

প্রশ্ন—এখন তাই বলে কি বিস্ময়করকে লৌকিক নিয়মের বাইরের ব্যাপার বলতে হবে? বিধাতা নামক কোন পুরুষের খেয়ালের খেলা বলে মনে করতে হবে? অসাধারণ বা বিশিষ্ট হ'লেই তাকে অলৌকিক বলতে হবে কেন? সাধারণ যেমন লৌকিক, অসাধারণও তো তেমনি লৌকিক। বিশেষত্বে 'কি' বিভূতিমানেরই একচেটে অধিকার? তা তো নয়। 'মহতো মহীয়ান' যেমন বিশেষ, 'অণোরণীয়ান'ও তেমনি বিশেষ। সৃষ্টি মহীয়ান হোক আর অনীয়ানই হোক—সৃষ্টিমাত্রই বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র। অবিশিষ্ট ব'লে যদি কিছু থেকে থাকে তা অব্যক্ত বা অসৎ। যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই ব্যক্তি। সৃষ্টিমাত্রই বৈশেষিক। এই ভাবে দেখলে, প্রকৃতি এক ছাঁচে শুধু যে দু'টো প্রতিভাকেই গড়েন না তা নয়, এক ছাঁচে দু'টো অতিসাধারণ ব্যক্তিকেও গড়েন না। সুতরাং এরিয়োষ্টোর মন্তব্যটি কেবল প্রতিভাবানদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়; অতিসাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কেও কথাটা সমানভাবে প্রয়োজ্য। প্রকৃতির কারখানায়, যত ব্যক্তি তত ছাঁচ। আপাতদৃষ্টিতে একে প্রকৃতির খেয়াল বলা যেতে পারে কিন্তু আসলে—এই ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে প্রকৃতির নিজেরই ধর্ম—আপন-হাতে-গড়া অমোঘ বিধান। এরিয়োষ্টো প্রকৃতির খেয়াল পর্য্যন্তই দেখেছেন। প্রকৃতির ধর্ম বা অমোঘ বিধানের কথা তিনি ভেবে দেখতে যান নি।

কিন্তু যাঁরা প্রকৃতিকে স্বয়ম্ভু এবং পরমকারণ ব'লে মনে করেন সৃষ্টির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতে—প্রকৃতির বৈশেষিক ধর্মের কারণ খুঁজতে, তাঁরা প্রকৃতির বাইরের কোন অলৌকিক পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন বোধ করেন না। এই সব অদ্বৈতবাদী বস্তুবাদীদের কাছে—

সমস্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা মূলা প্রকৃতির ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে। তাতে, অমোঘ বিধান—নিয়তির মতোই—বিরাজ করছে। সে বিধানের মূল সূত্র—কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ। সত্যিই তো, আমরা দেখছি—সৃষ্টি অনন্ত বিশেষত্বময়। সেখানে বেশ একটা বাহাদুরি আছে। কত অসংখ্য রূপে তার অভিব্যক্তি অথচ একের সঙ্গে অপরের মিল নেই, থাকলেও সর্ব্বাংশে নেই, ষোল আনা নেই। সামান্য লক্ষণে যত ঐক্যই থাক, বিশেষ লক্ষণে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই (অজৈব + জৈব) বিশিষ্ট। বাস্তবিক, অনন্তরূপিনী গুণময়ী প্রকৃতি, অজৈব জগতের জৈবজগতের কত বিচিত্র রূপে রূপে আপনাকে প্রবিভক্ত করে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে। দেশ-কাল আয়তনের আধারে, কত অগণিত জ্যোতির্মণ্ডলে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, কত সৌরজগতে, গ্রহে উপগ্রহে, মহাসাগর-সাগরে, নদী-গিরি-কান্তারে কত না বিচিত্র খণ্ড খণ্ড শক্তি-ক্ষেত্র—বিচিত্র পদার্থ-সংস্থায়, মহাশক্তি প্রকৃতির অজৈব বিবর্ত্তবিলাস চ'লেছে। জৈবলীলার পর্যায়েও, কত না জাতি-প্রজাতিতে কত না—আকৃতি-প্রকৃতিতে, কত না ব্যক্তিজীবনের বাসনা-কামনায়, আবেগ উপলব্ধিতে, কল্পনায় মননে, চৈতন্য-ধর্মের বিচিত্র বিকাশের ধারা বয়ে চলেছে। সমস্ত চলার পেছনে আছে প্রকৃতির গতিশীলতা বিবর্ত্তনশীলতা। গতির বেগেই দেশ-কালমাত্রিক বিশ্বজগতের উদ্ভব ঘটেছে—'রূপং রূপং প্রতিরূপং'—সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই গতিশীলতা থেকেই, বিবর্ত্তনশীলতা থেকেই—'অণোরণীয়ান' 'মহতো মহীয়ান' ব্যক্তি-গ্রহ সম্ভব হ'য়েছে। এই গতি বা বিবর্ত্ত নিয়মরহিত কোন ব্যাপার নয়। অমোঘ নিয়মের শাসনে প্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণু শাসিত। সমগ্র বিশ্বে নিয়মের রাজত্ব বিরাজ করছে এবং তা করছে বলেই সৃষ্টি অর্থাৎ অব্যক্তের ব্যক্তিভাব—বিশিষ্টরূপতা—সম্ভব হ'য়েছে। নিয়মের অভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নব নব উন্মেষ বা অভিব্যক্তি কোন ব্যাপারই সম্ভব নয়। ব্যাপারমাত্রই নিয়মাধীন।

সৃষ্টিরহস্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—সৃষ্টি-ব্যাপারের মূলে, দু'টি প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। একটাকে বলা যেতে পারে—বৈশেষিক-প্রবণতা বা বিশেষীভবন প্রবণতা (Process of individuation)। নির্বিশেষের বিশেষ হওয়ার এই প্রবণতাকে আমরা সংক্ষেপে এবং বেদান্তের অনুকরণে বলতে পারি—একের বহু হওয়ার বাসনা—রূপে রূপে প্রতিরূপে 'অনেকধা প্রবিভক্ত' হওয়ার কামনা। এই প্রবণতা না থাকলে সৃষ্টিতে এই অনন্ত বৈচিত্র্য কিছুতেই আসতে পারতো না। তবে অনন্তবৈচিত্র্যের জন্য প্রবণতাটিই যথেষ্ট নয়। মূলা প্রকৃতি, কোষ-বিভাজনের মতো যদি সমান সমান ভাগে আপনাকে ভাগ করত, তা'হলে খণ্ড রূপের সম্ভাবনা থাকত বটে কিন্তু বিচিত্র রূপের সম্ভাবনা থাকত না। এর জন্য চাই—শক্তির বিষমীভবন-প্রবণতা (unequal distribution and Configuration)। এই প্রবণতা আছে ব'লেই, বিরাট বিশ্বরূপ—শক্তিক্ষেত্রের আধারে, শক্তির অনন্ত রূপ-রূপান্তরের খেলা চলেছে এবং শক্তি অণু থেকে অণীয়ান রূপে, মহান থেকে মহীয়ান রূপে আপনাকে বিলসিত করে দিতে পারছে। বিশ্বের বিরাট শক্তি-ক্ষেত্রের মধ্যে অসংখ্য বিচিত্র এবং বিষম সংশ্লেষ-সংগঠন সম্ভব হয়েছে—অনন্ত কেন্দ্র বা ব্যক্তিগ্রহ গড়ে উঠতে পেরেছে। এর ফলেই সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের চক্র আবর্তিত হ'য়ে চলেছে—তরলে কঠিনে বাষ্পে নানারূপে অখণ্ডের খণ্ড প্রকাশ সম্ভব হ'য়েছে। অখণ্ড শক্তি-ক্ষেত্রের অন্যতম অংশ হ'য়েও, অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত থেকেও, খণ্ড নিজের অহং কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, নিজের ধর্মে বিশিষ্ট এবং বিশেষ দেশ-কালে স্বতন্ত্র স্থিতি-গতি-পরিণতির অধীন। শক্তির এই প্রকাশ—সীমার বন্ধনে অসীমের অভিব্যক্তি অনিয়মনিয়ন্ত্রিত কোন ব্যাপার নয়। মহাশক্তির ধর্মের মধ্যেই তার নিয়ম নিহিত আছে। কোন বিধাতাপুরুষের পূর্ব-পরিকল্পনা দ্বারা খণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নিয়ন্ত্রিত হয় এ কথা না বলে বরং এই কথাই

বলা সমীচীন শক্তিকেন্দ্র সমূহের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে, সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ ধর্মের প্রভাবে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামবায়িক কারণে, খণ্ড প্রকাশের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় নিয়ন্ত্রিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে—নক্ষত্রের বা সূর্য্যের কথাই ধরা যাক। শক্তির তেজোময় রূপের কী বিরাট সংহতি এক একটি নক্ষত্র—এক একটি সূর্য্য। যে কেন্দ্র আশ্রয় করে এই শক্তি-সংস্থা গড়ে উঠেছে, যে কেন্দ্র এতখানি তেজঃপুঞ্জকে আপনার কক্ষে আকর্ষণ করে আবর্ত্তিত করাচ্ছে, তার ধারণাশক্তির পরেই এক একটি জ্যোতিষ্কের রূপ বা গঠন নির্ভর করছে। আমাদের এই সৌরজগৎও অন্যতম বিরাট স্বতন্ত্র শক্তিৎক্ষেত্র এবং একই নিয়মের বশে গড়ে উঠেছে। গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি এবং তাদের ক্রম পরিণতির ইতিহাস যত বিস্ময়করই হোক নিয়মরহিত অলৌকিক কোন ব্যাপার নয়। যে বিরাট শক্তি উচ্ছ্বসিত ও উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে পাষাণ-পরিণাম লাভ করেছে, হিমালয় আলপ্‌স্ প্রভৃতি পর্ব্বতের আকার ধারণ করেছে, পৃথিবীর অখণ্ড শক্তিক্ষেত্রে, ভৌতিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলে, সেই শক্তির ঐ বিশেষ গতিপরিণতি দেখা দিয়েছে। মহাসাগর সাগরের গর্ভে যে বিরাট জলমূর্ত্তি দেখা যায়, তার যে তরঙ্গিত সংক্ষোভ বিক্ষোভ দেখা যায়, তাও তো শক্তির রূপরূপান্তরের অমোঘ নিয়মেরই অধীন। এমনি প্রত্যেকটি বস্তু—সেই মহাশক্তিরই সূক্ষ্ম অথবা স্থূল মূর্ত্তিমাত্র—কঠিন বাষ্প বা তরল রূপে আত্মপ্রকাশ। যেখানেই শক্তির বিশেষ সংগ্রহ ঘটে,—সেখানেই বিভূতিমান সত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়।

শক্তির বিষম বণ্টন শুধু যে অজৈব জগতেই সীমাবদ্ধ তা নয়। জৈব-জগতেও দেহ-মনের গঠনে বিষম বিকাশের ছড়াছড়ি। জাতিতে প্রজাতিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আকৃতি প্রকৃতির কত বৈষম্য। এককোষী প্রথমতম জীব থেকে অসংখ্যকোষী মনোজীবক প্রাণী মানুষ পর্য্যন্ত দৈহিক মানসিক বৈশিষ্ট্যের ও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। মনুষ্য প্রজাতির (species)

মধ্যেও বা কত উপজাতি-বিভাগ। আকৃতি প্রকৃতির কত বিভিন্নতা। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে কত না স্তরভেদ। আবার একই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক গঠনে, মানসিক শক্তিতে বিচিত্র বৈষম্য—জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা বৃত্তির মধ্যে কত তারতম্য। কোন দু'টি ব্যক্তিসত্তা যে জ্ঞানে-অনুভবে-ইচ্ছায় সমান হয় না, তার কারণ কোন দৈব পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত নেই; কারণ নিহিত আছে—ব্যক্তির জ্ঞানবন্ধ, অনুভববন্ধ এবং ইচ্ছাবন্ধের সংগঠনের মধ্যেই। মস্তিষ্কের গঠন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণের সুযোগ সুবিধা, বিষয়ের ধারণা বা স্মরণশক্তি এবং বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের এবং স্বরূপের জ্ঞান—এমনি নানা মানসিক ক্রিয়ার উপর জ্ঞানবন্ধের গঠন নির্ভর করে। তেমনি অনুভববন্ধের গঠন প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনা এবং নিবৃত্তির নিবর্ত্তনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা, স্নায়ুর প্রকৃতি দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ইচ্ছাবন্ধের প্রকৃতি, জৈবিক ও সামাজিক বাসনার প্রেরণার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিয়ে, বলা যেতে পারে—প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্যের কারণ, ভাবনা-কল্পনা-আবেগ-ইচ্ছা এই—কয়টি শক্তির সংযোগ এবং তাদের মাত্রাতারতম্যের মধ্যেই নিহিত থাকে।

মানসিক শক্তিতে অসাধারণত্ব—শেষপর্য্যন্ত, জ্ঞানবন্ধের অনুভববন্ধের এবং ইচ্ছাবন্ধের অসাধারণ ক্রিয়াসামর্থ্য, রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বলা যেতে পারে—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বিলক্ষণ নৈপুণ্য। তাই বলে অসাধারণ মাত্রেই যে সর্বতোভাবে অসাধারণ তা বলা চলে না। কেউ হয়ত জ্ঞানে অসাধারণ ,অনুভবে ও কর্মে সাধারণ ; কেউ বা অনুভবে—কল্পনা শক্তিতে অসাধারণ, জ্ঞান-কর্মে সাধারণ ; কেউ কর্মশক্তিতে অসাধারণ, জ্ঞানে-অনুভবে খুবই সাধারণ। জ্ঞান-প্রেম-কর্মের এক বা একাধিক বৃত্তির অসাধারণ ক্রিয়াসমর্থ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন রকমের

অসাধারণত্ব দেখা দিতে পারে। যেখানে তিনের সমান স্ফূর্তি, সেখানে তো সোনায় সোহাগা।

বাস্তবিক জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে সমমাত্রায় পরিস্ফূর্ত এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা খুবই দুর্লভ, নেই বললেও চলে। প্রত্যেক প্রতিভাই অংশাবতার বিশেষ ; কোন-না-কোন দিকে তার দুর্ব্বলতা আছেই। এ সম্পর্কে দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের মন্তব্যটুকু উল্লেখযোগ্য—"But there is always a limit to human capacity, but no one can be a great genius without having some decidedly weak side, it may even be some intellectual narrowness. In other words there will be some faculty in which he is now and then inferior to men of moderate endowments. It will be a faculty which, if strong might have been an obstacle to the exercise of the qualities in which he excels. what this weak point is, it will always be hard to define with any accuracy even in a given case.

It may may be better expressed indirectly thus : plato's weak point is exactly that in which Aristotle is strong and vice versa ; and so, too, Kant is deficient just where Goethe is great"। এই মন্তব্যের শেষটুকু প্রণিধানযোগ্য। প্লেটো সেইখানেই দুর্ব্বল যেখানে এরিষ্টটল সবল ; আবার প্লেটো যে বিষয়ে সবল সেই বিষয়ে এরিষ্টটল দুর্বল। কান্টের দৈন্য সেই বিষয়েই যে বিষয়ে গেটের আছে প্রচুর ঐশ্বর্য্য। মন্তব্যটির তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানবৃত্তির ক্রিয়াসামর্থ্য যার মধ্যে বেশী অনুশীলিত হয়, হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়া তার মধ্যে কম হয়, আবার হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন যার মধ্যে বেশী অর্থাৎ আবেগে-কল্পনায়-সমবেদনাশীলতায় যিনি বড়, মেধায় অর্থাৎ মস্তিষ্কের

অনুশীলনের ব্যাপারে তিনি হয়ত তত বড় হ'তে পারেন না। একের অনুশীলনে শক্তি অধিক ব্যয়িত হয় ব'লে অন্য খাতে শক্তির অনটন ঘটে থাকে। 'মোটকথা, একাধারে সমস্ত বৃত্তির প্রতিস্পর্দ্ধী ও পরিপূর্ণ বিকাশ পাওয়া যায় না। প্রতিভামাত্রই একদেশী।

আরো একটা কথা—এবং খুবই প্রণিধানযোগ্য কথা। প্রতিভা যে শুধু একদেশী তাই নয় প্রত্যেক প্রতিভাই সমাজ-সাপেক্ষ—যুগ-সাপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে, বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, যাঁরা জগৎ এবং জীবনের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করবেন তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য। প্রতিভাবানের **দুইটি মস্তিষ্কই** ("double intellect") থাক বা '**বৈষয়িক মস্তিষ্কই** ("objective intellect") থাক—প্রতিভাবান ব্যক্তি সমাজের দশজনেরই একজন এবং তাঁর জ্ঞান-প্রেম-এষণা বিশেষসমাজের—বিশেষ যুগেরই জ্ঞান-প্রেম-এষণার সঙ্গে সম্পর্কিত।

শোপেনহাওয়ারের উক্তি—"A genius has a double intellect, one for himself and the service of his will, the other for the world of which he becomes the mirror in virtue of his purely objective attitude towards it"—বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়:—প্রতিভাবানের একটি মস্তিষ্ক নিযুক্ত থাকে স্বার্থরক্ষার কাজে আর একটি মস্তিষ্ক নিযুক্ত হয় বিশুদ্ধ বৈষয়িক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বকে জানার কাজে—বিশ্বরূপকে প্রতিফলিত করার কাজে। প্রতিভাবান যেন একখানি বিশ্বদর্পণ—বিশ্বের রূপ-ভাব-কর্মকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার সামর্থ্য শুধু তাঁরই আছে। তাঁর দৃষ্টি বিশুদ্ধ বৈষয়িক দৃষ্টি (objective attitude)।

বিশ্বের রূপ-ভাব-কর্মকে প্রতিভার বিষয় ব'লে স্বীকার করলে, এই কথাই পরোক্ষতঃ স্বীকার করা হয়—বিষয় নিরপেক্ষ হ'য়ে প্রতিভার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। বিষয়হীন প্রতিভা, তন্তুহীন বয়ন-

ব্যাপারের মতোই, দেহহীন আত্মার মতোই, অসংকল্প। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় 'রূপ-ভাব-কর্ম' অলৌকিক পদার্থ বা শূন্যোদ্যানের পুষ্প নয়। রূপ আশ্রয় করেই ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে, ভাবাবেগ থেকেই আসে কর্মের প্রেরণা এবং রূপ-ভাব-কর্মের রূপেই জগৎ-জীবনের লীলা প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে, রূপ-ভাব-কর্মমাত্রই বিশেষ-সমাজের-আধারে-প্রকাশিত রূপ-ভাব ও কর্ম। সুতরাং প্রতিভাবান, তিনি যত বড় প্রতিভার অধিকারীই হোন না কেন,—বিষয়কে বাদ দিয়ে অর্থাৎ রূপ-ভাব-কর্মের প্রত্যয়ের (impression) ধার না ধেরে এক পাও এগুতে পারেন না—এক কথায়, কিছুতেই সমাজনিরপেক্ষ হ'তে পারেন না। এই প্রসঙ্গে সোপেনহাওয়ারের রসিক মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে—"By itself genius can produce original thoughts just as little as a woman by herself can bear children Outward circumstances must come to fructify genius, and be, as it were a father to its progeny অর্থাৎ প্রতিভা নিজে নিজে শুধু আপন শক্তিতে কিছুই করতে পারে না, যেমন কোনো নারী নিজে নিজে গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন করতে পারে না। বাহ্যপরিবেশের আনুকূল্য অবশ্যই চাই। বাহ্যপরিবেশের আশ্রয়েই প্রতিভা ফলবতী হয়। সেই দিক দিয়ে পরিবেশকেই প্রতিভা-সন্তানের জনক বলা সমীচীন। যাহো'ক প্রতিভার পক্ষে পরিবেশ-নিরপেক্ষ হওয়া যে সম্ভব নয়, একথা এখানে স্পষ্টভাষায়ই বলা হয়েছে।

বাস্তবিক একটু তলিয়ে দেখলেই, কেন বিষয়-নিরপেক্ষ তথা সমাজ-নিরপেক্ষ ও যুগনিরপেক্ষ সৃষ্টি সম্ভব নয়, তা' পরিষ্কার বুঝা যাবে। মানুষ নিজে যেমন নিজের কাঁধে চড়তে পারে না বৃত্তিগুলিও, তেমনি, নিজে নিজেই চরিতার্থ হ'তে পারে না। 'চরিতার্থ' হ'তে গেলেই "অর্থ" অর্থাৎ বিষয় চাইই চাই। প্রথমে, জ্ঞানের কথা ধরা যাক। যে জ্ঞান কোন-

কিছুর জ্ঞান নয় সে জ্ঞানকে অজ্ঞানেরই নামান্তর বলা যেতে পারে। বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ না ঘটলে জ্ঞান সম্ভব নয়। শুধু সন্নিকর্ষ ঘটাই যথেষ্ট নয়। বিষয়ীর চেতনায় বিষয়াকারা প্রতীতি এবং প্রতীতির স্বীকৃতি থাকা চাই। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই যে বিষয়সাপেক্ষ এ কথা বেশী ক'রে বলার দরকার নেই। তেমনি ভাবাবেগও (feeling) কোন-কিছু আশ্রয় ক'রেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। যিনি অকাম তাঁর মধ্যে আবেগ বা ক্রিয়া কিছুই নেই। তারপর বাসনামাত্রই বিষয়েরই বাসনা—পুরুষার্থেরই কামনা। কর্ম কামনাপূরণের সাধনা! অতএব জ্ঞানৈষণাই হোক, ভাবৈষণাই হোক আর কর্মৈষণাই হোক এষণামাত্রই বিষয়াভিমুখী। আর বিষয় পরিবেশ-গত এবং সমাজসাপেক্ষ ব'লে এবং প্রতিভার পক্ষে বিষয়নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয় ব'লে—সমাজ-নিরপেক্ষ, যুগ-নিরপেক্ষ হওয়াও সম্ভব নয়।

সামাজিক ব্যক্তির ভাবনার, কল্পনার এবং বাসনার প্রকৃতি নিয়ে আর একটু আলোচনা করলে, বক্তব্য আরো খানিকটা স্পষ্ট হবে ব'লে আশা করা যেতে পারে। এ কথা সত্য বটে যে উন্নত পর্য্যায়ের জীব মনোজীবকপ্রাণী বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বা জিজ্ঞাসা, বৃত্তিহিসাবে, খুবই পুরাতন, তেমনি পুরাতন কল্পনাবৃত্তি এবং কর্ম-প্রবৃত্তি। সহজাত জৈবিক সংস্কারগুলোকে—ইংরেজীতে যাদের 'instincts' বা "psycho-physical dispositions" বলা হয়েছে—মোটামুটি চিরন্তন (relatively constant) বললে আপত্তি করার কিছু নেই; কিন্তু জিজ্ঞাসা চিরন্তন প্রবৃত্তি বলেই জ্ঞান যে আদিকাল থেকেই একরূপেই আছে তা নয়। যে-কোন সমাজের আদিম স্তরের এবং বর্ত্তমান স্তরের জ্ঞানের তুলনা করলেই পার্থক্য ধরা যাবে। পার্থক্য যে আছে সেটা খুবই স্পষ্ট এবং তা' আছে এই কারণেই যে জ্ঞানজগৎও অন্যান্য জগতের মতো বিবর্ত্তনশীল। আদিমসমাজের জ্ঞান, সমাজবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত্তিত

হ'তে হ'তে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে অভিযোজন-প্রচেষ্টার ফলে জীবজগতে বিবর্ত্তন ঘটে এসেছে, মানুষের পর্য্যায়ে এসে তা থেমে থাকেনি। সেখানেও অভিযোজন-প্রচেষ্টা মুখ্য প্রবৃত্তি। অভিযোজন করতে গিয়েই মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করতে হ'য়েছে। যে পরিমাণে সে পরিবেশকে—(প্রাকৃতিক, জৈবিক এবং মানবিক পরিবেশকে) জানতে বুঝতে পেরেছে ততই তার জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিযোজন-প্রচেষ্টা থেকেই তার দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-কর্ম সমস্ত কিছু জন্মগ্রহণ করেছে এবং ঐ প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের বা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব সংস্কৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটছে। সমস্ত পরিবেশকে সে যত গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে জানতে পেরেছে তত তার জ্ঞান বেড়েছে—জগৎ-জীবনকে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছে, তদনুসারে বিধি-নিষেধ আচার-আচরণ ঠিক করেছে।

সুতরাং, জ্ঞান, সামাজিক মানুষের অভিযোজন-প্রয়াসেরই ফলবিশেষ এবং সেই হিসাবে, বিশেষ সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে জ্ঞানের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হ'য়ে আছে। সমাজের আদিম অবস্থায় যে জ্ঞানের জন্ম হ'য়েছিল পরবর্ত্তীকালে নানাব্যক্তির অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা সংস্কৃত পুষ্ট, এবং পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে এগিয়ে এসে বর্ত্তমানকালের বিশাল আকার ধারণ করেছে। এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অন্যযুগ উত্তরাধিকার-সূত্রেই লাভ করেছে। কোন সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে করে আরো আবেগভরে আঁকড়ে ধরেছে; কোনটিকে বা অযথার্থ মনে করে বর্জ্জন করতে এবং তার স্থলে অন্য সিদ্ধান্তকে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছে এবং তদনুযায়ী আচার-বিচার বিধি-বিধানকে নোতুন করে ঢেলে সেজেছে। এইভাবেই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং নূতন জ্ঞান এসে আবেগ ও কর্মের গতিবিধির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায়—ব্যক্তির

ভাবনা—যত বৈজ্ঞানিক, যত দার্শনিকই সে ভাবনা হো'ক—সমাজ-সাপেক্ষ, বিশেষতঃ যুগ-সাপেক্ষ না হ'য়ে পারে না। ব্যক্তি যেখানে সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করে, সেখানে সে সমাজের ভাবনার সবটাই মেনে নেয়; যেখানে সে নোতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে কিছুটা বর্জ্জন করে, সেখানে সে অতীত ভাবনাকে আংশিকভাবে মেনে নেয়; আর যেখানে সে অভিযোজন-লব্ধ নোতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে অতীত ভাবনার মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং যুক্তির দুর্ব্বলতা দেখে বর্জন করে, নোতুন সিদ্ধান্ত স্থাপনা করে, সেখানেও সে জ্ঞানাকাশের শূন্যস্থানকেই পূর্ণ করতে চেষ্টা করে অর্থাৎ সমাজেরই অভাব পূরণ করে। সেখানেও মস্তিষ্ক নিরপেক্ষ নয়। মোট কথা অতীতের সঙ্গে বুঝাপড়া করেই নোতুনের আবির্ভাব ঘটে।

বলা বাহুল্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-শিল্পীরা মায়ের পেট থেকে পড়েই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-শিল্পী হ'য়ে উঠেন না বা আকাশ-থেকেও পড়েন না। মানবশিশু হ'য়ে, বিশেষ মায়ের কোলে, বিশেষ পরিবারে, বিশেষ সমাজের কোলেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে, বস্তুর প্রতীতি তার ভিতরে প্রবেশ করে এবং—'টেবুলা রসা' অর্থাৎ ধোয়ামোছা শ্লেটের মতো চেতনায় বস্তুজ্ঞানের সঞ্চয় ও সংযোগ ঘটতে থাকে। এই ভাবেই ব্যক্তি-চেতনার বনিয়াদ গড়ে উঠতে থাকে। সমাজের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থার মধ্যেই তো ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা যথারীতি আরম্ভ হয়। সেই শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ যে যত বেশী পায়, তাকে আত্মসাৎ করতে, সমীকরণ করতে যে যত বেশী পারে, নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করার শক্তি যার যত বেশী, পুরাণো জ্ঞানকে নোতুন অভিজ্ঞতা দ্বারা যাচাই করবার ক্ষমতা যার যত বেশী, তার পক্ষে জ্ঞানলাভেরও সম্ভাবনা তত বেশী হয়। তারপর, সমাজের পুরুষার্থ-সাধনা এবং কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারেই অন্যান্য সামাজিক

ব্যক্তির মতোই তাঁদের কর্মপ্রবৃত্তি পথ খুঁজে নেয়। তাঁদের ধর্মাধর্ম বোধ স্থায়-অন্যায়-বোধ, পরমপুরুষার্থ-চেতনা—সমস্ত কিছুই সমাজ-জীবনের গতি-প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির নোতুন চিন্তাই হোক বা নোতুন আবিষ্কারই হোক অথবা নোতুন উপলব্ধিই হোক—সবই পুরাতন-সাপেক্ষ অর্থাৎ কোনকিছুই নিরপেক্ষ বলতে যা বুঝায়-তা' নয়।

কল্পনার কথাই ধরা যাক। জ্ঞান বিষয়নিরপেক্ষ হ'তে পারে না—এ সিদ্ধান্ত যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি বিনা 'প্রতীতিতে (impressions) কল্পনা-ক্রিয়া সম্ভব নয়—এ কথাটাও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দু'একটি যুক্তি দিলেই কথাটা স্পষ্ট বুঝা যাবে। প্রতীতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর তদাকারা স্মৃতি, এককথায় বিষয়ের স্মৃতি। অতএব বস্তুনিরপেক্ষ প্রতীতি সম্ভব নয় প্রতীতি অভাবে কল্পনা সম্ভব নয় ব'লে বস্তু-নিরপেক্ষ কল্পনাও সম্ভব নয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে কুণ্ঠা আসতে পারে এই কারণেই যে—কল্পনা বলতে আমরা বুঝি সেই শক্তিকে যা অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করতে পারে। কল্পনা যদি অপূর্ব বস্তুই গড়ে, তবে তাকে বস্তুসাপেক্ষ বলা কেন?—এ প্রশ্ন না জেগে পারে না। সুতরাং এই রহস্যকে জানতে হ'লে কল্পনায়-গড়া বস্তুর স্বরূপ নিয়ে অবশ্যই একটু আলোচনা করা দরকার।

নব নব উন্মেষের ক্ষমতা ব'লতে আমরা বুঝি কল্পনার সেই ক্ষমতা যা'র বলে মানুষ এমন বিষয় সৃষ্টি করতে পারে যার অনুরূপ বস্তু লৌকিক জগতে দেখা যায় না। এই ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে আমরা নোতুন দেশ-কাল-পাত্রাদি সৃষ্টির ক্ষমতা ব'লতে পারি,—বিশেষতঃ বলতে পারি—দেশ-কাল-পাত্রের সংস্কারকে, এককথায় অভিজ্ঞতাকে নোতুন নোতুন ভাবে সাজানোর শক্তি—বিষয়কে একস্থান থেকে স্থানান্তরে, এককাল থেকে কালান্তরে, এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে ছোটকে বড়করে', বড়কে ছোট করে', একের রূপে অন্তরূপ, যোজনা

করার ক্ষমতা। মনের এই শক্তিরই নাম কল্পনা। এরই বিশেষ রূপ—প্রতিভা বা নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি। এই কল্পনা-শক্তি স্মৃতি-সাপেক্ষ ব্যাপার বটে, কিন্তু নিছক স্মৃতির ব্যাপার নয়। স্মৃতি যেখানে প্রতীতের পুনরুদ্বোধমাত্র, কল্পনা সেখানে প্রতীতের সংযোগ-বিয়োগে, সংশ্লেষ-বিশ্লেষে অপূর্ব বস্তুর রচনা। কল্পনার মধ্যে নোতুনের উন্মেষ ঘটে—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু এই উন্মেষণ যে প্রতীতি-নিরপেক্ষ বা বাসনা-নিরপেক্ষ কোন ব্যাপার নয়, সেই কথাটাই মনে রাখা দরকার।

সত্য বটে এই শক্তিবলে মানুষ এমন অনেক কিছু রচনা করেছে যার কোন লৌকিক বা বাস্তব সত্তা পাওয়া যায় না। মানুষের রূপকথার রাজ্য, দেবদেবীর রূপ, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত অপূর্ব বস্তু নির্মাণে এই শক্তির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে অবশ্যই মনে হতে পারে—সে লৌকিকপ্রতীতি-নিরপেক্ষভাবেই বস্তু নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু ঐ সকল অপূর্ব বস্তু—রূপকথা, দেবদেবী, স্বর্গ-নরক প্রভৃতির উপাদান ও গঠন বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে—উৎকাল্পনিক (fanciful) সৃষ্টিগুলি পর্য্যন্ত, মানুষের অভিজ্ঞতার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে নি। বাস্তবরূপ, বস্তুতত্ত্ব, অনুমান বিশ্বাস প্রভৃতি মিলেমিশে, বাসনার আবেগে অতি-রঞ্জিত—পরিবর্ধিত হয়েই উৎকাল্পনিক রূপ পেয়ে থাকে। তেপান্তরের মাঠ, সাধারণ কোন মাঠেরই অতিশয় রূপ, পাতালপুরী মর্ত্ত্যের পুরীরই নোতুন এক সংস্করণ মাত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়া, রাক্ষস-খোক্কস—লৌকিক অভিজ্ঞতারই অতিরঞ্জিত সঙ্কলিত রূপ। তেমনি স্বর্গ-নরক ও লৌকিক অভিজ্ঞতার আতিশয্য দিয়ে গঠিত। বৈকুণ্ঠই হোক, যমালয়ই হোক বা নন্দনকাননই হোক—লৌকিক অভিজ্ঞতারই বাসনা—সঙ্কলিত সৃষ্টি! Mythology and Folklore প্রবন্ধে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ বোয়াস (Franz Boas), পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—পৌরাণিক কাহিনীর ক্রমবিকাশ সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে

২

ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত হয়ে আছে ; লৌকিক অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই অলৌকিককল্প কাহিনীগুলি গঠিত হয়েছে। কল্পনার স্বরূপ নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা যত আলোচনা করেছেন,তা থেকেও, ভিন্ন কোন কথা পাওয়া যায় না। কল্পনা উডওয়ার্থ মহাশয়ের ভাষায়—"Mental manipulation" একেই Jung বলেছেন—"Mobility of the libido"—"rTansforence of libido". Henry Stephen—Analytical psychology গ্রন্থে "Constructive imagination" সম্বন্ধে লিখেছেন—"Constructive imagination.........consists in recombining and reconstructing these materials into images or representations of things and events which have never entered into our own experience at all."

এই কল্পনা ইন্দ্রিয়াহৃত উপাদানের পুনর্গঠন এবং পুনর্মিশ্রণের দ্বারা মূর্তিরচনা অথবা এমন বস্তুর বা ঘটনার উপস্থাপনা যা আমাদের অভিজ্ঞতায় কোনকালেই প্রবেশ করেনি। শেষোক্ত অপূর্ব বস্তু নির্মাণের ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে অহেতুক মনে হ'তে পারে বটে, কিন্তু আসলে তা' নয়। সেখানেও বাসনার ক্রিয়া র'য়েছে। ষ্টিফেন লিখেছেন—"In the first place we must have some general notion beforehand of the kind of image which we want and the purpose for which we want it" অর্থাৎ প্রত্যেক কল্পনার মূলেই বাসনা বা উদ্দেশ্য আছে—নিরুদ্দেশ কল্পনা নেই। অপূর্ব বস্তু নির্মাণ আসলে বিশেষ উদ্দেশ্যে "mental manipulation"।

অপূর্ব বস্তু নির্মাণের মধ্যে যে রহস্য আছে—মনঃসমীক্ষণশাস্ত্রের আলোকপাত করলে সে রহস্যের অবসান হবে। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ প্রমুখ মনঃসমীক্ষকগণ এই রহস্যের দুর্গম প্রদেশে অভিযান চালিয়ে পথ ক'রে দিয়ে গেছেন। ফ্রয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যা (Interpretation of Dreams)

প'ড়লেই বুঝা যেতে পারে—কিভাবে বাসনার আবেগে নানা প্রতীতি মিলেমিশে, কিম্ভুতকিমাকার রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। স্বপ্নে মনের মধ্যে যে নাটকরচনার প্রক্রিয়া কাজ করে—তাকে বলা হয়েছে dramatisation। কল্পনাতেও অনুরূপ প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে। নির্জ্ঞান মন এবং আসংজ্ঞান মন—দুই মন মিলে, বাসনার পরিপূরণের জন্য প্রতীক সৃষ্টি করে থাকে। সেই প্রতীক অপূর্ব বটে কিন্তু অহেতুক নয় বা প্রতীতিনিরপেক্ষও নয়। কল্পনাকে ইয়ুঙ বলেছেন—"Transformation of the libido through the symbol"। অবশ্য এই "symbols are never thought out consciously they are always produced from the unconscious in the way of so called revelation or intuition"। অর্থাৎ কল্পনা বাসনারই বিশেষ আকার। তবে ঠিক সংজ্ঞান মনের সৃষ্টি নয়। নির্জ্ঞান মন থেকেই কল্পনা মনে উদ্ভাসিত হয়। যাই হোক, কল্পনা যে মনেরই সৃষ্টি হো'ক, প্রতীতি-নিরপেক্ষ হওয়া—বাসনা নিরপেক্ষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এবার বাসনার কথা—এষণার কথা ধরা যাক। এষণা ব'লতে বুঝায়—ব্যক্তির বিভিন্নমুখী কর্মপ্রবৃত্তি, এককথায়—ব্যক্তির আচরণ (Behaviour)। ব্যক্তি মাত্রেই তো সামাজিক ব্যক্তি। অর্থাৎ সমগ্র সমাজের অভিযোজন প্রচেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই কারণেই সামাজিক ব্যক্তির কর্মপ্রবৃত্তি শেষপর্য্যন্ত সমাজের অবস্থার ও ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কথাটাই বিশেষভাবে বুঝা দরকার॥ বুঝা দরকার—অভিযোজন প্রচেষ্টা যত ব্যাপক ও সার্থক হ'য়েছে, সমাজের কর্মবিভাগ তত বিচিত্র হ'য়েছে এবং কর্মপ্রবৃত্তি তত শাখায়িত-উপশাখায়িত হ'য়েছে। আহরণ-যুগের সমাজের কোন ব্যক্তির এষণা, সেই সমাজের কয়েকটি এষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আহার-সংগ্রহ ও প্রজননের বাইরে এবং তদানুষঙ্গিক প্রয়োজনের বাইরে যে

সমাজের পুরুষার্থের সীমা প্রসারিত হ'য়ে যায়নি, সে সমাজের ব্যক্তির এষণাও সেই প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। মোটকথা সমাজ, গুণ—কর্মবিভাগের ফলে, যত শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে, ব্যক্তির কর্ম-প্রবৃত্তিও ততো বিভিন্ন হ'য়েছে। সমাজের বিবর্তন ঘটেছে বলেই কর্মবিভাগ এবং শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়েছে—তথা বৃত্তিবিভাগ দেখা দিয়েছে। এই বৃত্তি-বিভাগ বা শ্রম-ব্যবস্থাই ব্যক্তির এষণাকে নিয়ন্ত্রিত করে চ'লেছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে সমাজের দৈব-চেতনা পরিস্ফুট আকার লাভ করেনি, সে সমাজে পুরোহিত-শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেনি এবং পুরোহিত হওয়ার জন্য কারো প্রবৃত্তিও দেখা দেয়নি। যখনই দৈব-চেতনা দেব-দেবী ধারণায় আত্মপ্রকাশ করেছে—তাদের তুষ্টপুষ্ট করার জন্য পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে তখনই; অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা আকস্মিক কোন খাপছাড়া ঘটনা নয়। শ্রম-বিভাগ এবং সেই শ্রমের সামাজিক উপযোগিতা না থাকলে কোন শ্রেণীরই উদ্ভব সম্ভব নয়। সমাজের অভিযোজন-প্রচেষ্টার মধ্যেই শ্রম-বিভাগের কারণ নিহিত থাকে। সুতরাং অভিযোজন-প্রচেষ্টার পর্য্যায়, প্রচেষ্টার মাঝ দিয়ে প্রকৃতি-পরিচয় বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপ, তদনুযায়ী ধারণা, দেবতাকল্পনা জীবনযাপনে দেবতার অনুগ্রহ-নিগ্রহের গুরুত্ব—এই সব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখলেই দেখা যাবে—সমাজের বিশেষ অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর উৎপত্তির ও স্থিতির ইতিহাস কার্য্য-করণযোগে যুক্ত হয়ে আছে। সমাজের প্রয়োজনেই শ্রম-বিভাগ এবং বৃত্তি-বিভাগ। এ কথাটা মনে রাখলেই বৃত্তি-বিভাগের ফলে ব্যক্তির এষণা কি করে নানামুখী হ'য়ে উঠে তার ব্যাখ্যা সহজেই পাওয়া যাবে। আর্য্য সমাজের 'চাতুর্বর্ণ্য'সৃষ্টি—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-বর্ণবিভাগ যে গুণকর্মের বিভাগের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল এ কথাতো স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে। শ্রীকৃষ্ণই করুন আর যিনিই সেই বিভাগ করুন, কর্ম-

বিভাগের প্রয়োজনেই চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হ'য়েছিল। মনে রাখা দরকার—সব সমাজেরই শ্রেণী-বিভাগের নিয়ামক "কর্ম"। গুণ কর্মেরই শক্তি বা 'যোগ'। যোগ কর্মের কৌশল আর কর্মমাত্রই সমাজেরই অভিযোজন-প্রচেষ্টার কোনো একটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

এখন, কর্মবিভাগকে, সমাজের অভিযোজন-ব্যবস্থার ফল বলে মনে করলে—মনে না করে উপায় নেই—এ কথাও মেনে নিতে হয় যে সমাজের বিবর্তন যত ঘটে তত সমাজের কর্ম বিভিন্নমুখী হয়, ফলে কর্মবিভাগের রূপে পরিবর্তন ঘটে এবং সামাজিক ব্যক্তির এষণা শ্রেণী-বিভাগ-অনুসারে বিশেষ বিশেষ খাত ধরে প্রবাহিত হয়। আহরণ-যুগের কোন সমাজের কর্ম-বিভাগের রূপ এবং অতি-আধুনিক যুগের কোন সমাজের কর্ম-বিভাগের রূপ পাশাপাশি রেখে পর্য্যবেক্ষণ করলেই এবং শ্রমবিভাগের তথা শ্রেণী-বিভাগের বিবর্তনের রূপটি প্রত্যক্ষ করতে পারলেই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করতে কষ্ট হবে না। দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। তবু আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—কবিশ্রেণীর কথাই ধরা যাক। সমাজে এমন অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয় যখন—'কবি' বলে কোন বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেনি। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজে কাব্যের উপযোগিতা দেখা দেওয়ার ফলেই কবিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। মোটকথা, কবিকর্মের সামাজিক মূল্য (মানের মূল্য, ধনের মূল্য) স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কবিবৃত্তি অবলম্বন করতে কেউ চায়নি—অর্থাৎ কোনো লোকের এষণা শুধু কবি-কর্মেরই খাতে প্রবাহিত হয়নি। মূলসূত্র প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে—সমাজে শিল্পের চাহিদা আছে বলেই শিল্পীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। সত্যিই তো, যে সমাজে শিল্পের চাহিদা কম সেখানে শিল্পীর প্রতিষ্ঠাও কম, যেখানে চাহিদা বেশী, সেখানে শিল্পীর প্রতিষ্ঠাও বেশী।

এ হোল সামাজিক ব্যক্তির বৃত্তি-গত বা শ্রেণী-গত সাধারণ এষণার কথা। কিন্তু এষণা তো সর্বমূলাধার। জ্ঞান-প্রেম-কর্ম সবকিছুর মাঝ দিয়েই তো তার অভিব্যক্তি। প্রকাশক্ষমতা থাকায় ব্যক্তি শিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ করতে প্রবণায়িত হতে পারেন অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এখানেই তার সমাজ-সাপেক্ষতার শেষ নয়। প্রকাশবৃত্তি বা প্রকাশশক্তি, বৃত্তি বা শক্তি হিসাবে সাধারণ হলেও কার্য্যত বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বিশেষ রীতি নির্দ্ধারণে বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতার মাঝেই শিল্পীর নিগূঢ় এষণার—শ্রেয়-প্রেয় কামনার রূপ নিহিত থাকে। যে রসদৃষ্টিতে শিল্পী-জীবনের রূপ দেখেন, যে ভাবাদর্শ তিনি প্রচার করতে চেষ্টা করেন, সেই রস-দৃষ্টি ও ভাবের মাঝ দিয়ে শিল্পীর জীবন-বোধ প্রকাশ পেয়ে থাকে। আত্মরক্ষার তাগিদেই করুন, বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনাতেই করুন অথবা সমাজের হিতকামনা থেকেই করুন, শিল্পীকে প্রকাশের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতেই হয় এবং সেই বিষয়ের রসরূপটিও কল্পনা করতে হয়। এই বিষয়বস্তু-নির্বাচন ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—শিল্পী সমাজের আগের শৈল্পিক উৎপাদনের দিকে না চেয়ে কোন বস্তু নির্বাচন করেন না, আর করলেও নোতুন জীবনোপলব্ধির মাধ্যম করবার জন্যেই করেন। যার চাহিদা নেই, তা' তৈরী করতে কেউই চেষ্টা করেন না। তারপর রীতির কথা ধরা যাক। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—কবিরা যে মাটিতে বা উপাদানে জীবনের প্রতিমা গড়েন তা' সমাজের বুকেই জমে উঠে। ভাষা বা ছন্দ অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মতোই, সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি। সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তারাও পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে চলে।

একযুগের ধারণা-প্রেরণা এবং বাস্তব সংস্কৃতি যেমন অন্যযুগ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, ব্যবহার দ্বারা বাড়িয়ে তোলে, তেমনি প্রকাশের

রীতিও—(ভাষা+ছন্দ+রীতি) একযুগ অন্যযুগের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বৈদিক সংস্কৃতে বা লৌকিক সংস্কৃতে, প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে লেখেননি কেন, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র ভাষায় অথবা চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতির বা রামাই পণ্ডিতের ভাষায় লেখেননি কেন—তা' ভেবে দে'খলেই, প্রকাশ-রীতিও যে যে কি পরিমাণে সমাজ-সাপেক্ষ সে কথা উপলব্ধি করা যাবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে না হ'লেও—একথা সত্য—প্রকাশের "বিষয়বস্তু" এবং প্রকাশ-রীতি সমাজের অবস্থা এবং চাহিদা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রকাশের বিষয়কে যদি আমরা "দিব্য সৌন্দর্য্য" বা কোন নৈর্ব্যক্তিক "সত্য-শিব-সুন্দর"-এর রহস্য ব'লে মনে না করি, তা'হ'লে নিশ্চয়ই—টলষ্টয়ের সাথে একমত হ'য়ে ব'লব—"art is one of the means of intercourse between man and man"—সামাজিক মানুষেরই আবেগানুভূতির প্রকাশ এবং প্রকাশের বিষয়বস্তু—সামাজিক মানুষেরই জীবনযাপন-থেকে—উদ্ভূত সত্য-শিব-সুন্দর বোধের অর্থাৎ জীবনেরই বিচিত্র উপলব্ধি। সত্য-শিব-সুন্দর বোধ জীবনযাপন থেকে উত্থিত বলে'—সমাজবাসনারই বিশেষ রূপ। অতএব শৈল্পিক এষণাও, সত্য-শিব-সুন্দর-অভিলাষী বলে' সমাজ-বাসনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত। একথা স্বীকার করার তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু সমাজের এষণার প্রকৃতি সমাজের বিশেষ পর্য্যায়ের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত থাকে সেইহেতু, এষণার পরিচয় পেতে হ'লে সমাজের রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার হিসাব অবশ্যই করতে হবে। কারণ বিবর্ত্তনের ফলে সমাজ যে পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ না করা পর্য্যন্ত, নোতুন সৃষ্টির গতি-প্রকৃতির, প্রেরণা-প্রবণতার বা রূপ-রসের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। শিল্পীকে "Race, milieu এবং moment"-এর পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে না দেখা

পর্য্যন্ত, শিল্পরচনার দেহ বা আত্মা কোনটিরই সম্যক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

এষণার সমাজ-সাপেক্ষতা, অন্যদিক দিয়েও লক্ষ্য করা যেতে পারে। একথা সত্য বটে যে শিল্প প্রকাশবৃত্তির সৃষ্টি, অর্থনীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞার অনুকরণে বলা যাক—"study of man in the aesthetic business of life"—সামাজিক মানুষের রসিক-সত্তার ব্যাপার,—কিন্তু একথাও তো মিথ্যা নয় যে প্রকাশবৃত্তি জীবনের মৌলিকবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হ'য়েই আছে; মৌলিকবৃত্তিরই প্রয়োজনে, মৌলিকবৃত্তির সহায়ক রূপেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে। এইদিক থেকে দেখলে—প্রকাশবৃত্তি সামাজিক অভি-যোজন-প্রচেষ্টার গণ্ডীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ প্রকাশশক্তিকে মানুষ অভিযোজনের আত্মপ্রতিষ্ঠাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। শিল্প-সৃষ্টিকে এক হিসাবে ব্যক্তির অধিমানসিক বা আনুভবিক অভিযোজন যেমন বলা যেতে পারে, তেমনি অন্য হিসাবে স্থূল অভিযোজনের উপায় হিসাবেও দেখা যেতে পারে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করে' বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলন করতে যাওয়া মনোবিজ্ঞানসম্মত কিনা সে আলোচনা স্থগিত রেখে, এখানে বলা যেতে পারে—সামাজিক মানুষের কর্মমাত্রই তার অভিযোজন-প্রয়াসের—ব্যক্তিগত বা সমাজগত আত্মরক্ষার বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার—অন্তর্ভুক্ত।

শিল্পরচনার মধ্যে অভিযোজনের চেষ্টা নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কারণ রচনার প্রেরণা প্রায় ক্ষেত্রেই যৌগিক। অর্থোপার্জনের জন্য যেখানে শিল্প সৃষ্টি করা হয় বা কবিখ্যাতিলাভ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করার জন্য যেখানে শিল্প তৈরী করা হয়, সেখানেও অভিযোজনের চেষ্টা সহজেই চোখে পড়ে থাকে। আবার যেখানে সমাজের হিত-কামনার প্রেরণায়, অমঙ্গলের বিনাশ এবং মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা, বা সমাজের অভাব-অভিযোগ দূর করবার স্পষ্ট উদ্দেশ্যে শিল্পের সৃষ্টি হয়, সেখানেও

অভিযোজন-প্রচেষ্টা সংলক্ষ্য। কিন্তু যেখানে এমনি কোনো উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না, সেই সব আত্ম-প্রকাশী (সাবজেক্‌টিভ) রচনার ক্ষেত্রে অভিযোজনের রূপটা খুঁজে বের করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। শিল্পীর বাসনা বা এষণা সেখানে প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন, ব্যক্তিগত কোন দার্শনিক-অনুভূতিকে কবি যেখানে রূপ-রসে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য ছাড়া তার কোন উদ্দেশ্যই ধরা পড়ে না। কিন্তু সেখানেও, যেহেতু কবি কোন বিশেষ মতবাদকে খণ্ডন করতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন কবির আধিমানসিক অভিযোজনের (intellectual adaptation) চেষ্টাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। জীবন-সমালোচনা তত্ত্বরূপেই প্রকাশ পাক বা রসরূপেই প্রকাশ পাক, সমালোচনামাত্রই মানসিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ শিল্পী তাঁর কাম্য জীবনদর্শনকেই—পরাদর্শন, রাজনীতিদর্শন, অর্থনীতি-দর্শন, নীতিদর্শন, সমাজদর্শনকে—চিন্তা বা অনুভবের মাধ্যমে সঞ্চার করে দিতে চান তথা সামাজিক চিত্তে পরিবর্তন ঘটাতে অথবা সেই সেই উপলব্ধির গভীরতা বৃদ্ধি করে' সমাজের কাম্য গতি-পরিণতি ঘটাতে চেষ্টা করেন।

আসল কথা, যে রূপ-ভাব-ভাবনার মধু সংগ্রহ করে' শিল্পী রস-মধুচক্র গড়ে তোলেন—যে ভাবকে শিল্পী রূপের মাঝারে অঙ্গ দিতে চেষ্টা করেন, সেই ভাবের মাঝ দিয়ে—রূপকল্পনার বা রসাদর্শের মাঝ দিয়ে—শিল্পীর বিশেষ একটি মনোভঙ্গীই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই মনোভঙ্গীর মধ্যেই শিল্পীর নিগূঢ় বাসনার রূপটি গা ঢাকা দিয়ে থাকে। প্রেরণার ইতিহাস অনেকক্ষেত্রেই হারিয়ে যায় বলেই বা চাপা থাকে বলেই শিল্পীর এষণার সমগ্র রূপটি ধরা যায় না। ফলে, প্রয়োজন-মূলক সৃষ্টিকে নিষ্কাম রচনা বলে', অভিযোজনপ্রয়াসকে অহেতুক লীলা বলে' সমাজ-বাসনা-অনুপ্রেরিত রচনাকে অলৌকিক দিব্যপ্রেরণার

সৃষ্টি বলে' রহস্যময় করে তোলা হয়। ভুলে যাওয়া হয়—শিল্পী সমাজেরই দশজনের একজন—তাঁর মন সমাজ-মানসেরই একটা অংশ বা কোষ (Cell)। তাঁর মানসিক বা আত্মিক ক্রিয়া সমাজের সমষ্টিগত মানসিক ক্রিয়াপ্রবাহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।—ব্যক্তির মধ্যে যেটুকু "ব্যক্তিগত" তা' ব্যক্তির এবং সমাজের বা পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই গড়ে উঠে থাকে। সমাজ-নিরপেক্ষ, পরিবেশ-নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি নেই,—ব্যক্তিত্বও নেই। সৃষ্টির "প্রেরণা" সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থাকে ব'লেই এই ধরণের ভুলগুলি দেখা দেয়। এই কারণে "প্রেরণার" স্বরূপ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখা দরকার।

শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার কথা উঠলেই আমাদের কাণ্টের বহুপ্রচলিত সিদ্ধান্ত—হেগেলের মতে 'যা' "the first rational word concerning beauty"—সেই "উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য"—(Purposiveness without purpose) "নিষ্কাম আনন্দ" (disinterested pleasure) প্রভৃতি মন্তব্যগুলি এসে উপস্থিত হয়। শিল্পসৃষ্টির মূলে কোন প্রয়োজন-বোধ কাজ করে না। শুধু বস্তু-স্বরূপকে স্বমহিমায় দেখার আনন্দ থেকেই, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই, শিল্পের সৃষ্টি হয়—এই ধরণের সিদ্ধান্তের ফলেই বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

তারপর থেকে—প্রেরণা বা উদ্দেশ্যের কথা উঠলেই অনেকেই ঐ তথাকথিত অহেতুক সৃষ্টিলীলার—'নিরুদ্দেশ উদ্দেশ্যে'র কথাই বলে থাকেন। ফলে, শিল্পসৃষ্টির মূলে সৌন্দর্য্য বা আনন্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া যে আরো অনেক উদ্দেশ্য ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে এবং (প্রায়ই ক্ষেত্রেই থাকে) এ কথা তেমন পাত্তা পায়নি। নিরুদ্দেশ উদ্দেশ্যই (purposivenees without purpose) পরবর্ত্তীকালে কলা-কৈবল্যবাদের (art for art's sake) রূপ পরিগ্রহ করেছে

এবং কার্য্যতঃ না পারলেও, তত্ত্বতঃ শিল্পী ও শিল্পকে দেশকালাতীত নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় পরিণত করতে চেষ্টা করেছে। চৈতন্যধর্মসম্পন্ন মানুষের মধ্যে প্রকাশের শক্তি বা আবেগ আছে, শিল্প প্রকাশবৃত্তির ক্রিয়ার ফল —এ সব কথা অস্বীকার না করেও বলা যায়—প্রকাশ শক্তিকে মানুষ নানা উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে পারে; অর্থাৎ শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য উপাদানকে উপাদেয় রসরূপ দেওয়া বটে, কিন্তু রসরূপ সৃষ্টি করবার মূলে নিছক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ছাড়া আরো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমাদের সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা এবিষয়ে খুবই সূক্ষ্মগ্রাহী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন, কাব্য-সৃষ্টির মূলে মানুষের যশের কামনা, অর্থের কামনা, অমঙ্গলনাশের কামনা এবং সামাজিকের কাছে নোতুন কোন উপদেশ বা তত্ত্ব পরিবেষণ করার কামনা থাকতে পারে। তাঁরা দেখেছেন— এই সব কামনার সঙ্গে শিল্পীর প্রধান কর্ত্তব্যের—রসসৃষ্টির কোন বিরোধ নেই। শিল্পকে রসোত্তীর্ণ করে তোলা শিল্পীর প্রধান দায়িত্ব—এ খুবই সত্যি কথা, তাই বলে—শিল্পসৃষ্টির মূলে অন্য কামনা থাকতে পারে না বা থাকলে শিল্প নষ্ট হয়ে যায়—এ কথা সত্যি নয় এবং সত্যি নয় ব'লেই তাঁরা মানেননি। কার্য্যত যে প্রত্যেক শিল্পীই সকাম, শিল্পীদের রচনার ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করলেই তা' ধরা পড়বে। **হ্যারোল্ড ওস্‌বোর্ন**— 'এস্থেটিকস্ এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম্'-গ্রন্থে (১৯৫৫) এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা' উল্লিখিত বক্তব্যকেই সমর্থন ক'রে। লিখেছেন—" utility-object" হয়েও রচনা শিল্প হিসাবে বড় হ'তে পারে—"a great number of excellent works of art have been produced incidentally by artists who had other objects in mind—such as earning a living, arousing a sense of indignation at social inequalities, making people laugh, copying as exactly as possible a select piece of nature and so on."—(pag. 80)।

আমরা দেখি শিল্পতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন আলোচনা করেছেন তখন 'অহেতুক লীলা'বাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-সিসৃক্ষা বলেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ—'অহেতুক-লীলা'র স্তর থেকে নেমে এসেছেন—সৃষ্টির প্রেরণা যে প্রায়ক্ষেত্রেই যৌগিক বা মিশ্র এ কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। ১৩৩৩ সালের ১৪ বৈশাখ, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখেছেন, তা'তে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ রচনার তাগিদকে দুইভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন—এক অংশ ="বাহ্য", অন্য অংশ="আভ্যন্তরিক" রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্ছে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখতে সুরু করেছিলেম, কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে।" বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করছেন—রচনার মূলে বাহ্য তাগিদ থাকতে পারে। এই তাগিদকে আমরা সমাজের বা পরিবেশের চাহিদা বলতে পারি। এই বাহ্য তাগিদকে আবার দুই-ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে—এক ভাগে—পরিবেশের স্পষ্ট চাহিদা, অন্যভাগে—পরিবেশের পক্ষে বা বিরুদ্ধে শিল্পীর প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ শিল্পীর কাছে পরিবেশের না-বলা চাহিদা। প্রথম শ্রেণীর তাগিদে যা' লেখা হয় তাকে বলা যায় "ফরমাসে লেখা"। ফরমাসে লেখার মধ্যেও উপরিভাগ কল্পনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ২৫ বৈশাখের জন্য নাটক লেখার যে ফরফাস—নাটক লেখার যে অনুরোধ করা হ'য়েছে—তার সঙ্গে আর কোন সর্ত জুড়ে দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু ফরমাসের সঙ্গে নানা সর্তও জুড়ে দেওয়া যেতে পারে—অমুক বিষয় নিয়ে লিখবেন, অমুক রসের হওয়া চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্পীর হাত আরো বেঁধে দেওয়া হয়। যতই হাত বাঁধা হোক, বড় শিল্পীর

হাতে, রস-সার্থক শিল্প হয়ে উঠার পক্ষে, রচনার কোন বাধা নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর তাগিদের মধ্যে শিল্পীর সক্রিয় অভিযোজনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়ে থাকে। ফরমাসে লেখার মাঝ দিয়েও লেখক পরিবেশের পক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাতে না পারেন এমন নয়, কিন্তু সেখানে লেখক মোটামুটি অন্য—প্রেরিত। যেখানে লেখক নিজের থেকেই অমঙ্গলনাশ করার জন্য বা কাম্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য লিখতে প্রবৃত্ত হন, সেখানে লেখকের সংজ্ঞান অভিযোজনপ্রচেষ্টাই ব্যক্ত হয়। অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা প্রভৃতি নাটকের রচনা প্রেরণা অনুসন্ধান করলেই—,—দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহ্য প্রেরণার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এই তাগিদকে "আভ্যন্তরিক" ব'লে মনে হবে বলেই, রবীন্দ্রনাথ "আভ্যন্তরিক" তাগিদ ব'লতে কি বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নেওয়া যাক। শিল্পীর আভ্যন্তরিক তাগিদ কেবলমাত্র প্রকাশনের তাগিদ—বিষয়বস্তুকে সুন্দর রসরূপ দেওয়ার তাগিদ। অর্থাৎ শিল্পী যে বিষয়কে রূপ দিতে ইচ্ছুক, তার পরাকাষ্ঠা বা আদর্শ রূপ ফুটিয়ে তোলার তাগিদ। বিশুদ্ধ শৈল্পিক (aesthetic urge) তাগিদ ব'লতে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে এইটুকুরই মধ্যে আছে। কিন্তু এছাড়া আর যত তাগিদ রচনার মূলে কারণ হিসাবে থাকে তাদের 'বাহ্য' প্রেরণাই বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহ্য প্রেরণাতে, যেখানে স্পষ্ট কোন চাহিদা দেখা যায় না, শিল্পী স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েই সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে নিজের অনুভবকে প্রকাশ করে থাকেন তথা সমাজেরই কোন-না-কোন চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। 'অচলায়তন' রচনার প্রেরণা বিশ্লেষণ করলেই বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আশা করা যায়। অচলায়তন-সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সমালোচক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পত্র লেখেন, সেই পত্রখানি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ কিসের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ

'অচলায়তন' লিখতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। পত্রখানির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা যাক :—"আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম—আমি শীতল ভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোন চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা..........নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর।......এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে, ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না? কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব?......কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ......অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে...আমি প্রাণের ব্যাকুলতার শিকল নাড়া দিয়াছি......শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতে হইবে—যে নিজে অনুভব করিতেছে সে অনুভব না করাইয়া বাঁচিবে কী করিয়া? ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না..."। এবার বোধহয় বুঝতে কষ্ট হবে না—সমাজের না-বলা চাহিদা বলতে কি বুঝাতে চেয়েছি এবং অচলায়তন কিভাবে সামাজিক চাহিদার প্রেরণাতেই লেখা হ'য়েছে। এইভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে "রক্তকরবী"তেই রবীন্দ্রনাথ সমাজের রাজনৈতিক—আর্থনৈতিক-আধ্যাত্মিক বিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার উদ্যম ক'রছেন—মুক্তধারা নাটকেও তিনি সমাজব্যবস্থার ও জীবনদর্শনের সমালোচনা করবার চেষ্টা করেছেন এবং যে সমস্ত নাটকে দার্শনিক তত্ত্বকে রূপকাকারে রূপ দিয়েছেন সেখানেও সমাজের দার্শনিক-সম্প্রদায়েরই কোন-না-কোন দলকে

সমর্থন করতে চেষ্টা করেছেন। তথা সামাজিক চাহিদাই পূরণ করেছেন। সুতরাং এ কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে স্বতঃপ্রবৃত্ত রচনাও পরোক্ষভাবে সমাজের প্রেরণাতেই লেখা। কারণ সামাজিক মানুষের চিন্তা-অনুভব-ইচ্ছা সমাজ-সাপেক্ষ হতে বাধ্য।

তারপর শিল্পী যেখানে খুব একটা আদর্শবাদী এবং সমাজসচেতন ন'ন—সেখানেও, শুধু যশের বা অর্থের প্রেরণাবশেও শিল্প রচনা হ'তে পারে। অর্থের অভাব মেটাতে লেখনী-চালনা করেছেন এর দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যেতে পারে।

কবিজীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ কবিখ্যাতি তথা আত্মপ্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য কাব্যরচনায় মেতেছিলেন—সমীরে সমীরে দুলেছিলেন—এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোন কিছুই নেই, প্রৌঢ়দশায় খুব সচেতন হ'য়ে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন—কাম্যকে আশ্রেয় এবং অবাঞ্ছিতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, এতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অর্থের প্রেরণাবশেও কাব্য রচনা করেছেন এ একটা সংবাদ বটে, এবং অনেকেরই কাছে হয়ত বেদনাদায়ক সংবাদ। ১৩৩৩ সালের ১২ই চৈত্র তারিখের এক পত্রে প্রমথ চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তাকে সাক্ষী মানা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিচিত্রা নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চলেচে—যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা উৎসাহী ও ধনী।...... ..আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছি, অভাবের দায়ে, লোভের তাড়নায়। আমার দৈন্য যে কত কঠিন হ'য়ে উঠেছে সে তোমরা অনুমান করতে পারবে না—সেই কারণে নিষ্কামভাবে লেখা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। নিজের কলমের জোরে ছাড়া, সাধুতা রক্ষা করে অর্থোপার্জ্জনের আর কোনো উপায় জানিনে।..... লক্ষ্মীর প্রকোপে পড়ে বাণীর প্রসাদপদ্ম নিয়েও ব্যবসা ফাঁদতে হ'ল এই শেষ বয়সে।" ১৩৩৩ সালের বৈশাখ

মাসের একখানি পত্রে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে লিখেছেন—"লজ্জার সঙ্গে মানতে হোলো যে অর্থের অভাব মেটাবার জন্যে নাটকটা সর্ব্বোচ্চ ডাকে অনাত্মীয় হাটে বেচবার চেষ্টায় আছি। ৪৷৫শো টাকা নগদ পাবার আশা আছে—পেলে নিজের ভোগে সে টাকার অপব্যয় হবে না। তহবিল শূন্য অথচ ভিক্ষা মেলে না বলেই আমাকে ব্যবসাদারী করতে হয়।" 'অর্থকৃতে' কাব্য লেখার এই স্বীকৃতি—রবীন্দ্রনাথের মতো কবির স্বীকৃতি—অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এবং এই কারণেই উল্লেখযোগ্য যে কলাকৈবল্যবাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে শিল্প ও শিল্পীকে যাঁরা আকাশস্থ নিরালম্ব করতে চেষ্টা করেন তাঁদের পক্ষে এই স্বীকৃতিগুলি মোহমুদ্গরের কাজ করবে বলে আশা করি। রবীন্দ্রনাথের এই সব স্বীকৃতি বা মন্তব্য এই কথাই প্রমাণ করে যে কবিরা যে উদ্দেশ্য নিয়েই লিখুন, লেখার রসোত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে উদ্দেশ্য কোন বাধা নয়, আর কবিরা যে 'সত্য-শিব-সুন্দর'কে ব্যক্ত করতে চান তা' মানুষের 'জীবনের-মাঝ-দিয়ে-ব্যক্ত'—সত্য-শিব-সুন্দরেরই চেতনা—অতীন্দ্রিয় লোকের কোন নির্ব্বিশেষ সত্য-শিব-সুন্দরের তত্ত্ব নয়। মানুষের প্রকাশের ক্ষুধা মেটানো কবির উদ্দেশ্য—এ কথা যত সত্য, তত বেশী সত্য—এই কথাটি যে প্রকশ বিষয়েরই প্রকাশ এবং বিষয়—এই জগতেরই রূপ-ভাব ভাবনা। সৌন্দর্য্য বিষয়েরই প্রকাশ-মাধুর্য্য বলে' বিষয়নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য বলে কোন সৌন্দর্য্য নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিই নয়, পৃথিবীর বড় বড়ো বড়ো কবি-শিল্পীর লেখা থেকেও এই ধরণের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। রচনার প্রেরণা বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে—আনন্দ বা সৌন্দর্য্য এহো বাহ্য তার, "আগে"ও কিছু বলবার আছে।

এইবার দৃষ্টিকোণ বিষয়ক আলোচনার উপসংহার করা যাক। যে দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ প্রতিভাকে দর্শন করতে হবে

তাকে সংক্ষেপে বলা চলে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর এর প্রতিষ্ঠা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য-সমালোচনা করার নামই ঐতিহাসিক সমালোচনা-পদ্ধতিতে সমালোচনা করা অর্থাৎ কবিকে বিশেষ জাতির, বিশেষ যুগের, বিশেষ পরিবারের বা শ্রেণীর মানুষ হিসাবে দেখা এবং তাঁর সৃষ্টির রূপ, বিষয় ও প্রেরণাকে সমাজেরই দেওয়া উপাদান বা চাহিদা হিসাবে দেখা।

২। রবীন্দ্র-যুগ

সামাজিক ব্যক্তির জ্ঞান-অনুভব-এষণা বৃত্তিহিসাবে প্রজাতীয় বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত বটে, কিন্তু সামাজিক জীবের জ্ঞানবন্ধ, অনুভব-বন্ধ এবং এষণাবন্ধ সমাজনিয়ন্ত্রিত তথা সমাজসাপেক্ষ হ'তে বাধ্য—প্রতিভাদর্শনের দৃষ্টিকোণ আলোচনাপ্রসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত আগেই করা হ'য়েছে। এ কথাও বলা হ'য়েছে—ঐ সিদ্ধান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে গেলে, কবি ও কাব্যকে, 'জাতি-যুগ-পরিস্থিতি'র (Race, milieu & moment)—পটভূমিতে দাঁড় করিয়েই পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। কারণ কবি যে জাতির অন্তর্ভুক্ত সেই জাতির ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে কবির বিশেষ যুগটির বৈশিষ্ট্য কার্য্যকারণ যোগে যুক্ত; আবার সেই যুগের ধর্ম বা প্রকৃতির সঙ্গে কবির পারি-বারিক স্থিতি-গতির বৈশিষ্ট্য, এক কথায় জীবনের পরিস্থিতিগুলি, যুক্ত হয়ে থাকে। এই কারণেই যদি কোন বাঙালী কবির সৃষ্টির 'কি-কেন' সমগ্রভাবে পর্য্যালোচনা করতে হয়, তাহ'লে বাঙালী জাতির ইতিহাসের ধারা, সেই বিশেষ কবির আবির্ভাবকালে জাতির ইতিহাসের বিশেষ পর্য্যায় অর্থাৎ যুগ এবং সেই যুগের নানা ধারণা-প্রেরণার সঙ্গে কবি-জীবনের যোগ—পরিবেশের সঙ্গে কবির সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ার রূপ—সব কিছুর আলোচনাই করা দরকার। ছোট-বড় সব স্রষ্টার পক্ষেই এ পদ্ধতি প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের মতো সার্বভৌম বিস্ময়কর প্রতিভার পক্ষেও বটে। যত বিচিত্র বর্ণালীতেই প্রতিভা বিচ্ছুরিত হোক, বাঙালী জাতির ইতিহাসের সঙ্গে (রাজনৈতিক-আর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ইতিহাস) রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এই মূল সূত্র মেনেই চলতে হবে।

এ কথাটাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—বর্ত্তমানের প্রতি মুহূর্ত্তের কণ্ঠে অতীতই কথা বলে, অতীতই ভুবনে ভুবনে কাজ করে যায় গোপনে গোপনে। তার 'অলক্ষিত চরণের অবারণ চলা' দেখতে না পেলেও সে চলার বিরাম নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে' বলা যেতে পারে—অতীতের ইচ্ছাই বর্ত্তমানের মধ্যে পূর্ণ হয়—সমাজের ইচ্ছাই ব্যক্তির জীবনমাঝে পূর্ণ হয়। বাঙালীজাতির সমগ্র-অতীতই রবীন্দ্র-যুগ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে জাতির অন্তর্ভুক্ত তার নাম বাঙালী। এই জাতির উৎপত্তির ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত অনেক কালের ব্যবধান; সুতরাং মনে হতে পারে উৎপত্তির ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের যোগ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে—এমিবা থেকে মানুষ পর্য্যন্ত যেমন একটা অন্তরঙ্গ যোগ-সূত্র চলে এসেছে, তেমনি বাঙালী জাতির উৎপত্তি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটা কার্য্য-কারণপরম্পরা বিরাজ করছে। বাঙালী জাতির প্রাণ-প্রবাহ থেকে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করে' দেখা অসম্ভব ব্যাপার। তা' করতে গেলে দেখা যাবে—যে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর সভ্যতা নেই, সংস্কৃতি নেই,—ভাষা নেই, ভাব নেই, 'নহ পুত্র নহ পিতা' গোছের এক নৈর্ব্যক্তিক রবীন্দ্রনাথ—'বৃন্তহীন পুষ্প', অথবা এমন এক রবীন্দ্রনাথ যাঁর সংস্কৃতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন,—আমাদের এ রবীন্দ্রনাথ নন। বাংলা-

ভাষা যাঁর মাতৃভাষা সেই বাঙালী জাতির ইতিহাসের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে না দেখলে, কাল্পনিক বা বিকল্প (শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প) কোনো রবীন্দ্রনাথকেই খোঁজা হবে। বাঙালীকে এত বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখায় কেউ কেউ মনে করতে পারেন বাঙালীর ভারতীয়ত্বকে আমি উপেক্ষা করছি। এঁদের এই মনে করা সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে বাঙালীর ভারতীয়ত্বকে ইতিহাসের দান হিসাবেই দেখতে হবে—বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাসের মধ্যেই এই ভারতীয়তার আবির্ভাব ঘটেছে এবং জাতির ক্রমবিকাশের মাঝেই ভারতীয়ত্ব-লক্ষণের অস্তিত্বের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, ইতিহাসের গতি এদিক-ওদিক হ'লে ভারতীয়তার অস্তিত্ব অন্যরূপ হ'তো। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বাঙালী নয়, ওড়িয়া নয়, আসামী নয়, মৈথিলী নয়, ভোজপুরী নয়, হিন্দী নয়, গুজরাটী নয়, তামিল নয়, তেলেগু নয়, কানাড়ী নয়, পাঞ্জাবী নয়,—অর্থাৎ বিশেষ কোনো ভাষাগোষ্ঠীর লোক নয়—এমন ভারতীয় অসৎ—প্লেটোর "আই-ডিয়া'র মতোই অসংকল্প পদার্থ।" 'আইডিয়া'র বাস্তব সত্তা স্বীকার না করা পর্য্যন্ত, নির্বিশেষ ভারতীয়তত্ত্ব কথার কথা মাত্র। বাঙালী জাতি যে পরিমাণে ভারতীয়, প্রত্যেক বাঙালী (রবীন্দ্রনাথও) সেই পরিমাণে ভারতীয়। ভুলে গেলে চলবে না আর্য্যাবর্ত্তের ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছিল বলেই ভারতের সঙ্গে বাঙালীজাতির যোগ স্থাপিত হ'য়েছে।

বাঙালীজাতির উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করলেই কথাটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালীজাতির উৎপত্তি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা'তে দেখা যায়—"যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙলীর পূর্বপুরুষেরাই বাস

করিয়া আসিতেছে। উত্তর ভারতের লোকেরা বিহার ও আরো পশ্চিম হইতে বরাবরই বাঙ্গালা দেশে কিছু কিছু করিয়া আসিয়াছে, এখনও যেমন আসিতেছে……বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত।" (জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়)। তারপর বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম পুণ্ড্র প্রভৃতি যে কয়টি জাতির সংযোগে বা সমবায়ে বাঙালীজাতি বা বাঙ্গালা দেশ গঠিত, তারা যে আর্যেতর জাতি এ বিষয়ে সকলেই একমত। ঐতেরেয় আরণ্যকের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—বঙ্গ-বগধ-চেরপাদ—এই তিন প্রজা "অত্যায়মীয়"= নষ্ট জাতি। প্রাচীন জৈন-শাস্ত্রগ্রন্থ 'আয়রঙ্গসুত্তে', রাঢ় ও সুহ্ম জাতিকে নিন্দিত জাতি বলা হয়েছে। "ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ-—পুণ্ড্র জাতিকে অন্ধ্র-পুলিন্দ-শবর প্রভৃতি জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বাঙ্গালা দেশের আদিবাসীরা সকলেই অনার্য-জাতি। এই সব জাতি যদি অবাধ আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করতো, তাহ'লে অবশ্যই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চেহারাও অর্থাৎ রূপ ও রস অন্যরূপ হ'য়ে যেতো। ইতিহাসের ধারা বাঙালী জাতির ভাগ্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছিল বলেই এবং সেই ধারা বাধা পায়নি বলেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমান রূপ সম্ভব হ'য়েছে। আর্যজাতির অনুপ্রবেশ এবং উপনিবেশ স্থাপনা এই ইতিহাসের ধাক্কা। এ এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন—অনার্য-জাতি-গোষ্ঠীর আর্যীকরণ। আর্যীকরণের জারক রসে জারিত হ'য়ে—অনার্য্য-জাতি-গোষ্ঠীর কি দশা হ'য়েছিল ডাঃ-শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায় বলা যাক—"গুপ্ত শাসনকালে বাঙ্গালা দেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে আর্যভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল এবং এই সময় হইতে ভাষায় আচার-ব্যবহারে ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালা দেশ আর্য্যাবর্ত্তের একতম

অংশে পরিণত হইতেছিল। ষষ্ঠ শতকের মধ্যে বিস্তর অনার্যভাষী আর্য-ভাষী হইয়া গেল, নয় ক্রমাগত কোণঠাসা হইয়া শেষে প্রত্যন্ত পার্ব্বত্য আরণ্য ও জনবিরল স্থানে আত্মগোপন করিল" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড)। হিউ এন্‌-ৎসাঙের বিবরণ সত্য হ'লে, সপ্তম শতকের আগেই যে আর্য্যভাষা অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় স্থান থেকে অপসারিত করে' সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ অনুমান অবশ্যই করা যায়। আর্যভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং সমীকরণের ফলেই, নতুনভাবে বাঙ্গালী-জাতির গোড়াপত্তন হয়। সংস্কৃত রাজকার্য্যের ভাষা, প্রাকৃত অর্থাৎ পূর্বীপ্রাকৃত এবং তার অপভ্রংশ হয় কথ্যভাষা। ক্রমে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় দেশী শব্দরা শব্দভাণ্ডারে স্থান করে নিতে চেষ্টা না করেছে এমন নয়, কিন্তু ঐ চেষ্টা সামান্যই। পূর্বীপ্রাকৃতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। এই পূর্বীপ্রাকৃত, ক্রমে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে হ'য়ে, আনুমানিক দশম শতকে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং তারই ফলে, বাঙালী ভাষার দিক দিয়ে আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, স্বতন্ত্র জাতির মর্য্যাদা লাভ করেছে।

তারপর, এই ভাষাগত এবং সংস্কৃতি-গত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালী-জাতি আত্মরক্ষা করতে পেরেছে বলেই, আমাদের পক্ষে মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যকে বর্ত্তমান আকারে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মুসলমান অভিযানের ফলে এবং মুসলমান শাসনাধিকারের আওতায় থেকে (পাঠান যুগ+মোগল যুগ) বাঙালী-জাতি যদি জাতকে-জাত মুসলমান হ'য়ে যেতো—বাঙালীদের যদি অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়ভাষা-ভাষীর মতো অপমৃত্যু ঘটতো- তাহ'লে, বলা বাহুল্য—বাঙালী জাতির ভাষায় এবং সংস্কৃতিতে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন দেখা দিত।

ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির আধ্যাত্মিক বাসনা ও সাধনা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতো। বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধ কোনো আবেগই আর সেখানে থাকতো না। ফলে ঐ আবেগের কোন সাহিত্যও রচিত হতো না। আর ভাষার অবস্থাও ভিন্নরূপ হতো। আরবী-ফার্সী-শব্দে-ভরা উর্দুর মতো মুসলমানী বাংলাভাষা গড়ে উঠতো।

কিন্তু বাঙালীজাতির ভাগ্যে এরূপ কোন দুর্বিপাক ঘটেনি—ঘটতে পারেনি বলেই ঘটেনি। কেন ঘটতে পারেনি—এই উদ্ধৃতি থেকে খানিকটা বুঝতে পারা যাবে—"খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। প্রথমে পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজচ্ছত্রমাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিফল মনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলিজীর সময়ের শতাধিক বর্ষ মধ্যেই বাঙ্গলার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দু-রাজবংশধর বিরাজ করিতেছিলেন।.........স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল; সেখানে ইসলামের প্রভাব প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু-সামন্তগণও অনেক সময় মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন, দেশের অংশবিশেষ কোন সময়ে বিজেতার পদানত হইলেও আবার অন্য অংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে।" (কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস)।

বাংলার এই রাজনৈতিক অবস্থাটি, হিন্দু-মুসলমান জাতিদ্বন্দ্বের ইতিহাস আলোচনা করবার সময়, বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে—দেশের ভূ-সম্পত্তির উপর

কার্য্যত্যঃ হিন্দু-সামন্তদের ও জনসাধারণের অধিকার থাকায়, অর্থ আদায়ের ব্যাপারে হিন্দুর সাহায্য না নিয়ে উপায় ছিল না। এই কারণে শক্তিমান হিন্দুদের হাতে রাখার প্রয়োজন পাঠান-মোগল সকল শাসকই কম-বেশী অনুভব করেছেন। তারপর, শাসকদের দিল্লীর অধীনতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা থাকায়, স্থানীয় প্রজাদের জনবল—অর্থবলের সাহায্য সকলকেই প্রত্যাশা করতে হ'য়েছে। এই সব কারণে হিন্দুর আত্মরক্ষার সংগ্রাম খানিকটা সহজ হ'য়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে একথাও ঠিক—হিন্দুরা সংখ্যায় ও সংস্কৃতিতে অতিনগণ্য হ'লে—হিন্দুদের সাংস্কৃতিক অভিমান দৃঢ় না হ'লে—হিন্দু-সমাজ এইভাবে আত্মরক্ষা করতে পারতো না। কারণ, দুটো ভিন্ন জাতি যখন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তখন একপক্ষ অন্যপক্ষকে যেভাবেই করুক, আত্মসাৎ করবার, অথবা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। এই দু'য়ের কোনটাই যেখানে সম্ভব হয় না, কালক্রমে সেখানে সমাধান ঘটে—সমন্বয়ের মধ্যে। সমাধান পূর্ণ না হ'লে, বিরোধের বীজ থেকেই যায় এবং তা' থাকে বলেই, অল্প-কারণেই চাপা জাতিদ্বন্দ্বের আগুন বিক্ষোভ-আকারে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠে।

ভারতে বাংলাদেশেও বটে—হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের পরিপূর্ণ সমাধান ঘটতে পারেনি। শক-হুন দল যে-ভাবে একদেহে লীন হ'য়েছে—পাঠান-মোগল সেভাবে একদেহে লীন হ'তে পারেনি। হিন্দু বা মুসলমান কেউ কাউকে আত্মসাৎ করতে পারেনি। হিন্দুরা মুসলমানের ছোঁয়াচ যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা ক'রেছে আর মুসলমানেরা হিন্দুদের মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করতে ছলেবলেকৌশলে চেষ্টা করেছে—কিন্তু জাত্‌কে-জাত মুসলমান করতে পারেনি। এই জাতীয় বিপত্তি ঘটেনি বলেই, বাঙালী হিন্দু-সমাজ আর্য্যসংস্কৃতির কোল থেকে দূরে সরে পড়েনি—'সংস্কৃত'-ভারতের সঙ্গে বাঙালীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে

যায়নি। আর তা' যায়নি বলেই বাঙালী সংস্কৃত ভাষার চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, প্রাচীন ভারতের ধারণা-প্রেরণার সঙ্গে সংযোগ রাখতে পেরেছে—পৌরাণিক, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা-পার্বণে ধর্মীয় আবেগ মেটাতে পেরেছে। এই আবেগের পরিবর্ত্তন ঘটলে—আমরা আর যাই পেতাম, এই সব পাঁচালী-সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য, মঙ্গল-কাব্য, বৈষ্ণব-চরিত সাহিত্য এবং বাউল-সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যগুলি পেতাম না। তার শব্দ, ছন্দ, সুর ও ভাব ভিন্ন হ'য়ে যেতো। উনবিংশ শতাব্দী ভাষার ও ভাবের যে উত্তরাধিকার পেয়ে, আপনাকে এইভাবে ব্যক্ত করতে সমর্থ হ'য়েছে, তা' পাওয়া সম্ভব হ'তো না। আর তা' না হ'লে মধুসূদন, বিহারীলাল, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমুখ সাহিত্যিকদেরও এ মূর্ত্তিতে আমরা পেতাম না।

একথা আমরা আগেই বলেছি—কোনো যুগই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ নয় এবং প্রত্যেক বর্ত্তমান অতীতেরই ব্যক্ত রূপ। উনবিংশ শতাব্দীর ভাগ্য যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্মফল দিয়ে গড়া, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাগ্য সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসেরই ক্রমপরিণতিমাত্র। প্রত্যেক যুগের রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক, ইতিহাস বিবৃত করলেই কথাটার সত্যতা ধরা পড়বে। এখানে সে অবকাশ নেই। সুতরাং মোটামুটি একটু দিগদর্শন করেই কাজ শেষ করতে হ'চ্ছে।

১৫৯৯ অব্দটিকে এক হিসাবে উল্লেখযোগ্য বলা চলে। এই অব্দে এক-দিক 'সেরপুর তরাই'এর যুদ্ধে পাঠান-শক্তি পর্য্যুদস্ত হয় তথা মোগল-আধিপত্য আরো বেড়ে যায়; অন্য দিকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" গঠিত হয়। এই সময় মোগল-পাঠান জাতিদ্বন্দ্বের একরূপ সমাধান হয় বটে, কিন্তু নতুন এক জাতি-দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। অবশ্য ভারতে ইউরোপীয় জাতির আগমন এর আগেই হ'য়েছে। পর্তুগীজ বণিক ও দস্যুরা ষোড়শ শতাব্দীর রাজনীতিতে, বলা চলে, উল্লেখযোগ্য অংশই

গ্রহণ করেছে। বাংলার রাজনীতিতেই শুধু নয় সমাজ-জীবনেও তারা কম প্রভাব বিস্তার করে নি। (ফিরিঙ্গী-সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস স্মরণীয়)। সুতরাং এক হিসাবে বলা চলে—ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরবর্ত্তীকালে জাতিদ্বন্দ্বের যে কুরুক্ষেত্র দেখা দিয়েছিল, তার বীজ এখানেই উপ্ত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস, আপাতদৃষ্টিতে, জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭), শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) এবং ঔরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭)—এই তিন বাদশাহের শাসনকালের ইতিহাস বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, এই সময়ের ইতিহাস—বৈদেশিক বণিকদের শক্তি-সংগ্রহের, বাণিজ্যবিস্তারের ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ইতিহাস, নতুন এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ও বিকাশের তথা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের জটিলতা-বৃদ্ধির ইতিহাস—দেশী-বিদেশী বণিকশ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধির—প্রভাব-প্রতিপত্তিবৃদ্ধির ইতিহাস—বিদেশী বণিকদের কুঠি ও বাণিজ্যকেন্দ্র আশ্রয় করে' নতুন এক চাকুরীজীবী শ্রেণীর উদ্ভবের ইতিহাস—কৃষি-ভিত্তিক পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সূচনার ইতিহাস। [বিদেশীদের এই কুঠিগুলির মধ্যেই যে ভবিষ্যৎকালের শিল্পকারখানার বীজ নিহিত ছিল একথা বললে অন্যায় কোন কথা বলা হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সব কুঠি যেরূপ বৃহদাকার ধারণ করে—এবং যন্ত্র-সমৃদ্ধ হয়ে উঠে তা' লক্ষ্য করে দেখলেই কথাটা সত্য কি মিথ্যা যাচাই করে দেখা যাবে]।

যে ক'লকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙলার বর্ত্তমান সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেই ক'লকাতার প্রতিষ্ঠা হয় এই শতাব্দীতেই—১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে। ক'লকাতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধি ইংরেজের সুপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে কার্য্যকারণযোগে যুক্ত হয়ে আছে। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বণিকরা শক্তিসঞ্চয় করতে থাকেন এবং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের স্পর্ধা এত বেড়ে যায় যে হুগলীর ফৌজদারের

বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে তাঁরা ইতস্তত করেন না। শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের শায়েস্তা করে আনেন বটে, কিন্তু ইংরেজরা সামান্য কয়েকটা টাকা নজরাণা দিয়ে ঔরংজীবের কাছ থেকে "অনুমতি" কিনে নিয়ে আসেন এবং জব চার্ণক কলিকাতায় এসে 'কুঠি' স্থাপনা করেন। কলিকাতা দেখতে-না-দেখতে বড় বাণিজ্যবন্দরে পরিণত হয়। ধনিকে-বণিকে কলিকাতা জনবহুল হ'তে থাকে। ইংরেজ-বণিকদের অধীনে চাকুরী করে'—ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে'—নতুন নতুন ধনী-পরিবার গড়ে উঠে এবং এরাই ক্রমে কলিকাতার 'অভিজাত' পরিবারে পরিণত হয়। ঠাকুর পরিবারের কথাই ধরা যাক। ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসও এই নতুন-গড়া ক'লকাতার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। মহেশ্বর কুশারী ও শুকদেব কুশারীর গোবিন্দপুরে বসতিস্থাপন, জেলেদের মুখে—"ঠাকুর" উপাধি লাভ, মহেশ্বরপুত্র পঞ্চানন ঠাকুরের ইংরেজ জাহাজে রসদপত্র সরবরাহ, পঞ্চাননপুত্র জয়রাম—রামসন্তোষের এবং শুকদেব-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের ইংরেজ-বণিকদের কাছে ইংরেজি-শিক্ষা, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা জরিপকার্য্যে জয়রামের ও রামসন্তোষের আমিনপদে নিয়োগ, কোম্পানীর কাজ করে প্রচুর ধনোপার্জ্জন, জয়রাম-পুত্র নীলমণি ঠাকুরের ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধনসায়রের (বর্ত্তমান ধর্মতলা ও গড়ের মাঠ) বাড়ী ও বাগানের বিক্রয়মূল্য নিয়ে পাথুরিয়াঘাটায় বাস, কোম্পানীর দেওয়ানি পাওয়ার পরে—(১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) নীলমণির উড়িষ্যা-কালেক্টারের সেরেস্তাদার হওয়া—অন্যান্য ভাইদের ব্যবসায়ে অর্থ খাটানো, ১৭৮৪ খ্রীঃ জোড়াসাঁকোয় বাস, দ্বারকানাথের ম্যাকিনটোস্ কোম্পানীর গোমস্তাগিরি, শেষে অর্ডার সরবরাহ করা, পরে—'নিমকি' অধ্যক্ষের দেওয়ান হওয়া—প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করা—ক'লকাতার প্রতিষ্ঠার এবং ইংরেজ-বণিক কোম্পানীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত হয়ে আছে। এই পটভূমি বাদ দিলে, ঠাকুর-পরিবারের ইতিহাস লেখা অসম্ভব। ভুললে

চলবে না—ঠাকুরপরিবার পিরালি ব্রাহ্মণ হ'য়ে থাকার চেয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলে যেমন এই পরিবারের বৃক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো অমৃত ফল ফলতে পারতো না, তেমনি দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্য দেবেন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারী সূত্রে না পেলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আত্ম-বিকাশের এত অবাধ সুযোগও পেতো না।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে যে বীজ উপ্ত হয় শতাব্দীর শেষভাগে তা' রীতিমতো অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম-পাদের শেষেই প্রকাণ্ড এক মহীরুহে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা, ভারতের রাজনীতিতেতে, অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পলাশীর প্রান্তরে এই জাতিদ্বন্দ্বের যেভাবে মীমাংসা হয়, তাতে ইংরেজ-শক্তি বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস, ১৭৬৪ পর্য্যন্ত—বাহ্যত মুর্শিদকুলিখাঁ সুজাউদ্দীন (১৭২৭-১৭৩৯), সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০), আলিবর্দ্দী (১৭৪০-৫৬), সিরাজদ্দৌলা (১৭৪৬-৫৭), মীরজাফর (১৭৫৭-৬০), মীরকাসেম (১৭৬০-১৭৬৪) নামে-নবাব মীরজাফর (২য় বার নবাব), নজমুদ্দৌলা—প্রভৃতির শাসনকালের ইতিহাস বটে, কিন্তু অন্যদিক থেকে বলা চলে এই সময়েই জাতিদ্বন্দ্বের রূপ জটিল ও উৎকট আকার ধারণ করে, সামন্তদের এবং ধনিক-বণিকদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে জাতীয় জীবন ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে যায়। তারই ফলে, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ-বণিকশক্তির হাতে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে—ইংরেজপ্রভুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই প্রভুত্ব—১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বৈতশাসন লোপের ফলে অর্থাৎ ফৌজদারী ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার ফলে, রীতিমত কায়েম হ'য়ে যায়। এইভাবে ইংরেজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা হ'য়ে বসে এবং বাংলার ইতিহাস এক নতুন পর্য্যায়ে প্রবেশ করে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে

নর্থের রেগুলেটিভ্ এ্যাক্ট, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট—তারপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল—(১৭৮৬-১৭৯৩) এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, স্যার জন শোরের শাসনকাল—(১৭৯৩-১৭৯৮)—ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের ভিত্তিকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন বাঙালী সমাজ-মানসে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা করে, তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারলেই, উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের এবং শিল্প-সাহিত্যের রূপ-রসের প্রকৃতিটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু বলাই যথেষ্ট—ভারতের বুকে জাতিদ্বন্দ্বের যে (হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ—এই তিন শক্তির, যে ত্রিকোণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তা'তে হিন্দু ও মুসলমান বৈদেশিক ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাজিত হয়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তি, নামত না হ'লেও কার্য্যতঃ অধীশ্বর হ'য়ে উঠে। রাজ-শক্তির এই পরিবর্ত্তনে হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজের সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়। ইংরেজ কার্য্যতঃ প্রভুর আসন দখল করে এবং হিন্দুসম্প্রদায়, মুসলমানসম্প্রদায় ইংরেজের অধীন প্রজা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। এখান থেকেই আমাদের পরাধীনতা-চেতনার সূচনা এবং ইংরেজ ও ইংরাজির প্রভুত্বের ও গুরুত্বের সূচনা। তারপর যে আর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা ইংরেজ-শক্তিকে রাজার আসন অধিকার করতে সাহায্য করেছে এবং শক্তির মূলে প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করেছে তার প্রভাবেই যে ক'লকাতা ধনিক-বণিকের নগরে পরিণত হয় একথা আগেই বলা হ'য়েছে। আমরা জানি, গ্রাম্যজীবন মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক, নাগরিক-জীবন মূলতঃ বাণিজ্য-কেন্দ্রিক বা শিল্পকেন্দ্রিক। গ্রাম্যজীবনে সমাজের নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বব্যাপী। নাগরিক-জীবনে সমাজ-নিয়ন্ত্রণ শিথিল।

ইংরেজ-আধিপত্যের পরে ক'লকাতার গুরুত্ব ও লোকসংখ্যা এবং

ইংরেজির গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, ক'লকাতাকে কেন্দ্র করে' বাংলায় নতুন এক সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। সমাজে ধনিক-বণিকের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, সমাজের মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রটি শিথিল হ'তে থাকে। রাজশক্তি বিদেশী ইংরেজ। ধনিক-বণিকের সম্মানই তাদের কাছে বেশী। রাজা যাকে সম্মান করেন—সমাজে তারই মর্য্যাদা ও শক্তি বেশী। ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারাই যেখানে পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়, সেখানে ইংরেজি আদব-কায়দার অনুকরণ না হ'য়ে পারে না। একদিকে নবাবী বিলাস-ব্যসনের প্রচলিত সংস্কার, অন্যদিকে ইংরেজের বিলাস-ব্যসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—দুইদিক থেকেই ধনিক-বণিকদের বাসনা-বহ্নি প্রচুর বাতাস পেয়েছে এবং দাউ দাউ ক'রে জ্বলেছে। ব্যবসা বা চাকুরী, ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শন, বিলাস-ব্যসন ও ইংরেজ-তোষণ —এ ছাড়া কাজ কোথায়? এঁদেরই ঐশ্বর্য্য-গর্ব-প্রদর্শনের এবং বিলাস-ব্যসনের উৎস থেকেই নানা আমোদ-প্রমোদ-অনুষ্ঠান, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলাও 'বাই প্রোডাক্টসে'র মতো দেখা দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এঁদেরই আশ্রয়ে হাফ-আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি গানের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি হ'য়েছে। এঁদেরই রুচির প্রশ্রয়ে ক্রমে বিদ্যা-সুন্দর যাত্রার কদর বেড়েছে। পুরাণো পাঁচালী গানের পাশে—কৃষ্ণযাত্রার চণ্ডীযাত্রার পাশে—বিদ্যাসুন্দর-পালা আসর জমিয়ে তুলেছে। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এখানে এই যে নতুন আর্থনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থার ফলে নাগরিক-জীবনে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে—সমাজ-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-আনুগত্যেরও তীব্রতা কমতে থাকে এবং আত্ম-কেন্দ্রিকতা বাড়তে থাকে। আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়তে থাকার অনিবার্য্য পরিণতি—আত্মগত ভাবাবেগ প্রকাশের প্রবণতা—ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে দশের কাছে সঞ্চার করে দেওয়ার বাসনা।

কিন্তু যে উপলব্ধির সঙ্গে সমগ্র সমাজের আবেগের সম্পর্ক নেই

তাকে সমাজ গ্রহণ করতে ব্যাকুল হবে কেন? যা' নিছক ব্যক্তিগত বা যার সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের সম্পর্ক নেই তাকে সঞ্চার করতে হ'লে, সঞ্চারের উপযুক্ত মাধ্যম বা নতুন উপায় চাই। এমন "মাধ্যম" চাই যা' বিশেষ অনুষ্ঠানের মুখাপেক্ষী নয়—যা' আশ্রয় করে,—সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির চিন্তা বা অনুভব পৌঁছে যেতে পারে। মোটকথা প্রকাশের নতুন রীতি চাই—প্রচারের নতুন বাহন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই চাহিদার পূরণ হয়—মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনায়। বাংলা হরফ তৈরীর কারখানা-প্রতিষ্ঠার ফলে, ভাব-প্রকাশের বা সঞ্চারের নতুন এক পথ খুলে যায়।

যদিও পর্তুগীজ পাদ্রীরা এর আগেই খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্য অমানুষিক অধ্যবসায় দেখিয়েছে এবং ছলেবলে বেশ কিছুসংখ্যক লোকের জাত মেরেছে, তবু, একথা স্বীকার করতেই হবে, দেশীয় ভাষায় পুস্তক মুদ্রণের জন্য তাঁরা তেমন ঐকান্তিক চেষ্টা করেনি। এ চেষ্টা আরম্ভ হ'য়েছে, ইংরেজ-অধিকার কায়েম হওয়ার পরেই। আমরা জানি—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড সাহেব যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তাতেই উদাহরণ দেওয়ার জন্য প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এখানে মুদ্রিত-প্রকাশের সূচনা মাত্র। এই ঘটনাটির পরে—আরো দু'একটি ঘটনা ঘটে এবং তাদের সহযোগেই মুদ্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ঘটনা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠা—খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের ভারতে আগমন—বিশেষ করে' বাংলাদেশে উপস্থিতি—শ্রীরামপুরে মিশন-প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় ভাষায় বাইবেল-অনুবাদের চেষ্টা। দ্বিতীয় ঘটনা—পুস্তক-প্রকাশকের চাহিদা পূরণ করবার জন্য অক্ষর ঢালাই কারখানার প্রতিষ্ঠা (১৭৯৭)। অক্ষর ঢালাই কারখানার প্রতিষ্ঠা, বাস্তবিকই—একটা যুগান্তর-কারী ঘটনা। অক্ষর বা হরফই হ'চ্ছে মুদ্রণের প্রাথমিক প্রয়োজন। এই উপাদান না থাকলে সব উপাদানই তো নিরর্থক। সুতরাং

একথা বলা চলে, অক্ষর-ঢালাই কারখানা-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে—বাংলার প্রকাশ-রীতি এক নতুন পর্বের দ্বারদেশে উপস্থিত হয় এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তা' এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে। যদিও রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০), তবু এই প্রয়োজনেরই "বাই-প্রোডাকট"—হিসাবে বাংলা সাহিত্য নানা গ্রন্থ মুদ্রিত হ'তে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টা মিলিত হ'য়ে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের নতুন ফসল ফলাতে আরম্ভ করে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির—বিশেষতঃ গদ্য সাহিত্যের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধির—মূলে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুদ্রাযন্ত্র না থাকলে কি অবস্থা হ'তো তা' চিন্তা করে না দেখলে সম্যক বুঝতে পারা যাবে না। যে বাংলা "সংবাদপত্র"—নতুন যুগের বাংলা-সাহিত্যের ধারক ও বাহক, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতিষ্ঠাও কার্য্যকারণযোগে যুক্ত হ'য়ে আছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—মুদ্রাযন্ত্রের ভিত্তির ওপরেই, ঊনবিংশ-শতাব্দীর সাহিত্য-রচনার বিরাট ও বিচিত্র প্রাসাদ গড়ে উঠেছে।

এই আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৮০০ থেকে—১৮৫৯ পর্য্যন্ত—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু পর্য্যন্ত—মধুসূদন, রঙ্গলাল, বিহারীলাল প্রমুখ কবিদের সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত—যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তাদের আমরা মোটামুটি-ভাবে রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করে গুছিয়ে নিতে পারি। এই সময়ের রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক—সামাজিক—সাংস্কৃতিক ঘটনাপঞ্জী—

(ক) লর্ড ওয়েলস্‌লী (১৭৯৮-১৮০৫)

* অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

* নিজামের বশ্যতা স্বীকার
* চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯৯) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০)
* সুরাট, তাঞ্জোর, কর্ণাটক, অযোধ্যার অংশ অধিকার
* দ্বিতীয় মারাঠা-যুদ্ধ (১৮০৩-১৮০৫)

(খ) জর্জ বার্লো(১৮০৫-১৮০৭)—(ঔদাসীন্য নীতির পুনঃপ্রবর্তন)

(গ) লর্ড মিন্টো- (১৮০৭-১৮১৩)

* ১৮১৩ কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করবার একচেটে অধিকার হারায়।
* শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর অন্যূন এক-লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা।

রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রী—

অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯)

(ঘ) লর্ড ময়রা বা লর্ড হেষ্টিংস (১৮১৩-১৮২৩)

* রাজ্যবিস্তার নীতি-গ্রহণ
* গুর্খা-যুদ্ধ (১৮১৪-১৮১৬) * হিন্দু কলেজ (১৮১৭)
* পিণ্ডারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮) * স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭)
* তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৯) * স্কুল সোসাইটি (১৮১৮)

(ঙ) লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩-১৮২৮) * ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (১৮১৯)

* প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪-১৮২৬)
* ভরতপুর অধিকার (১৮২৬)

(চ) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫) * ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮)

* শাসন-সংস্কার—

—প্রাদেশিক বিচারালয়গুলির বিলোপ-সাধন

—জেলার কালেক্টারদের ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচারের ভার দেওয়া

* —আদালতে ফারসী ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত।

* ভারতীয়দের শাসনবিভাগে, বিচারবিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা—

* সতীদাহ-প্রথার বিলোপ (১৮২৯) * ধর্ম্মসভা (১৮৩০)

* সরকারী তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয়—(১৮৩৫)

* মেডিকেল কলেজ-প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫)

স্যার চার্লস্ মেটকাফ (১৮৩৫-১৮৩৬) * সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮)

* সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-১৮৪২) * জমিদার সভা (১৮৩৮)

* প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২)

লর্ড এলেনবোরা (১৮৪২-১৮৪৪) * তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯)

* সিন্ধুদেশে কোম্পানীর অধিকার (১৮৪৩) * বেঙ্গল ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩)

প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ—(১৮৪৪-১৮৪৮)

প্রথম শিখযুদ্ধ (১৮৪৫-১৮৪৬)

লর্ড ডালহৌসী—(১৮৪৮-১৮৫৬)

* দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ (১৮৪৮-১৮৪৯) * ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশান (১৮৫১)

* দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৫২)

* স্বত্বলোপ নীতি

* পূর্ত্তবিভাগ প্রতিষ্ঠা (Public Works Dept.) * বীটন সোসাইটি (১৮৫১)

* রেলপথ নির্মাণ
* বিধবা বিবাহ-আইন (১৮৫৬) * বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩)
* ধর্মান্তরকারীর পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার
* এডুকেশানাল ডেসপ্যাচ—*The National Association (১৮৫১ শিক্ষাবিভাগ—গঠন সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪)

লর্ড ক্যানিং—(১৮৫৬-১৮৬২)

* ১৮৫৭—কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
* সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৮৫৮)
* রাণীর ঘোষণা-পত্র (১৮৫৮)
* খাজনা আইন —(১৮৫৯)
* ভারতীয় দণ্ডবিধি —(১৮৬০)
* ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন —(১৮৬১)
* হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা —(„)
* ভারতীয় কাউনসিল আইন —(,)

এই পর্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন :—

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই দেখা যায়—খ্রীষ্টান মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্য বেশ ঘাঁটি করে' বসে গেছেন—দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করছেন, খ্রীষ্টধর্মই যে একমাত্র খাঁটি ধর্ম—খ্রীষ্টই মুক্তিদাতা; অন্যান্য ধর্ম—বিশেষতঃ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না—এ সব কথা যথারীতি প্রচার করছেন। পাদ্রীদের এই প্রচার-কার্য্যকে—সংক্ষেপে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান বলা যেতে পারে। যা' হোক, এই অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু-সমাজ নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করে না। রক্ষণশীল অংশ ও প্রগতিশীল অংশ একই-

ভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখালেও প্রতিক্রিয়ার মাত্রা কোন দিক দিয়েই কম হয় না। সমাজের মধ্যে যাঁরা আচার-বিচারে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না তাঁরা নতুন ধর্মনৈতিক চাহিদা অনুসারে আচার-বিচারকে ঢেলে সাজতে চেষ্টা করেন। এই নতুন ধর্মনৈতিক চাহিদার আদর্শ অবশ্য নিরাকার ঈশ্বর-ভজনার আবেগ থেকেই গড়ে উঠে। একদিকে মুসলমানরা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী অন্যদিকে বিজয়ী ইংরাজরাও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। সুতরাং ধর্মনৈতিক আদর্শে সমকক্ষ হ'তে গেলে অবশ্যই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্তন করা এবং উপাসনা-পদ্ধতিকেও পরিবর্তন করা আবশ্যক। হিন্দু-সমাজের এক অংশে নতুন ধর্মনৈতিক আদর্শের জন্য যে চাহিদা দেখা দেয়, রামমোহনের চেতনা আশ্রয় করে' সেই চাহিদাই—প্রথমে "আত্মীয় সভা" (১৮১৫), ক্রমে "ব্রাহ্ম-সমাজ" (১৮২৮) আকারে আত্মপ্রকাশ করে। রামমোহনের "ব্রাহ্মসমাজ"—বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় না হ'লেও, বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের বীজ তার মধ্যে ছিল এবং সেই বীজই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় (১৮৪৩) ব্রাহ্মধর্মের মহীরুহে পরিণত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেদ-উপনিষদ মন্থন করে, ব্রাহ্মধর্ম (১ম ভাগ) সঙ্কলিত হয়, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম (১ম+২য় ভাগ)—প্রকাশিত হয়। এই ভাবে ব্রাহ্মধর্মের উপাসকরা বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হন।

রামমোহন রায়—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে, বাংলাদেশে নতুন ক'রে বেদান্তচর্চ্চার যে সূত্রপাত করেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে এখানে দু'একটা কথা বলা দরকার। একথা খুব কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার ও স্মরণ করতে হবে—রামমোহনই প্রথম উপনিষদ-চর্চ্চার দ্বারা প্রাক্‌পৌরাণিক উপনিষদ যুগের সঙ্গে বাঙালী-মনের সংযোগ সাধন করতে এবং

বৈদান্তিক ধ্যান-ধারণার উচ্চগ্রামে বা ভূমার চেতনায় বাঙালী মানসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় এই সংযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথে এর পরম পরিণতি ঘটেছে।

বেদান্তদর্শনের এই নব অভ্যুদয়ের ফলে, শুধু যে নতুন ধর্মদর্শনের বা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় তা' নয়, নতুন পরাদর্শনও—(অবশ্য পুরাণো দর্শনের জন্য নতুন আবেগ) প্রতিষ্ঠালাভ করে। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পরাদর্শন-সচেতন কবিদের মধ্যে এই নতুন দার্শনিক আবেগেরই রসরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল, বিহারীলালের কাব্যে এই আবেগের প্রাথমিক ও অস্ফুট প্রকাশ পাওয়া যায়, আর রবীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ করা যায় এরই বিস্ময়কর স্ফূর্তি। একথা বিশেষ ভাবেই মনে রাখতে হবে রামমোহনের,—দ্বারকানাথের এবং দেবেন্দ্রনাথেয় নতুন ধর্মোপলব্ধির ও সাধনার ক্রমবিকাশের ধারায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব—সুতরাং ব্রাহ্মধর্মের পটভূমি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা করা চলবে না। ভুললে চলবে না—রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে জগতের ও জীবনের রহস্য দেখেছেন সেই দৃষ্টির ইতিহাস ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তির ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মদর্শনের যে-সব নতুন শিবির গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে বিশেষ একটি শিবিরেই যোগদান করেছেন—এবং সে শিবির সংক্ষেপে বলা যায়—অধ্যাত্মবাদী শিবির—ব্রহ্মবাদী দর্শনের শিবির—ব্রাহ্মধর্মের শিবির। এই শিবির কখনও রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেননি এবং বস্তুবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে এই শিবির রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম ক'রেছেন। থাক, নতুন ধর্মদর্শনের কথা এখন এই পর্য্যন্তই থাক। এইবার জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশের দিকটি লক্ষ্য করা যাক।

যে আবেগ নিয়ে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন তা' বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তার মধ্যে এক ধর্মপাশে সমগ্র ভারতকে বেঁধে দেওয়ার ইচ্ছাও একটা স্থান অধিকার করে আছে এবং সেই ইচ্ছারও পেছনে আছে—ভারতের স্বাধীনতার কামনা। আমরা দেখতে পাই অনেক আগেই রামমোহনের মাঝে পরাধীনতার গ্লানি দেখা দিয়েছে—পৃথিবীর পরাধীন জাতির জন্য তাঁর সমবেদনার অন্ত নেই এবং প্রত্যেক মুক্তি-সংগ্রামকে তিনি অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই পরাধীনতার চেতনা প্রথম দিকে যেভাবে প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক, সেইভাবেই অর্থাৎ—জাতিকে সর্বতোভাবে উন্নত করবার কামনা রূপে—প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীন ইংরেজজাতির মতো, জাতিকে সর্বতোভাবে সম্পন্ন করে' তুলতে না পারলে—জ্ঞান-বিজ্ঞানে শক্তি-সম্পদে বড়ো করে তুলতে না পারলে, মুক্তির সম্ভাবনা নেই—এ ধারণা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। জ্ঞানের আলো চাই এবং নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সে আলো চাই। তারপর, ভারতবাসীর মধ্যে সংহতি চাই—ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্যই সংহতি চাই। এই সময়কার সমস্ত শিক্ষানৈতিক আন্দোলন এবং রাজ-আর্থনৈতিক আন্দোলনগুলি এই সব চাহিদারই অভিব্যক্তি।

জাতির অহং-অভিমান, এই সময়ে ইংরেজদের প্রতিকূল আচরণের ফলে, নানাদিক থেকে পুষ্ট হ'তে থাকে। পাদ্রীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা' প্রথম পর্য্যায়ে, রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' 'ব্রাহ্ম সভা'র ক্রিয়া-কলাপের মাঝ দিয়ে, পরোক্ষভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। পরে, ধর্ম সভা (১৮৩০), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), সর্ব্ব-তত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২), হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (১৮৪৬), পতিতোদ্ধার সভা (১৮৫১), সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪) প্রভৃতি সংগঠনী-মাধ্যমে হিন্দু সংস্কৃতির পুন-রুজ্জীবন প্রচেষ্টার মাঝ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়।

শুধু সংস্কৃতিকে বাঁচানোর তাগিদ থেকেই যে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় তা নয় অন্য দিক থেকেও তাগিদ আসে। অর্থ-নৈতিক ব্যাপারেও ইংরেজের প্রতিকূলতার ধাক্কা জাতির গায়ে এসে লাগে। জমিদার-সভা (১৮৩৮) এই ধাক্কার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া। "নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ"-এর বিরুদ্ধে এবং এই ধরণের অন্যান্য অন্যায় বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য জমিদাররা এই সভা স্থাপন করেন। সংঘবদ্ধ আন্দোলন না হ'লে প্রতিবাদ বা প্রতিকার কোনটাই করা সম্ভব নয় বলেই,—রাধাকান্ত দেব বলেন,—"প্রজালোকের ঐক্য বাক্য হওয়া অতি উচিত"। শাসকদের ক্রিয়াকলাপ পার্লামেণ্টের কাণে পৌঁছে দেওয়ার জন্য—সংঘবদ্ধ আন্দোলন আবশ্যক—এ চেতনা জাতির মধ্যে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠে।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসো-সিয়েশান (১৮৫১), The National Association—প্রভৃতি, সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন থেকেই জন্মলাভ করে। এই সব সভা-সমিতিরই স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়।

জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা যেমন একদিকে ধর্মনৈতিক আন্দোলনের, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের (সতীদাহ-প্রথার বিলোপ + বিধবা বিবাহ আইন) এবং সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের মাঝ দিয়ে ব্যক্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির আন্দো-লনের মাঝ দিয়েও প্রকাশ পায়। হিন্দুকলেজ (১৮১৭), স্কুলবুক সোসাইটি (১৮১৭) স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), The Female juvenile Society for the establishment and support of Bengalee female Schools (১৮১৯,) নানাস্থানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় (১৮৪৯), গ্রামে গ্রামে বাংলা পাঠশালা

প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭) প্রভৃতি—এই সব আন্দোলনেরই বিভিন্ন রূপ বলা যায়।

জাতির এই বিভিন্নমুখী উদ্দীপনাকে সঞ্চারের দায়িত্ব গ্রহণ করে—'সংবাদপত্র'। আগেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে সাহিত্য-রচনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে, বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলির একটি তালিকা দিয়ে, জাতির মানস-মুক্তিতে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে সেইদিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি।

১। দিগদর্শন (মাসিক)—এপ্রিল, (১৮১৮)—শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন

২। সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক)—মে, ১৮১৮—শ্রীরামপুর মিশন
[(১৮১৮—১৮৪১)—(৪২-৪৩)—(১৮৫১—মে—১॥ বৎসর)

৩। বাঙ্গাল গেজেট (সাপ্তাহিক)—১৮১৮, গঙ্গকিশোর ভট্টাচার্য্য
(* রামমোহন রায়ের ' প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুনর্মুদ্রিত
—১৮১৮

৪। গসপেল মাগাজীন (মাসিক)—ডিসেম্বর ১৮১৯

৫। ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সম্বাদ (সেপ্টেম্বর ১৮২১)
(সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত পত্রের জবাবে)

৬। সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক) ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ (ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৭। পশ্বাবলী (১৮২২)—'স্কুল বুক সোসাইটি'-কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৮। সমাচার-চন্দ্রিকা—মার্চ, ১৮২২, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক)—১৪২২ (শ্রীরামপুর)

১০। সম্বাদ তিমির নাশক (সাপ্তাহিক)—অক্টোবর, ১৮২৩

১১। বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)—নীলরত্ন হালদার

১২। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহারদর্পন—১৮২৯

১৩। শাস্ত্রপ্রকাশ (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৩১

* ১৪। সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক)—২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

[দেশ বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য নানা বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহার লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়—বাংলা সাময়িক সাহিত্য —শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১৫। সম্বাদ সুধাকর (সাপ্তাহিক)—১৮৩৮

১৬। জ্ঞানান্বেষণ (সাপ্তাহিক)—১৮ জুন ১৮৩১—১৮৪০

(দক্ষিণানন্দ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক)

১৭। অনুবাদিকা (সাপ্তাহিক)—১৮৩১

[স্বত্বাধিকারী—প্রসন্নকুমার ঠাকুর]

(Roformer—পত্রের প্রবন্ধাদির অনুবাদ

২১। জ্ঞানোদয় (মাসিক)—(ছেলেদের জন্য)

২২। বিজ্ঞান সেবধি (মাসিক)—অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ

(বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে)

২৩। সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২) ঈশ্বর গুপ্ত

২৪। বিজ্ঞানসারসংগ্রহ (পাক্ষিক)—১৮৩৩

২৫। সম্বাদ ভাস্কর (সাপ্তাহিক)—১৮৩৯ [গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য]

২৬। গভর্ণমেণ্ট গেজেট—(১৮৪০)

২৭। বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর (মাসিক) (দ্বিভাষিক পত্র)

রামগোপাল ঘোষ

২৮। বিদ্যাদর্শন (মাসিক) ১৮৪২

অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ

* ২৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (মাসিক)—১৬ আগষ্ট ১৮৪৩

৩০। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক) আগষ্ট ১৮৪৭

৩১। সংবাদ সাধুরঞ্জন (সাপ্তাহিক)—১৮৪৭

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

৩২। সংবাদ রসসাগর—সাপ্তাহিক—১৮৪৯

(ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩। সংবাদ শুধাংশু (সাপ্তাহিক)—১৮৫০

(পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩৪। বিবিধার্থ সংগ্রহ (মাসিক)—১৮৫১ * (সচিত্র মাসিক)

(রাজেন্দ্রলাল মিত্র)

৩৫। সংবাদ বিভাকর—১৯৫২ * মনোমোহন বসু (কবি ও নাট্যকার)

* ৩৬। মাসিক পত্রিকা (মাসিক) আগষ্ট ১৮৫৪

(প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার)

৩৭। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫)

কালীপ্রসন্ন সিংহ

৩৮। এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক) ১৮৫৬

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার—প্রভৃতি যুক্ত ছিলেন)

৩৯। সোমপ্রকাশ (সাপ্তাহিক), নবেম্বর ১৮৫৮

* ৪০। পূর্ণিমা (মাসিক) ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ (কবি বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী)

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোট ১৫১ খানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় এবং এদের প্রত্যেকেই বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতি করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একথা মনে রাখতেই হবে—সাধারণত এই সব পত্রিকা আশ্রয় করেই, বাঙালীর নতুন ভাবনা ও ভাব প্রকাশিত হয়।

এবং এদের সাধনার ফলেই বাংলাভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার উন্নতি ঘটে। সংস্কৃতসাহিত্য, ফারসী-সাহিত্য এবং ইংরেজি-সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম হওয়ায়, বাঙালী-মানসে যে জটিলতা গভীরতা ও বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, এই সব পত্রিকায় বাঙালীমনের সেই সব বৈশিষ্ট্য প্রথম প্রতিফলিত হয়।

এই সময়কার বাংলাসাহিত্যেও যুগ-প্রবৃত্তিগুলি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে। বাংলাভাষাকে সংগঠন করবার জন্য প্রথম দিকে যে চেষ্টা দেখা যায়, তা'তে দেশী-বিদেশী দুই শ্রেণীরই অধ্যবসায় যুক্ত হ'য়েছে। অবশ্য ফোর্ট উইলিয়াম-কলেজের পণ্ডিতদের চেষ্টা বা শ্রীরামপুর মিশনারীদের চেষ্টার প্রেরণা—যে উৎস থেকে এসেছে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চেষ্টা ঠিক সে উৎস থেকে আসেনি। প্রথম পক্ষের উদ্দেশ্য বাংলা শিখিয়ে ভাল শাসক বা পাদরী তৈরী করা, দ্বিতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য—বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করা—বাঙালীর মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকীকরণ করে দিয়ে, কুসংস্কার থেকে বাঙালী-মনকে মুক্ত করা।

এই সময়ে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়, তার মধ্যে বাঙালীমানসের মুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া যাক। এই তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটেছে, তা' আকস্মিক কোন ঘটনা নয় এবং প্রথমার্দ্ধের সৃষ্টি থেকেই তারা প্রাণ-রসের যোগান পেয়েছে। একতলার গাঁথনির ওপরে যেমন করে দোতলা দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি করেই প্রথমার্দ্ধের সাহিত্যের ভিত্তির উপরে দ্বিতীয়ার্দ্ধের সাহিত্য গড়ে উঠেছে।—এই সময়কার রচনার সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

ফোর্ট উলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচনা :—

১। রাম রাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্য (১৮০১)

লিপিমালা (১৮০২)

২। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
হিতোপদেশ (১৮০৮)
রাজাবলি (১৮০৮)
প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)

৩। গোলোকনাথ শর্মা— হিতোপদেশ (১৮০২)

৪। তারিণীচরণ মিত্র— ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (১৮০৩)

৫। চণ্ডীচরণ মুন্শী— তোতা ইতিহাস (১৮০৫)

৬। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)

৭। রামকিশোর তর্কচূড়ামণি—হিতোপদেশ (১৮০৮)

৮। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর— ইংরেজী বাংলা শব্দকোষ
ইংরেজী ওড়িয়া অভিধান

৯। হরপ্রসাদ রায়— পুরুষ পরীক্ষা

১০। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন— পদার্থ কৌমুদী (১৮২১)

(ঘ) শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রচারিত – কেরীর রচনা :—

১। নিউ টেষ্টামেণ্ট—(১৮০১) ২। বাংলা ব্যাকরণ—(১৮০১) ৩। কথোপকথন—(১৮০১) ৪। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—(১৮০২) মোশার ব্যবস্থা) ৫। কৃত্তিবাসের রামায়ণ—(১৮০২) ৬। কাশীরাম দাসের মহাভারত—(১৮০২) ৭। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—দাউদের গীত—(১৮০৩) ৮। ঐ—ভবিষ্যদ্বাক্য—(১৮০৭) ৯। ঐ—য়িশরালের বিবরণ—(১৮০৯) ১০। ইতিহাসমালা—(১৮১২) ১১। বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৫-২৫)

(গ) রামমোহন রায়ের রচনা :—

১। বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৮) ২। বেদান্তসার (১৮০৫) ৩। তলবকার উপনিষৎ (১৮১৬) ৪। ঈশোপনিষৎ (১৮১৬) ৫। উৎসবানন্দ বাগীশের

সহিত বিচার (১৮১৬-১৭) ৬। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৮১৭) ৭। কঠোপনিষৎ (১৮১৭) ৮। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭) ৯। গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮ ১০। সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (১৮১৮) ১১। গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮) ১২। মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯) ১৩। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) ১৪। কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০) ১৫। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০) ১৬। ব্রাহ্মণ সেবধি— ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ (১৮২১) ১৭। চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২) ১৮। প্রার্থনাপত্র (১৮২৩) ১৯। পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩) ২০। গুরুপাদুকা (১৮২৩) ২১। পথ্য-প্রদান (১৮২৩) ২২। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬) ২৩। কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার ২৪। বজ্রসূচী (১৮২৭) ২৫। গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং (১৮২৭) ২৬। ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮) ২৭। ব্রহ্মসঙ্গীত ২৮। অনুষ্ঠান ২৯। সহমরণ বিষয় (১৮২৯) ৩০। গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)

(ঘ) জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের রচনা :—

১। শিক্ষাসার ("বালকদের শিক্ষার্থে") ২। বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকং (১৮১৭) ৩। পত্রের ধারা (১৮২১) ৪। চণ্ডী (১৮১৯) ৫। বাল্মীকিকৃত—রামায়ণ (১৮৩০-৩৫) ৬। মহাভারত (১৮৩৬) ৭। পারসীক অভিধান (১৮৩৮) ৮। বঙ্গাভিধান (১৮৩৮)

(ঙ) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা :—

১। রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪ ?) ২। বাসবদত্তা (১৮৩৬) ৩। শিশুশিক্ষা ১ম-২য় (১৮৪৯), ৩য় ভাগ (১৮৫০)

(চ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনা :—

১। বৈতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) ২। বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (১৮৪৮) ৩। জীবন চরিত (১৮৪৯) ৪। বোধোদয় ৪র্থ ভাগ (১৮৫২)

৫। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১) ৬। ঋজুপাঠ (১ম, ১৮৫১) ২য় ১৮৫২) (৩য় ১৮৫২) ৭। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) ৮। ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩) ৯। শকুন্তলা (১৮৫৩) ১০। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১ম+২য়, ১৮৫৫) ১১। বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫৫) ১২। কথামালা (১৮৫৬) ১৩। চরিতাবলী (১৮৫৬) ১৪। মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ (১৮৬০) ১৫। সীতার বনবাস (১৮৬০)—[আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১), ঐ—১৮৭৩, নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস ১৮৮৮, পদ্য সংগ্রহ ১ম ভাগ ১৮৮৮, ২য় ভাগ ১৮৯০ (সম্পাদিত)—অন্নদামঙ্গল (১৮৪৭), বৈতাল পচ্চীসী (হিন্দী) ১৮৫২, রঘুবংশম্ (১৮৫৩), কিরাতার্জ্জুনীয়ম (১৮৫৩), সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (১৮৫৪-৫৮), 'শিশুপাল বধ' (১৮৫৭), কুমারসম্ভব (১৮৬১), কাদম্বরী (১৮৬২), মেঘদূতম্ (১৮৬৯), উত্তরচরিতম্ (১৮৭০), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮৭১), হর্ষচরিত (১৮৮৩)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)

কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩)
হিতোপদেশ (১৮২৩)
* নববাবুবিলাস (১৮২৫)
দূতীবিলাস (১৮২৫)
নববিবিবিলাস (১৮৩১ ?)
আশ্চর্য্য উপাখ্যান (১৮৩৫)

[সম্পাদিতঃ—]
হাস্যার্ণব
শ্রীমদ্ভাগবত (১৮৩০)
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং
মনুসংহিতা (১৮৩৩)
উনবিংশ সংহিতা (১৮৩৩ ?)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮৩৫)
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত অষ্টবিংশতি-তত্ত্ব নব্যস্মৃতি। (১৮৪৮)

নীলমণি বসাক—(১৮১৮-১৮৬৪)

১। পারস্য ইতিহাস (পদ্য) ১৮৩৪

* ২। আরব্য উপন্যাস (১৮৪৯-৫০)

৩। নবনারী (১৮৫২)

৪। বত্রিশ সিংহাসন (১৮৫৪)

৫। পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬)

৬। ভারতবর্ষের ইতিহাস (১ম-৩য় ভাগ, ১৮৫৭-১৮৫৮)

৭। ইতিহাস সার (১৮৫৯)

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (—? ১৮৬১)

১। শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ

* ২। অপূর্ব্বোপাখ্যান (মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব কর্তৃক রচিত)

৩। শব্দাম্বুধি

* ৪। আরবীয়োপাখ্যান

৫। বেণীসংহার

৬। শ্রীমদ্ভাগবত

৭। নূতন অভিধান

৮। অমরার্থদীধিতি

৯। অন্নদামঙ্গল

১০। হিতোপদেশ

রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪—১৮৬৭)

নীতিকথা (১৮১৮)

* শব্দকল্পদ্রুম (১৮১৯-৫৮)

বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ (১৮২১)

সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ (১৮২৭)

* পদাবলী (১৮৬৪-৬৭)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫)

বালাভাষায়·সংস্কৃত ব্যাকরণ

Vedantic Doctrines Vindicated (১৮৫৪)

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১ম + ২য়)—১৮৫০

ঐ বাংলা অনুবাদ সহ (১৮৫১-৫২)

আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২)

ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০)

প্রভৃতি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

১। কালীকীর্ত্তন (১৮৩৩)—(রামপ্রসাদ সেন-কৃত)

২। কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫)

৩। প্রবোধ প্রভাকর (১৮৫৮)

৪। হিতপ্রভাকর (১৮৬৮—রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত)

৫। বোধেন্দুবিকাশ (১৮৬৩—)

৬। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা (ইং ১৯১৩)

৭। মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সারসংগ্রহ (১৮৬২)

দাশরথি রায় (১৮০৬—৫৭)

* পাঁচালী-পালা (দশখণ্ড)

* কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮০৫—১৮৫৭)
* ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১—১৮৮৯)
* রসিকচন্দ্র রায় (১৮২০—১৮৯৩)
} । পাঁচালী-যাত্রার লেখক ও গায়ক

তারাশঙ্কর তর্করত্ন (—?—১৮৫৮)

১। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা (১৮৫০)

২। পদ্মাবলী (১৮৫২)

৩। কাদম্বরী (১৮৫৪)

৪। রাসেলাস (১৮৫৭)

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৮৯—১৮৮৬)

১। নীতিসার ১ম (১৮৫৬)

২য় „

৩য় (১৮৫৭)

* ২। রোমের ইতিহাস (১৮৫৭)

* ৩। গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৫৭)

প্রভৃতি

অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬)

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ ১৮৫৮)

ধর্মনীতি—(১৮৫৬)

পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬)

চারুপাঠ (১৮৫৯)

১৮০০ থেকে—১৮৫৯ পর্য্যন্ত নাটকের সংক্ষিপ্ত তালিকা

১। কীর্ত্তিবিলাস (১৮৫২)—যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত

২। ভদ্রার্জ্জুন (১৮৫২)—তারাচরণ শিকদার

৩। ভানুমতি চিত্তবিলাস (১৮৫৩)—হরচন্দ্র ঘোষ

৪। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব (১৮৫৪)—রামনারায়ণ তর্করত্ন

৫। বাবু নাটক (১৮৫৪)—কালীপ্রসন্ন সিংহ

৬। অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৫৫)—নন্দকুমার রায়

৭। বিধবা বিবাহ (১৮৫৬)—উমেশচন্দ্র মিত্র

৮। বিধবোদ্বাহ (") —উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

৯। বিধবা মনোরঞ্জন (") —রাধামাধব মিত্র

১০। বেণীসংহার (") —রামনারায়ণ তর্করত্ন

১১। চপলা-চিত্তচাপল্য (১৮৫৭)—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

১২। বিধবা পরিণয়োৎসব (১৮৫৭)—বিহারীলাল নন্দী
১৩। বিক্রমোর্ব্বশী " —কালীপ্রসন্ন সিংহ
১৪। সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮)—কালীপ্রসন্ন সিংহ
১৫। চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা " —মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৬। শর্মিষ্ঠা " —মধুসূদন দত্ত
১৭। কলিকৌতুক " —শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি
১৮। কৌরব বিয়োগ " —হরচন্দ্র ঘোষ
১৯। সপত্নী " —তারকচন্দ্র চূড়ামণি
২০। রত্নাবলী " —রামনারায়ণ তর্করত্ন
২১। বিদ্যাসুন্দর " —যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
২২। মহাশ্বেতা (১৮৫৯)—মণিমোহন সরকার
২৩। বিধবা বিরহ " —শিমূএল পীরবক্স
২৪। মুক্তাবলী " —কালিদাস শর্ম্মা
২৫। নল-দময়ন্তী " —উমাচরণ দে
২৬। মালতী-মাধব " —কালীপ্রসন্ন সিংহ

তালিকার বিস্তার বাড়িয়ে আর লাভ নেই। যে উদ্দেশ্যে তালিকাটি দেওয়া হ'য়েছে তা' আগেই বলা হ'য়েছে; আর একবার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক। ১৮০০ থেকে ১৮৫৯ পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের ভাণ্ডারে যত রচনা সঞ্চিত হ'য়েছে, তাদের জাতি বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির যে অগ্রগতি ঘটেছে তা' আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। এই সময়কার প্রবণতাগুলিই পরবর্তীকালে পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সময়ে ইংরেজ-জাতির ও ইংরেজি সাহিত্যের নিবিড়তর সংস্পর্শে, জাতির মস্তিষ্ক হৃদয় এবং বাসনায় লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন ঘটে।

পরবর্তী কালের সাহিত্যে এই সব পরিবর্তনেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান পরিচয়, সংস্কৃত দর্শন-পুরাণ সাহিত্যের গভীর অনুশীলন, নানাদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে কাব্য-কাহিনীতে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করার উদ্দীপনা—এই সময়কার ব্যক্তিমানসকে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করেছে। একদিকে যেমন ব্যক্তিমানসে ইংরেজি কাব্যের আদর্শে কাব্যরচনার প্রেরণা জাগে, অন্যদিকে তেমনি নানগ্রেন্থের অনুবাদ-সঙ্কলনের ফলে, জাতীয় বিষয়বস্তুর ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। এই সময়কার—সাহিত্যিক প্রবণতাগুলি এইভাবে সাজিয়েগুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে :—

সাহিত্যিক প্রবণতা :—

(ক) গীতি-কবিতাধারা—(শাক্ত—বৈষ্ণব—বাউল)

(খ) নানা বিষয়ী (সাবজেকটিভ) কবিতার উন্মেষ

(গ) কাহিনী-কাব্যের ধারা

(ঘ) গদ্য নিবন্ধের ধারা

(ঙ) (গদ্য) উপাখ্যান-কাব্যের ধারা (দেশী-বিদেশী উপাখ্যান)—

(চ) দৃশ্যকাব্যের ধারা (যাত্রা ও নাটক)

১৮৫৯ থেকে আমরা উল্লিখিত ধারাগুলিরই বিকশিত রূপ দেখতে পাই। ১৮৫৯ থেকে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রতিষ্ঠা-কাল পর্য্যন্ত—(১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাক) বাঙালীর কাব্য-সাধনার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অস্ফুট আবেগই এই সময়ে পরিস্ফুট ও পরিণত অভিব্যক্তির দিকে এগিয়ে গেছে।

১৮৬০—১৮৮০ পর্য্যন্ত, ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক-আর্থ-নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা-পঞ্জী ঃ—

ক্যানিং

(১৮৫৬-৬২)

* বিদ্রোহ দমনের পর অমানুষিক অত্যাচার

* খাজনা আইন-সংস্কার (১৮৫৯)

* বিপ্লব-বিরোধী সামন্তদের নানাভাবে পুরস্কৃত করা

* বেঙ্গল আর্মি'র 'পাঞ্জাব আর্মিতে রূপান্তর

* ইংরেজের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

* সমাজসংস্কারজনক ব্যবস্থার প্রতি সরকারের উদাসীন্য—

* শ্রেণীগত মনোভাবে উস্কানি

* আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা

* সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)

* ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি

* 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিকার

* নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

* ইতালীর স্বাধীনতা (১৮৬১)

* আমেরিকায় দাসপ্রথার অবসান (১৮৬৩)

* সুরাপান নিবারণী সভা (মেদিনীপুর) ১৮৬৪

* উড়িষ্যায়
আগ্রা
পাঞ্জাব
রাজপুতানা
কচ্ছ
} দুর্ভিক্ষ (১৮৬১)

প্রথম লর্ড এলগিন—

(১৮৬২-৬৩)

স্যার জন্ লরেন্স — ১৮৬৪-৬৯

* উড়িষ্যায়, বুন্দেলখণ্ড, রাজপুতানা — দুর্ভিক্ষ
* সেচবিভাগ
* বহির্বাংলায় কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে এই মর্মে আদেশ দেওয়া হয়—শিক্ষিত বাঙালীকে পারতপক্ষে সরকারী কার্য্যে যেন নিয়োগ করা না হয়। (১৮৬৯)
* ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (রুড়কী)
* সুরাপান নিবারণী সভা (কলিকাতা) ১৮৬৪
* জাতীয় গৌরব সভা ১৮৬৬
* হিন্দুমেলা (১৮৬৭)
* অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮)

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২)

* সুয়েজখাল খনন
* এডিনবরার ডিউকের ভারতে আগমন
* সুরেন্দ্রনাথকে ব্যারিষ্টারি করার অনুমতি দানে অস্বীকৃতি
* কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে, রাজস্ববণ্টন বিষয়ে বন্দোবস্ত
* কৃষিবিভাগ স্থাপন
* লোকগণনা
* রেলপথ নির্মাণ
* সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদচ্যুতি
* ব্রাহ্মবিবাহ আইনের জন্য কেশবচন্দ্রের আন্দোলন—আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদ—ফলে
* সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট (১৮৭২)
* ব্রাহ্ম বোধিনী সভা (১৮৭২)
* মেট্রোপলিটান কলেজ (১৮৭২)
* "বঙ্গদর্শন" (পত্রিকা)
* ন্যাশনাল থিয়েটার
* বিজ্ঞানসভা

লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬)

* যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারতে আগমন
* অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত
* বিহারে দুর্ভিক্ষ
* ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫) (শিশির কুমার ঘোষ)
* ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান (ভারতসভা) (১৮৭৬)

* সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগীদের বয়স ২১ হইতে ১৯শে কমানো (১৮৭৬)

* আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশান
* আর্য্যদর্শন (পত্রিকা)-১৮৭৪
* বান্ধব (১৮৭৪)

লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০)

* Royal Titles Act (১৮৭৬) ভিক্টোরিয়ার ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ
* দিল্লীদরবার (১৮৭৭)
* দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ
* ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (১৮৭৮)
* Statutory Civil Service
* Arms Act
* দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮১)

* ১৮৭৭ ভারতসভার উদ্যোগে কলিকাতার টাউনহলে, সার্ব-ভারতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়—(সিভিল সার্ভিস) নিয়ে সভা
* 'সঞ্জীবনী-সভা'
* ভারতী (পত্রিকা) ১৮৭৭
* প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা
* রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মহাহিন্দু সমিতি গঠনের প্রস্তাব (১৮৭৯)

১৮৫৯-১৮৮০ পর্য্যন্ত সাহিত্যের ধারা

(ক) **কালীপ্রসন্ন সিংহ**—[নাটক-নকসা-অনুবাদ]

(১) বাবু নাটক (১৮৫৪)
(২) বিক্রমোর্ব্বশী নাটক (১৮৫৭)
(৩) সাবিত্রী সত্যবান নাটক (১৮৫৮)
(৪) মালতীমাধব নাটক (১৮৫৯)
* (৫) হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা (১৮৬১)
(৬) পুরাণ সংগ্রহ—মহাভারতের অনুবাদ (১৮৬০-৬৬)
(৭) বঙ্গেশ বিজয়—
(৮) শ্রীমদ্‌ভাগবদ গীতা—

(খ) **রামনারায়ণ তর্করত্ন**—[নাটকের ধারা]

পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫৩)	নব নাটক (১৮৬৬)
প্রকাশ্য বক্তৃতা (১৮৫৩)	মালতীমাধব নাটক (১৮৬৭)
কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক (১৮৫৪)	উভয় সঙ্কট (১৮৬৯)
বেণীসংহার নাটক (১৮৫৬)	চক্ষুদান (১৮৬৯)
রত্নাবলী (১৮৫৮)	রুক্মিণী হরণ নাটক (১৮৭১)
অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক (১৮৬০)	স্বপ্নধন নাটক (১৮৭৩)
যেমন কর্ম তেমনি ফল (প্রহসন) ১৮৬৫	ধর্মবিজয় নাটক (১৮৭৫)
	কংসবধ নাটক (১৮৭৫)

প্রভৃতি

(গ) প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ—[গল্প-প্রবন্ধাদির ধারা]

আলালের ঘরের দুলাল (বড় গল্প) ১৮৫৮

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (গল্প) ১৮৫৯

রামারঞ্জিকা (১৮৬০)	অভেদী (অধ্যাত্মিক উপন্যাস) ১৮৭১
কৃষিপাঠ (প্রবন্ধ) ১৮৬১	ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত ১৮৭৮
গীতাঙ্কুর (গীত সংগ্রহ) ১৮৬১	আধ্যাত্মিকা (উপন্যাস) ১৮৮০
যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ) ১৮৬৫	বামাতোষিণী (গল্প) ১৮৮১

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা (১৮৭৯)

(ঘ) মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) [মহাকাব্য-নাটকাদির ধারা]

শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯)	ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)
একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০)	কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১)
বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)	বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)
পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০)	চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ১৮৬৬
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)	হেকটর বধ (১৮৭১)
মেঘনাদবধ কাব্য [(১ম + ২য় ১৮৬১)]	মায়াকানন (১৮৭৪)

(ঙ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৮) [অখ্যায়িকা কাব্যের ধারা]

ঋতু সংহার (১৮৫১ ?)

বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৫২)

ভেক মূষিকের যুদ্ধ (১৮৫৮)

পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) * (টড্ রচিত রাজস্থান থেকে কাহিনী সংগৃহীত)

শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তণ (১৮৬০)

কর্ম্মদেবী (১৮৬২)—(রাজস্থানের সতীবিশেষের চরিত্র)

শূরসুন্দরী (১৮৬৮)—(রাজস্থানীয় বীরবালার চরিত্র)

ইউরোপ ও এশ্যাখণ্ডস্থ প্রবাদমালা (১৮৬৯)

কুমার সম্ভব (১৮৭২)

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯, প্রভৃতি

(চ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)

* [বিবিধার্থ সংগ্রহ (মাসিক)—১৮৫১]
* রহস্য সন্দর্ভ (") —১৮৬৩

প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪)

শিল্পিক দর্শন (১৮৬০)

শিবাজীর চরিত্র (১৮৬০)

মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১), ব্যাকরণ প্রবেশ (১৮৭২) প্রভৃতি এবং নানাবিধি সম্পাদিত গ্রন্থ।

(ছ) **ভূদেব মুখোপাধ্যায়** (১৮২৭-১৮৯৪) [প্রবন্ধ ও ইতিহাস সাহিত্যের ধারা]

শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬)

ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) *(Romance of History) অবলম্বনে

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—১ম ভাগ—১৮৫৮

২য় ভাগ—১৮৫৯

পুরাবৃত্তসার (১ম খণ্ড) ১৮৫৮ আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫)

ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২) বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (১৮৯৫)

ক্ষেত্রতত্ত্ব (১৮৬২) স্বপ্নলব্ধ ভারত বর্ষের ইতিহাস ১৮৯৫

রোমের ইতিহাস (১৮৬৩) বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯০৪)

পুষ্পাঞ্জলি (১ম ভাগ) ১৮৭৬ বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ) ১৯০৫

পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২) দিনলিপি—(১৮৭৬)

সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২)

* (শিক্ষাদর্পণ এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেবের প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়)

(জ) **রামগতি ন্যায়রত্ন** (১৮৩১-১৮৯৪) [আখ্যায়িকা ও ইতিহাস]

কলিকাতায় প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস (১৮৫৮)

বস্তুবিচার (১৮৫৯) * গোষ্ঠীকথা (মজলিসি গল্প) ১৮৭৮

বাঙ্গলার ইতিহাস (১৪ ভাগ)—১৮৫৯

রোমাবতী (আখ্যায়িকা)—১৮৬২ কুপিত কৌশিক নাটক (১৮৭৮)

নীতিপথ (১৮৮১)

বাঙ্গালা ব্যাকরণ—(১৮৬৪) রামচরিত (১৮৩৩)

ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস (১৮৬৫) * ইলছোবা (স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান)

বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭২)

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৭৫)

(ঝ) **কাঙাল হরিনাথ মজুমদার** (১৮৩৩-১৮৯৬) [বাউল-ধারা]

কাঙাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী (প্রকাশিত ১২৯৩-১৩০০)

* [ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল—১২৮৭ সালে অর্থাৎ ১৮৮০ সালে গঠিত) কাঙ্গালের ভাব-গানের প্রভাব বাংলার পরবর্ত্তী গীতিকবিদের উপর, বিশেষতঃ দার্শনিক কবিদের উপর কতখানি পড়েছে, আলোচ্য বিষয়। বিহারীলালের উপর এই সব বাউলগানের প্রভাব যথেষ্ট—বিহারীলাল শিষ্য রবীন্দ্রনাথের উপরেও বাউলগানের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কাঙ্গালের এই গানটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ'—সাধনার আবেগের সঙ্গে কাঙ্গালের আবেগের যোগ আছে—

অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে প্রাণ আমার দিবানিশি,
কাঁদলে নির্জ্জনে ব'সে আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি ;
সে যে কি অতুল্য রূপ নয় অনুরূপ শত শত সূর্য্যশশী
যদি রে চাই আকাশে মেঘের পাশে সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায় ঝলক লাগে হৃদে আসি
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি বেঁধে রাখি চিরদিন সেই রূপশশী
ওরে তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে কুবাসনা মেঘরাশি
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি
আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তায় প্রাণভরে কই ভালবাসি"

* বাউল-রবীন্দ্রনাথ এই সব কাঙ্গাল-ফিকিরদেরই ভাব-শিষ্য ॥]

(ঞ) **কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী** (১৮৩৫—১৮৯৪) [আত্মবিষয়ী কবিতার ধারা]

স্বপ্নদর্শন (গদ্য রূপক কাব্য) ১৮৫৮

সঙ্গীতশতক (১৮৬২)

বঙ্গসুন্দরী (কাব্য) ১৮৭০ [১২৭৪ ও ৭৬ সালের 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত]

নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০)

বন্ধুবিয়োগ (খণ্ডকাব্য) :৮৭০ (অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত ১২৬৬ সালে)

প্রেমপ্রবাহিনী (১২৭৬ সালে রচিত; ১৮৭০ সালে প্রকাশিত)

* সারদামঙ্গল (১২৭৭ রচনারম্ভ, ১২৮১ আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত)—১৮৭৯

* মায়াদেবী (১২৮৯ শ্রাবণ, "ভারতী")

* শরৎকাল (প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাসঙ্গীত) (১৮৮৯ কার্ত্তিক „)

ঐ— নিশীথ সঙ্গীত ও (নিশান্ত সঙ্গীত) "প্রয়াস"—১৮৯৯ মে-জুন

* ধূমকেতু—(প্রয়াস, সেপ্টেম্বর ১৮৯৯)

দেবরাণী—(ভারতী ভাদ্র, ১২৮৯)

* বাউল বিংশতি (১২৯৪ সালে "কল্পনা"য় প্রকাশিত)

* সাধের আসন "মালঞ্চ"—১২৯৫-৯৬—

* কবিতা ও সঙ্গীত

[কবি বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ গুরু বলে স্বীকার করেছেন । এই স্বীকৃতিটুকু শুধু মুখের কথা বা কথার কথাই মাত্র নয়। একথা আমি আগেই বলে এসেছি যে বিহারীলালই আধুনিক যুগের প্রথম রোমাণ্টিক গীতি-কবি এবং অন্যতম দার্শনিক-কবি। তাঁর কবিতাতেই প্রথম সমগ্র বিশ্ব-প্রকাশকে একের লীলারূপে উপলব্ধির আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। বিহারী-লালে এই উপলব্ধির প্রারম্ভ, রবীন্দ্রনাথে এই উপলব্ধির বিরাট বিকাশ। বিহারীলালের সারদাই—যিনি শুধু কবি-জীবনেরই প্রকাশের প্রেরণামাত্র (inspiration) নন, সমগ্র বিশ্বের মূলীভূত প্রকাশ শক্তি—creative force—যে শক্তির মধ্যে জড়জগৎ ও প্রাণেরজগৎ, চেতনার জগৎ—সমস্ত জগতের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' কল্পনায়, 'লীলাসঙ্গিনী'-কল্পনায় নতুনরূপে ব্যক্ত হয়েছেন। সারদার সঙ্গে মিলন—বিরহের আর্ত্তি অবলম্বনে প্রেমলীলার যে কল্পনার জগৎ বিহারীলাল গড়েছেন, পূর্ব্ববর্তী কবিকল্পনার জগৎ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। সে

এমন এক উচ্চগ্রামে-বাঁধা সুরের মূর্চ্ছনা যে নতুন প্রাণ দিয়ে ছাড়া তা ধরবার উপায় নেই। কল্পনার 'নানাখানা হওয়া'র—উধাও-হয়ে-যাওয়ার এমন বিলাসবৈচিত্র্য আগের আর কোনো কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। রোমান্টিক কবির অপরূপকে রূপ দেওয়ার ব্যাকুলতা, অনির্বচনীয়কে বচন দেওয়ার আকুতি, সীমার বাঁধনে আবদ্ধ থাকার গভীর বেদনা ও অতৃপ্তি, জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে ভূমাকে পাওয়ার উদ্দাম আবেগ—এ সব লক্ষণই বিহারীলালের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাবে বিহারীলাল আধুনিক যুগের প্রথম রোমাণ্টিক। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি তাঁরই ভাবশিষ্য। বিহারীলালের ভাব-ভাষা-কল্পনার কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ উপেক্ষণীয় নয়]

(ট) **দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর** (১৮৪০-১৯২৬) [দার্শনিক প্রবন্ধ ও রূপক কাব্যের ধারা]

মেঘদূত (পদ্যানুবাদ) ১৮৬০
ভ্রাতৃভাব (প্রবন্ধ-গ্রন্থ) ১৮৬৩
* তত্ত্ববিদ্যা—(১ম—৪র্থ খণ্ড) ১৮৬৬-৬৯
* স্বপ্নপ্রয়াণ (রূপক কাব্য) ১৮৭৫
প্রভৃতি [অন্যান্য রচনা—১৮৮৫—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত]

(ঠ) **রাজনারায়ণ বসু** (১৮২৬—১৮৯৯) [দার্শনিক প্রবন্ধের ধারা]

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা—প্রথমভাগ (১৮৫৫)
ঐ —দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭০)
ব্রহ্মসাধন—(১৮৬৫)
ধর্মতত্ত্বদীপিকা (১ম) ১৮৬৬
ঐ (২য়) ১৮৬৭
আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত (১৮৬৭)
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ? (১৮৭৩)

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩)

* সে কাল আর একাল (১৮৭৪)

ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব (১৮৭৫)

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা—১৮৭৮

বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (১৮৮৭)

প্রভৃতি……

(ঙ) **কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৩৮) [কাব্য-মহাকাব্যের ধারা]

চিন্তাতরঙ্গিনী (১৮৬১)

বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪)

নলিনী বসন্ত নাটক (১৮৬৮)

কবিতাবলী (১৮৭০)

* বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড)—১৮৭৫

আশাকানন [রূপক-কাব্য (১৮৭৬)]

বৃত্রসংহার (২য় খণ্ড)—(১৮৭৭)

ছায়াময়ী (ডিভাইনা কমেডিয়া অবলম্বনে) (১৮৮০)

দশমহাবিদ্যা (গীতিকাব্য)—১৮৮২

হুতোম প্যাঁচার গান (১৮৮৪)

নাকে খৎ (১৮৮৫)

রোমিও জুলিয়েৎ (১৮৯৫)

(চ) ***বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (১৮৩৮-১৮৯৩) [উপন্যাস প্রবন্ধের ধারা]

১। ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস (১৮৫৬)

২। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)

৩। কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)

৪। মৃণালিনী (১৮৬৯)

৫। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)

৬। ইন্দিরা (১৮৭৩)

৭। যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)

৮। লোকরহস্য (১৮৭৪)

৯। বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫)

১০। চন্দ্রশেখর ১৮৭৫)

১১। রাধারাণী (১৮৭৫)

১২। কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)

১৩। বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬)

১৪। রজনী (১৮৭৭)

১৫। কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)

১৬। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৭৯)

১৭। সাম্য (১৮৭৯)

১৮। রাজসিংহ (১৮৮২) ২৪। বিবিধ প্রবন্ধ (বিবিধ

১৯। আনন্দমঠ (১৮৮২) সমালোচনা+প্রবন্ধ পুস্তক)—

২০। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ১৮৮৪ (১৮৮৭)

২১। দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) ২৫। ধর্মতত্ত্ব ১ম ভাগ—(১৮৮৮)

২২। কৃষ্ণচরিত্র (১ম ভাগ—১৮৮৬) ২৬। বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ—১৮৯২

২৩। সীতারাম (১৮৮৭) প্রভৃতি

(গ) **কবি নবীনচন্দ্র সেন** [মহাকাব্যের ধারা]

অবকাশরঞ্জিনী (১ম ভাগ)—১৮৭১ * কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩)

পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫) অমিতাভ (১৮৯৫)

ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭) প্রভাস (১৮৯৬)

অবকাশরঞ্জিনী (২য় ভাগ)—১৮৭৮ শুভনির্মাল্য (নাটিকা) (১৯০০)

রঙ্গমতী (১৮৮০) ভানুমতী (উপন্যাস)

রৈবতক (১৮৮৭)

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (১৮৮৯) আমার জীবন (১৯০৮-১৯১৩)

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১৮৮৯) অমৃতাভ— ১৯০৯

খ্রীষ্ট (১৮৯১)

প্রবাসের পত্র (১৮৯২)

(ঙ) **তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** (১৮৪৩—১৮৯১) [সামাজিক উপন্যাসের ধারা]

* স্বর্ণলতা (১৮৭৪)—(সামাজিক উপন্যাস) * হরিষে বিষাদ (১৮৮৭)

* ললিত সৌদামিনী (গল্প) ১৮৮২ * তিনটি গল্প (১৮৮৯)

* অদৃষ্ট (১৮৯২)

(থ) রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) [উপন্যাস সাহিত্যের ধারা]

বঙ্গবিজেতা	(১৮৭৪)	সংসার	(১৮৮৬)
মাধবীকঙ্কণ	(১৮৭৭)	সমাজ	(১৮৯৪)
জীবনপ্রভাত	(১৮৭৮)	প্রভৃতি—	

(দ) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ [জীবনচরিতের ধারা]

* [আর্য্যদর্শন, এপ্রিল ১৮৭৪—১৮৮৫]

জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত (১৮৭৪)

ম্যাটাসিনির জীবনবৃত্ত (১৮৮৬)

১৮৮০-পরবর্ত্তী {

* হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলী	(১৮৮১)
আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা	(১৮৮৩)
সমালোচনা-মালা	(১৮৮৫)
ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত	(১৮৮৬)
প্রাণোচ্ছ্বাস	(১৮৮৯)
কীর্ত্তিমন্দির	(১৮৯০)
গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত	(১৮৯০)

প্রভৃতি

উল্লিখিত তালিকার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে কাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস, জীবনচরিত, অনুবাদ রসরচনা প্রবন্ধ—সাহিত্যের নানা বিভাগে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। নাটকের ঘরেও কম জমা হয়নি। ১৮৬০ থেকে ১৮৮০ পর্য্যন্ত—এই বিশ বছরে প্রায় তিনশত সাড়ে তিনশত নাটক লেখা হয়। মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস কর, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় * মনোমোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর *, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, হরিমোহন কর্মকার, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, মীর মশারফ হোসেন, উপেন্দ্রনাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল রায়,

অমৃতলাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব হালদার, অক্ষয় কুমার চৌধুরী, * গিরিশচন্দ্র ঘোষ, * অতুলকৃষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় আরো অনেকে নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন এবং পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, নানাজাতীয় নাটকে, নানাবিধ সমস্তাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বলা বাহুল্য এই সমস্ত সৃষ্টির প্রকৃতি সম্যক বুঝতে গেলে, তখনকার রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক, নৈতিক শিক্ষানৈতিক দার্শনিকএবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের—এককথায় জাতীয় আবেগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতেই হবে। আগে যে রাজ-আর্থনৈতিক—সামাজিক ঘটনার পঞ্জী দেওয়া হয়েছে, তা' থেকে জাতির পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়ার—feeling এবং willing এর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই পরিচয়টুকু নিতান্তই মোটামুটি। সমগ্র পরিচয় পেতে হ'লে—জাতির knowing-feeling willing এর পুরো হিসাব-নিকাশ করা দরকার। আর তা' করতে হ'লে, শুধু ইংরেজ শাসন-শোষণের এবং জাতির প্রতি-ক্রিয়ার তথ্য দিলেই চলবে না, ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-রাজনীতিদর্শন নীতিদর্শন কি ক'রে আমাদের চিন্তাকে ও বাসনাকে প্রভাবিত করেছে তার হিসাবও দিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না—আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ইউরোপের ও অন্যান্য মহা-দেশের ইতিহাস অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছে।

ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ঘটায়, জাতির একাংশে মানসিকবৃত্তির যে উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে তা' শুধু চৈতন্যশক্তির জড়তা দূর করেই ক্ষান্ত থাকে নি, জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির তথা মুক্তির জন্যও প্রেরণা যুগিয়েছে। ইংরেজিশিক্ষা জাতির চিন্তাশক্তি ও কল্পনা-শক্তিকে যেমন উদ্দীপিত করতে থাকে, তেমনি পুষ্ট করতে থাকে জাতির

আত্মাভিমানকেও। ইউরোপ থেকে শুধু মালবোঝাই জাহাজই আসেনি, সেই জাহাজেই এসেছে ইউরোপের মেধা ও কবি-কল্পনা—দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস—কাব্য—মহাকাব্য—নাটক—উপন্যাস জীবনচরিত প্রভৃতি নানা রকমের বই। আরো এসেছে নানা সাময়িক পত্র—নানা সংবাদ ও ভাবান্দোলনের বাহক হ'য়ে। এমনি করে ইউরোপের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের কূলে এসে আছড়ে পড়েছে, বাঙালীর মনে-প্রাণে অনুকম্পন জাগিয়েছে। সাগর-মহাসাগরের দুস্তর ব্যবধানের বাধা অতিক্রম ক'রে দুই মহাদেশের এই সান্নিধ্য, পারস্পরিক বুঝাপড়ার চেষ্টা, ভাব-ভাবনার ক্রমবর্দ্ধমান আদান-প্রদান, উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এই হিসাবেই উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের চিন্তায়, বিশেষতঃ দার্শনিক চিন্তায় যেমন ভারতীয় চিন্তার ধারা গিয়ে মিশেছে, ভারতের চিন্তায় ও কল্পনায় তেমনি ইউরোপীয় ভাবনা-কল্পনা অনুপ্রবেশ করেছে। এই অনুপ্রবেশের ফলেই, ইউরোপীয় চিন্তাদর্শ, শিল্পাদর্শ, সাহিত্যাদর্শ,—এমনি নানা আদর্শের দ্বারা আমাদের জীবন প্রভাবিত হ'য়েছে, ইউরোপের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সঙ্গে, আমাদের মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং তার ফলেই আমাদের দেশে 'নবজাগরণ' সম্ভব হ'য়েছে—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতো প্রতিভার জন্ম হ'য়েছে। এই যুগের এবং পরবর্ত্তী যুগের প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানস এই কারণেই, দুর্জ্ঞেয়ভাবে জটিল। প্রত্যেকেই এমন এক একটি শক্তিক্ষেত্র, যেখানে নানা মহাদেশের এবং নানা যুগের চিন্তা ও অনুভবের আবেগ এসে মিশেছে। তাই কত দিক থেকে কত ধারা এসেছে, কোন্‌টা কার মধ্যে কতখানি বেঁকেচুরে গেছে, কোন্‌টা গৃহীত, কোন্‌টা বর্জ্জিত হ'য়েছে—এ সব না জানলে ব্যক্তি-মানসের কিছুই জানা হবে না। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকে না জানতে পারলে—তার দার্শনিক, নৈতিক ও শৈল্পিক

সাধনার পরিচয় না জানলে,—বিংশ শতাব্দীরও বটে—বাংলার মনন-অনুভব—ইচ্ছার সম্যক-পরিচয় পাওয়া যাবে না। এই কারণেই এখানে সংক্ষেপে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভাবধারা সম্পর্কে সামান্তভাবে কয়েকটি কথা বলা নিতে চাই।

বলা যেতে পারে—সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই আমরা নতুন জগতে পদার্পণ করেছি এবং সেই জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছে—বিজ্ঞান। কোপার-নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) এবং নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), প্রধানত এই চার-জনের সাধনায়, এই জগতের দ্বার উন্মুক্ত হ'য়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী শুধু যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গতি-বিজ্ঞানের জন্তই বিখ্যাত হয় তা' নয়, এই শতাব্দীর একটু আগেই ১৫৯০ খ্রীঃ অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। Lipperslıey-নামক জনৈক ওলন্দাজ ১৬০৮ খ্রীঃ দূরবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার করেন, গ্যালিলিও তাপমানযন্ত্র এবং তাঁর ছাত্র টোরিসেলি বায়ুচাপযন্ত্র আবিষ্কার করেন। Guericke (১৬০২-১৬৮৬)—পাম্প-যন্ত্র (air pump) আবিষ্কার করেন। বলা বাহুল্য এই সকল যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ প্রশস্ততর হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ঘটে। "১৬০০ খ্রীঃ গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩),—চৌম্বক সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন। হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭)—রক্ত-সঞ্চালন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং ১৬২৮ খ্রীঃ পুস্তকাকারে তা' প্রকাশ করেন। লিবেনহেক (Leeuwenhoek) (—১৬৩২-১৭২৩) "spermatozoa" এবং 'Protoza" আবিষ্কার করেন। এই শতাব্দীরই রবার্ট বইল (১৬২৭-৯১)—রসায়নশাস্ত্রের জনক বলে' এখনও সম্মানিত। ডেকার্টে (১৫৯৬-১৬৫০) ও অন্যান্য গণিতজ্ঞরা "কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি" এবং নিউটন ও লাইবনীৎস্ (১৬৪৬-১৭১৬) ডিফারেনশিয়াল এবং ইন্টিগ্রাল ক্যাল-কুলাস্ আবিষ্কার করেন তথা উচ্চতর গণিতের পথ উন্মুক্ত করে দেন।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে—বার্ট্রাণ্ড রাসেল মহাশয়ের ভাষায় বলা যাক—'The reign of law had established its hold on men's imaginations making such things as the magic and sorcery impossible. In 1700 the mental outlook of educted men was completly modern, in 1600 except among a very few, it was still largely medieval (History of western philosophy—558)। এই সব আবিষ্কারের ফলে, দার্শনিক দৃষ্টিতেও পরিবর্ত্তন আসে। প্রথমত—পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে দৈবনিয়ন্ত্রণের হাত সরে যায়। দ্বিতীয়তঃ—মানুষের মর্য্যাদা সম্পর্কে মধ্যযুগে যে ধারণা ছিল তাতেও পরিবর্ত্তন আসে। পৃথিবীকে কেন্দ্রীয় বলে' যতখানি মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছিল—তা' আর দেওয়া হয় না। দার্শনিক হবস্ (১৫৮৮)—"লেভিয়াথান" গ্রন্থে (১৬৫১) বস্তু-বাদের গোড়া পত্তন করেন। দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪), বার্কলে প্রমুখ মনীষীদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার প্রভাবে—রাজনীতিদর্শনে জ্ঞান-দর্শনে স্মরণীয় সিদ্ধান্তরাজি উপস্থিত হয়। লকের "এছে কনসার্ণিং হিউমান আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং" (১৬৮৯), "লেটার্স অন্ টলারেশান" (১৬৮৯, ৯০, ৯২,) প্রভৃতি রচনার প্রভাব বহুব্যাপক। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-চিন্তায় লকের প্রভাব তো অসামান্য।

অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞান (নৈয়ায়িক ও অঙ্কের জ্ঞান বাদ) সম্ভব নয়—সহজাত জ্ঞান বলে কোন জ্ঞান থাকতে পারে না—এই মতবাদ—ইংরেজী-দর্শনে যাকে "এম্পিরিসিজিম্" বলে—লকই প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতবাদের তাৎপর্য্য সহজেই অনুমেয়। তারপর—রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চুক্তির ফল বলা এবং দৈব বিধান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে লৌকিক ব্যবস্থার অধীন ব'লে ঘোষণা করা অবশ্যই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। লকের অন্যতম ভাবশিষ্য, রুশোর হাতে এই 'চুক্তি'র সিদ্ধান্ত কিভাবে বিপ্লবের ইন্ধনে

পরিণত হয়েছে তা' সকলেরই জানা আছে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম দর্শনিক হেলভেটিয়াস্ (১৭১৫-৭১) অভিজ্ঞতাবাদের আলোকে, সামাজিক ব্যক্তির পরস্পর পার্থক্যের কারণ দেখেন—শিক্ষার সুযোগের অভাবের বা সদ্ভাবের মধ্যে। অর্থাৎ সুযোগ সমান হ'লে সকলেই বুদ্ধির দিক দিয়ে সমান হ'য়ে যাবে। এক চিন্তা কতভাবেই না প্রভাব বিস্তার করেছে!

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির ফলে, বস্তুবাদী চিন্তা আরো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে এবং সমাজ-দর্শন নীতিদর্শন সবক্ষেত্রেই প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করে। দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬)—লকের অভিজ্ঞতাবাদকে পরিণত রূপ দান করেন। তাঁর "ট্রিটিজ অফ হিউম্যান নেচার" "১৭৩৯-৪০) "এঙ্কোয়েরি ইণ্টু হিউমান আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং"—(এই গ্রন্থ পাঠ করে কাণ্টের গোড়ামির নিদ্রা কেটে যায়!), "ডায়ালোগ্স কনসার্নিং নেচারাল রিলিজিয়ন (১৭৭৯-প্রকাশিত), "এছে অন মিরাকেলস্"—বস্তুবাদী দর্শনের ভিতকে আরো শক্ত করে তোলে। আত্মার অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দিয়ে আত্মাকে কতকগুলি প্রতীতির (perceptions) সমষ্টি বলে' ঘোষণা করা অবশ্যই দুঃসাহসিক কাজ। লা মেত্রিয়ে (১৭০৯-৫১), হেলভেটিয়াস (১৭১৫-৭১), হল-ব্যাক্ (১৮২৩-৮৯), ডেনিস দিদেরো (১৭১৩-৮৪), দ'-আলেমবার্ত, ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), রুশো (১৭১২-৭৮) প্রভৃতির রচনা ধর্ম্মনৈতিক-রাজ-নৈতিক দর্শনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। লা মেত্রিয়ে—"ন্যাচারাল হিষ্ট্রি অফ্ দি সোল্" লিখে পদচ্যুত এবং "ম্যান এ মেসিন" লিখে নির্ব্বাসিত হন। সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে এবং মানুষকে যন্ত্র বলা—আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা অবশ্যই যুগান্তকারী বৈপ্লবিক চিন্তা। হেলভেটিয়াসের—"অন্ ম্যান"ও নীতি-দর্শনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। তাঁর মতে বিবেক ভগবানের প্রেরণা বা বাণী নয়, পুলিশের ভয়—নানাদিক থেকে নানা নিষেধ এসে জমে

জন্মে বিবেক তৈরী হয়; সুতরাং নীতি-দর্শনকে ধর্মশাস্ত্রের উপর রাখলে চলবে না—সমাজদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হলব্যাকের—"সিস্টেম অফ নেচার" এবং দিদেরোর রচনাবলীও মারাত্মক সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। হলব্যাক বলেছেন—"গোড়ায় ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাবো মানুষের অজ্ঞতা ও ভয় থেকে দেবতার উৎপত্তি, কল্পনা ও ছলনা দেবতাকে নানা মাহাত্ম্যে ভূষিত করেছে, দুর্ব্বলতা পূজা যুগিয়েছে, বিশ্বাস দেবতাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, প্রথা সম্মান দিয়ে চলেছে আর শাসকরা লোক ভুলিয়ে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য দেবতাকে জীয়িয়ে রেখেছে।" সাংঘাতিক কথা নয় কি? দিদেরো আরো সাংঘাতিক কথা বলেছেন—"যতদিন পর্য্যন্ত না শেষ পুরোহিতের নাড়ী-ভুঁড়ি দিয়ে শেষ রাজাকে ফাঁসি দিয়ে মারা হয়, ততদিন মানুষের মুক্তি নেই"। স্বর্গকে শেষ করতে না পারলে মর্ত্তকে প্রকৃতিস্থ করা যাবে না; আর তা করতে হ'লে শিল্পের ও জ্ঞানের বিস্তার করতে হবে—শিল্প আনবে সুখ-শান্তি, জ্ঞান আনবে—নতুন জীবনদর্শন, নতুন নীতিবোধ।

১৭৫২—১৭৭২ পর্য্যন্ত, "এনসাইক্লোপেডিয়া"র—নানা খণ্ডের মাঝ দিয়ে, দিদেরো এলাম্‌বার্ট প্রভৃতি এই ধরণের প্রচলিত ধর্ম-বিরোধী কথা প্রচার করেছেন। ভলটেয়ারও এই গোষ্ঠীর প্রধান পাণ্ডা। তাঁর "ফিলসোফিক ডিকসনারি" সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের বিরাট এক কীর্ত্তি। এই গোষ্ঠীর সাধনার মূলমন্ত্র—চিন্তার স্বাধীনতা—যুক্তির মুক্তি। এঁদের বিশ্বাস—যুক্তি মুক্ত হ'লেই মানুষের বহুবাঞ্ছিত "ইউ-টোপিয়া" প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্মশাস্ত্রের অচলায়তন ধ্বসিয়ে দিয়ে যুক্তিকে মুক্ত করতে পারলেই, সমাজে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের রচনাতেও যুক্তির বিজয়-অভিযান ঘোষিত হ'য়েছে। তাঁর "রিলিজিয়ন উইদিন দি লিমিট্‌স্ অফ পিয়োর রিজিন"—দুঃসাহসী সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। এতে তিনি

গীর্জা, পাদরী, অলৌকিক রহস্য, বাইবেল—ধর্মের সব কয়টা বিষদাঁত ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর "ক্রিটিক অফ পিয়োর রিজিন" "ক্রিটিক অফ প্রাকটিকাল রিজিন" এবং "ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট"—কম লোকেই পড়তো এবং কম লোকেই বুঝতো বলে' রাজরোষে পড়েনি—কিন্তু ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ খুবই স্পষ্ট ও সরলভাষায় লেখা বলে' রেহাই পায়নি। কাণ্টের উপর পরোয়ানা জারি হয়েছিল—"Our highest person has been greatly displeased to observe how you misuse your philosophy to undermine and destroy many of the most important and fundamental doctrine of the Holy Scriptures and of Christianity. We demand of you immediately an exact account and expect that in future you will give no such cause of offense......It you coutinue to oppose this order you may expect unpleasant consequences." কাণ্ট উত্তরে জানিয়েছিলেন—'প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই স্বাধীন চিন্তার এবং তা প্রকাশ করার অধিকার থাকা উচিত; তবে, এই রাজার শাসনকালে আমি আর কোন কথা বলব না।' বুড়ো বয়েসে এ ছাড়া আর কিই বা তিনি করতে পারেন? যা' বলার তা' আগেই তিনি বলে' সেরেছেন। সুতরাং আর কিছু বলবো না একথা বলা না-বলা সমান কথা।

অজস্র বৈপ্লবিক চিন্তার স্ফুলিঙ্গ—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আবেগ, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ফরাসীবিপ্লবের আগুন—উনবিংশ শতাব্দীর হাতে পৌঁছে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী বিদায় নেয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদীদর্শনের বিজয়-অভিযানও দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'তে থাকে। শতাব্দীর গোড়াতেই—১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লামার্ক তাঁর "ফিলসোফিয়ে জুলজিকি" গ্রন্থে বিবর্তন-বাদের ভিত্তি স্থাপনা করেন। অবশ্য আরো পঞ্চাশ বছর পরে—

ডারুইন এসে ভিত্তিকে পাকা করে, বিবর্ত্তনবাদের প্রাসাদ গেঁথে তোলেন তাঁর "অরিজিন অফ স্পিশিজ" গ্রন্থে (১৮৫৯) এবং "ডিসেণ্ট অফ ম্যান গ্রন্থে (১৮৭২)। হাক্সলির "ম্যানস্ প্লেস ইন নেচার" (১৮৬১), হার্বার্ট স্পেন্সার মহাশয়ের—'প্রিন্সিপিল্ অফ বায়োলজি' (১৮৭২) বিবর্ত্তনবাদকে জিদের সঙ্গে এবং জোর গলায় প্রচার করে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক শেষ হ'তে, না হ'তে বিবর্ত্তনবাদ—সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদ—শিক্ষিত মহলে ব্যাপক প্রতিষ্ঠালাভ করে। শুধু যে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিবর্ত্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তা' নয়। শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই ভূ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও, বিবর্ত্তনবাদী ধারণা দেখা দেয়। সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাদ পড়ে না। পঞ্চম দশকে মার্কস বস্তুবাদীদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ-ব্যবস্থার উৎপত্তি—স্থিতি-গতি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। **১৮৫৫ খ্রীঃ হার্বার্ট স্পেন্সার—"প্রিন্সিপিল অফ সাইকোলজি" গ্রন্থে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিবর্ত্তনবাদ প্রয়োগ করেন।**

শতাব্দীর চতুর্থ-পঞ্চম দশকে (১৮৩০—১৮৪২) প্রত্যক্ষবাদের প্রতিষ্ঠাতা আগষ্ট কোম্‌তে, পাঁচখণ্ড—"পজিটিভ ফিলসফি" লেখেন এবং (১৮৫১-১৮৫৪)—এর মধ্যে চারখণ্ড "পজিটিভ পলিটি" রচনা শেষ করেন। কোম্‌তে দর্শনকে বিজ্ঞানের সমান পংক্তিতে নামিয়ে আনেন। কোম্‌তের কাছে—দর্শন, সমস্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তরাজির বা যুক্তির ভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, হব্‌স-লক-হিউমের চিন্তাধারার সঙ্গে কোমতের পজিটিভিজিমের নিগূঢ় যোগ র'য়েছে। মোট কথা "পজিটিভিজিম্"—বস্তুবাদকেই পুষ্ট করে।

অন্যদিকে, সমাজ-দর্শনে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র আগ্রহ নানা আকারে ব্যক্ত হয়। জেরেমি বেন্থামের এবং জনষ্টুয়ার্ট মিলের "ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্", রবার্ট ওয়েন প্রভৃতির 'সোসালিজম্'—

("সোসালিষ্ট" কথাটা প্রথম ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবহৃত হয়—ওয়েনপন্থীদের বোঝাতে), মার্কসের "কম্যুনিজম্"—(কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো ১৮৪৮)—এই আন্দোলনের নরম ও চরম রূপ। বেন্থামের মতে—সুখই মঙ্গল এবং দুঃখই অমঙ্গল। যে ব্যবস্থায় সুখের মাত্রা বেশী সেই ব্যবস্থাই অধিকতর মঙ্গলকর—যে-ব্যবস্থায় 'greatest balance of pleasure over pain" —থাকে সেই ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। একের স্বার্থ এবং দশের স্বার্থের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করাই আদর্শ সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্য। সমাজ বিধানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত চারটি—(ক) প্রত্যেককে খেতে পরতে দেওয়া (খ) ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করা (গ) নিরাপত্তা বিধান করা এবং (ঘ) সাম্য রক্ষা করা। স্বাধীনতার নাম তিনি করেননি ; কারণ—খেয়ে পরে' বাঁচার অধিকার যেখানে নেই, সমান অধিকার যেখানে নেই, সেখানে স্বাধীনতা তো মুখের কথা মাত্র।

বেন্থামের মতে, জনসাধারণের জীবনে সুখশান্তি নিয়ে আসাই সমাজের উদ্দেশ্য। ন্যায়-নীতির ফাঁকা বুলি আওড়ায় সেই সব শাসক-গোষ্ঠীই যারা দশের দাবী দাবিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। আত্মবলির আহ্বান যাঁরা বড় গলায় জানায় তারা যে ভুল করে তা' নয়, তারা অপরকে নিজের কাছে বলি দেওয়ানোর জন্যই তা' করে। বেন্থামের সুর বেশ কড়াই বলতে হবে।

বেন্থামের সময়েই সমাজতন্ত্রবাদের শুভারম্ভ ঘটে। বেন্থাম, ম্যালথাসের এবং জেমস্ মিলের সহযোগী। রিকার্ডো ১৮১৭ খ্রীঃ—পুস্তিকাকারে প্রচার করেন—দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য (exchange-value), শ্রমমাত্রার উপর নির্ভর করে। আট বছর পরে—১৮২৫ খ্রীঃ—টমাস হজস্কিঙ্গ (Thomas Hodgsking)—"লেবার ডিফেণ্ডেড এগেনষ্ট দি ক্লেমস্ অফ ক্যাপিটাল"—নামক সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম ইস্তাহার প্রচার করেন। এতে তিনি বলেন—যে পরিমাণে শ্রম ব্যয় হয়, তারই উপরই

যদি দ্রব্যমূল্য নির্ভর করে তা' হ'লে জমিদার এবং পুঁজিদারের চেয়ে শ্রমিকেরই বেশী পাওয়া উচিত। রবার্ট ওয়েন—নিজে পুঁজিদার হওয়া সত্ত্বেও, শ্রমিকের দাবীর ন্যায্যত্ব স্বীকার করেন। সমাজতন্ত্রবাদীদের সুর শুনে অনেকেরই হৃদকম্প উপস্থিত হয়—যে অনুপাতে আতঙ্ক হয় সেই অনুপাতে বিরাগ দেখা দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না—এ কি সাংঘাতিক কথা! জেমস্ মিলের একখানি চিঠিতে (১৮৩১)— পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত চমৎকার ফুটে উঠেছে। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবাদের ঠাণ্ডা বা গরম লড়াই চলে আসছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীতে, সমাজতন্ত্রের বা সাম্যবাদের চাহিদা—রাজনীতিদর্শনের অন্যতম প্রবল আবেগ।

জেমস্ মিল তাঁর চিঠিতে লিখছেন—"Their notions of property look ugly...They seem to think they should not exist...Ras cals, I have not doubt, are at work among them......These opinions if they were to spread would be the subversion of civilized society"। জেমসের এই আতঙ্ক ও উত্তেজনা লক্ষণীয়। সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারিত হ'লে সভ্যসমাজ উলটে যাবে, এ আতঙ্ক তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে। জেমসের আতঙ্ক সত্যেই পরিণত হয়! কার্ল মার্কস-এঙ্গেলস্ প্রমুখ চিন্তানায়করা সাম্যবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেন না। সমাজতন্ত্রবাদকে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন এবং বিপ্লবের পথে সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবার প্রেরণা সঞ্চার করেন। তখন থেকেই পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সংগ্রাম লেগে আছে। দু'একটা দেশে সমাজতন্ত্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'লেও সংগ্রামের প্রয়োজন শেষ হয়নি। সারা দুনিয়ায় ঠাণ্ডা বা গরম লড়াই লেগেই আছে। একদিকে দর্শনের শিবিরে চলেছে—অধ্যাত্মবাদের

বিরুদ্ধে বস্তুবাদের সংগ্রাম, অন্যদিকে রাজনীতিদর্শনে চলেছে—পুঁজি-বাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবাদের সংগ্রাম।

পরাদর্শনে কোন পরিবর্ত্তন আসলে,—অন্যান্য ধারণার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব না এসে যায় না। বিবর্ত্তনবাদী চিন্তা, সাহিত্যতত্ত্বের ও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রবেশ করতে থাকে। কবিকে দৈবপ্রেরিত মনে করার তথা অলৌকিক রহস্য-মণ্ডিত করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কবিকে—'race-milieu-moment''-এর অন্তর্ভুক্ত করে, সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে দেখার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। এই প্রবৃত্তি থেকে যে সাহিত্য-সমালোচনা-পদ্ধতি সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয়েছে—"ঐতিহাসিক সমালোচনা-রীতি"। Mme de Stael (১৭৬৬-১৮১৭), Sainte Beuve (১৮০৪-১৮৬৯), Taine (১৮২৮-৯৩) প্রভৃতি সমালোচকদের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক সংস্কারে শাণিত হয়। [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—টেনের "ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস" (১৮৬৪-৬৯) রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত-যাত্রার আগে, আমেদাবাদে-থাকাকালে পড়েছিলেন।]

একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠার আগেই, ইউরোপের নানাবিধ দার্শনিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও শৈল্পিক গ্রন্থ-নিবন্ধাদি আমাদের দেশে অবিরাম প্রবেশ করে এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের মস্তিষ্কেও স্থানলাভ করে। একদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো কাব্য-রস-পিপাসুরা যেমন "কবিচিত্ত ফুলবন মধু" পান করতে গ্রীস-রোম-ইতালী-ইংলণ্ড-ফ্রান্স সব দেশেরই ফুলবনে পরিভ্রমণ করেন, অন্যদিকে বঙ্কিম-চন্দ্রের মতো হৃদয়বান ও মস্তিষ্কবান সব্যসাচী প্রতিভারাও, কাব্য ও দর্শন-বিজ্ঞান উভয় বিদ্যাই সমানমাত্রায় গ্রহণ ও সমীকরণ করার চেষ্টা করেন। কোম্তের "পজিটিভিজিম্" বেন্থামের ও জনষ্টুয়াৰ্ট মিলের—হিতবাদ (ইউটিলিটারিয়ানিজম্) ডারুইনের বিবর্ত্তনবাদ (ইভোলিউ-

শানিজিম্), হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের "সিন্থেটিক ফিলসফি", রুশো প্রভৃতির সাম্যবাদ,—ওয়েন প্রভৃতির সমাজতন্ত্রবাদ, সেণ্টেবুভে ও তেইনে-প্রবর্ত্তিত "ঐতিহাসিক সমালোচনাপদ্ধতি"—সব রকমের নতুন নতুন চিন্তা—বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বঙ্কিমগোষ্ঠীর প্রতিভা আশ্রয় করে' বাংলাসাহিত্যে প্রবেশলাভ করে। এহেন বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব—এ কথাটা মনে রাখতেই হবে।

রবীন্দ্রযুগের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ—এ কথাটার তাৎপর্য্য বিশেষভাবে প্রণিধান করতে হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের সহস্রাক্ষ প্রতিভার দিকে একবার ভালভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক-প্রতিভার সঙ্গে কম-বেশী পরিচয় আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তিষ্ক-শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের খুব কম লোকেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বহুশাস্ত্রবিদ ব্যক্তি যে-কোন সময়েই দুর্ল'ভ। তাঁর প্রবন্ধরাজি পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়—সমসাময়িক দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা—কোন বিষয়ই বঙ্কিমচন্দ্র বাদ দেননি। ইউরোপীয় যুক্তিবাদের সমর্থ প্রতিনিধি হ'তে হ'লে যে-ধরনের সার্বভৌম পাণ্ডিত্য আবশ্যক বঙ্কিমের মধ্যে তা' যথেষ্ট মাত্রায় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানোৎকর্ষের সর্ব্বোচ্চ মানাঙ্ক বলে' মনে করতে পারি। এই "মানের" উচ্চতা ভাল করে' বুঝতে হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহ ধৈর্য্যের সঙ্গে পাঠ করতে হবে। যাঁরা অত শ্রম ব্যয় করতে পারবেন না তাঁরা প্রবন্ধগুলির নাম দেখে প্রকৃতি অনুমান করে নিতে পারবেন, এই মনে করে' প্রবন্ধের একটা তালিকা এখানে দেওয়া যাচ্ছে :—

সাহিত্য :—উত্তরচরিত (১২৭৯), গীতিকাব্য (১২৮০), বিদ্যাপতি ও জয়দেব (১২৮০), আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প (১২৮১), শকুন্তলা,

মিরান্দা ও দেসদিমোনা (১২৮২), সঙ্গীত (১২৭৯), বাঙ্গালাভাষা (১২৮৫)।

প্রত্নতত্ত্ব—দ্রৌপদী (৲২৮২), প্রাচীন ভারতের রাজনীতি (১ ৮), বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (১২৮২, বাঙ্গালীর উৎপত্তি (১২৮৮)।

ইতিহাস ও অর্থনীতি :—বাঙ্গালীর বাহুবল (১২৮১), ভারত কলঙ্ক (১২৭৯), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (১২৮০), বঙ্গদেশের কৃষক (১২৭৯), [সাম্য—১৮৭৯ খ্রীঃ প্রকাশিত], বাঙ্গালা শাসনের কল (১২৮১), বাঙ্গালার ইতিহাস (১২৮১), বাঙ্গালার কলঙ্ক (১৮৯১—প্রচার পত্রিকায়), বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (১২৮৭), বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (১২৮৯) রামধন পোদ (১২৮৮)।

দর্শন ও ধর্ম :—প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত (১২৮০), ভালবাসার অত্যাচার (১২৮১), জ্ঞান (১২৮৩—প্রচার), সাংখ্যদর্শন (১২৭৯, ৮০) ধর্ম এবং সাহিত্য (১২৯১—প্রচার), চিত্তশুদ্ধি (১২৯৩—প্রচার), গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি (১২৯১, ৯২), কাম (১২৮২), ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে (১২৮২) মনুষ্যত্ব কি (১২৮৪) [*ধর্মতত্ত্ব * কৃষ্ণচরিত্র]।

বিজ্ঞান রহস্য :—আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত (১২৭৯), আকাশে কত তারা আছে (১২৭৯),(ধূলা (১৩৭৯), গগন পর্য্যটন (১২৮০), চঞ্চল জগৎ (১২৮০, কতকাল মনুষ্য (১২৮০), জৈবনিক (১২৮০), পরিমাণ রহস্য (১২৮০, ৮১) চন্দ্রলোক, সর উইলিয়াম টমসন কৃত জীব সৃষ্টির ব্যাখ্যা।

বিবিধ :—অনুকরণ (১২৮১), প্রাচীনা ও নবীনা (১২৮১), বহুবিবাহ (১২৮০), বাহুবল ও বাক্যবল [১২৯৫), লোকশিক্ষা (১২৮৫)...প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল প্রবন্ধ এবং বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর রচনারাজি বাঙ্গালার মনন-শক্তিকে বৈচিত্র্যের এবং গভীরতার এমন এক উন্নত স্তরে

তুলে দিয়ে যায় যে পরবর্তী প্রবন্ধকারদের পক্ষে আর নীচু গ্রামে নেমে যাওয়া সম্ভব হয় না। এই সঙ্গেই বলে রাখা যাক—বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যে তুলনামূলক নীতির এবং "ঐতিহাসিক পদ্ধতি"র প্রবর্ত্তকের মর্য্যাদা যদি কাউকে দিতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রকেই দিতে হবে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের সুষ্ঠু আলোচনা—তুলনামূলক আলোচনা—বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীরাই আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রভৃতি আলোচনায় আমরা এই আরম্ভেরই বিকশিত রূপ দেখতে পাই। কিন্তু যে ঐতিহাসিক-সমালোচনা-নীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে প্রচার ও প্রয়োগ করেন, পরবর্তী সমালোচকরা তাকে অজ্ঞাতসারে অল্পস্বল্প প্রয়োগ করেছেন বটে, কিন্তু সচেনভাবে প্রচার করেন নি বা অধিকতর সুষ্ঠুভাবেও প্রয়োগ করেন নি। যতখানি যুক্তিবাদী হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন, ততখানি যুক্তিবাদিতা উনবিংশ শতাব্দীর (বিংশ শতাব্দীরও) কম লোকেরই মধ্যে পাওয়া যায়। বঙ্কিমোত্তর যুগ বলতে এই কারণে—এমন একটা অবস্থা বুঝায় যা—ভাবে-কল্পনায়-ভাবনায় নানাদিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রস্তুতি ঘটে। ভারতের সমগ্র অতীত—এবং ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশের সমগ্র অতীত-বর্ত্তমান দিয়ে এ যুগ গঠিত। এত বড় বিরাট অতীত, তার বিচিত্র জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের সাধনা নিয়ে, রবীন্দ্রযুগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আছে। এই বিরাট পরিবেশের পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হবে। এইভাবে দেখলে দেখা যাবে—রবীন্দ্রনাথ আকস্মিক কোন আবির্ভাব নয়, তাঁর সৃষ্টিও সৃষ্টিছাড়া কোন বস্তু নয়। তাঁর ভাব-ভাবনা-ভাষা-ছন্দ যুগের বিশেষ চাহিদার বা সম্ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে। মোট কথা রবীন্দ্র-যুগ যে নিরপেক্ষ নয় এই কথাটাই বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্র-যুগ বলতে সাধারণ হিসাবে ১৮৭৭— খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সৃষ্টিকালের সমগ্র ব্যাপ্তিকেই ধরা হ'য়ে থাকে ; এখানে তা না ধরে১৮৮০ থেকে—১৯৪১ পর্য্যন্ত কালকে রবীন্দ্র-যুগ বলা কেন ? এ কথা সত্য বটে যে রবীন্দ্রনাথ লিখতে আরম্ভ করেছেন —১২৮২-৮৩ সাল থেকে অর্থাৎ ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। "বনফুল" "প্রলাপ" এবং ভুবনমোহিণী প্রতিভা" "অবসর সরোজিনী" ও "দুঃখ-সঙ্গিনী"র সমালোচনা—এই সময়েই লেখা। এর পর "ভারতী"-পত্রিকায় ১৮৭৭ খ্রীঃ 'মেঘনাদবধ কাব্যের' সমালোচনা 'ভিখারিণী' নামে একটা ছোট গল্প ও "কবিকাহিনী" লেখেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ "ইউরোপবাসীর পত্র" রচনা করেন এবং ১৮০০ খ্রীঃ বাল্মীকি প্রতিভা রচনা করেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত যাই করুন—"সন্ধ্যা সংগীত" (১৮৮১) থেকেই কবিজীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনা হ'য়েছে। সন্ধ্যাসংগীতই কবি স্বীকৃত প্রথম কাব্য গ্রন্থ। এই কাব্যখানি পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র নিজ হাতে রবীন্দ্রনাথের। গলায় মালা পরিয়ে দেন। সুতরাং এখান থেকেই রবীন্দ্র-যুগের আরম্ভ।

এবার দেখা যাক, ১৮৮০ থেকে ১৮৬১ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে কিরূপ পরিবেশের মধ্যে বোঝাপোড়া করতে হ'য়েছে। এই পরিবেশের পরিপাটি পরিচয় দিতে গেলে—১৮৮০ থেকে ১০৪১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ-অর্থনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস, দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করা দরকার। সে এক বিরাট ব্যাপার। তা' করতে গেলে আর কিছু করার স্থান থাকবে না ব'লেই করব না। সুতরাং সংক্ষেপে—অনেকটা রেখারূপে—এই সময়- কার নানা প্রবৃত্তির উল্লেখ করেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করব। আশা করি রবীন্দ্রনাথের যুগ-বৈশিষ্ট্য বুঝবার পক্ষে তা' যথেষ্ট হবে।

১৮৮০ থেকে ১৯৪১

(ক) রাজ-আর্থনৈতিক ঘটনা পঞ্জী

লর্ড রিপণ—

(১৮৮০-১৮৮৪)

স্বায়ত্তশাসনমূলক আইন

প্রজাস্বত্ব আইন

*ইলবার্ট বিল (১৮৮২)

*মহম্মদ ইউসুফ কর্তৃক মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবী ১০৮৩

* বেঙ্গলীতে-লিখিত প্রবন্ধের জন্য সুরেন্দ্রনাথ দণ্ডিত

* জাতীয় সম্মেলন আহ্বান (১৮৮৩)

* কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (১৮৮৩)

লর্ড ডাফরিণ—

(১৮৮৪-৮৮)

*কংগ্রেরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

* ভেদনীতির প্রয়োগ—

(হিন্দু-মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি—এই কথা প্রচার—আলীগড়ের স্যর সৈয়দ আহম্মদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার)

সৈয়দ আহম্মদের কংগ্রেস-বিরোধী

* "পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশান"-গঠন

ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জয়ন্তী—(১৮৮৭)

* কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)

* মুসলমানদের কংগ্রেসের মধ্যে আনার চেষ্টা

* কংগ্রেসকে পুরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা—

লর্ড ল্যান্সডাউন—

(১৮৮৮-৯৪)

* সিকিম, লুসাই পর্ব্বত, শান প্রভৃতি রাজ্যে—ব্রিটিশ প্রভাব প্রসারিত
* Factory Act
* ভারতীয় কাউন্সিল আইন (১৮৯২)

* মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব (১৮৯৩)
* চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের তরুণ-সংঘ (১৮৯৪)
* শিবাজী উৎসব (১৮৯৫)
* সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত
* বিশ্বধর্ম সম্মেলন থেকে—বিজয়ী বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তন (১৮৯৩-৯৭)

দ্বিতীয় লর্ড এলগিন—

(১৮৯৭-৯৯)

* আফ্রিদি-বিদ্রোহ (১৮৯৭)
হীরক জুবিলী (১৮৯৭)

* পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করে ভারতীয় শিল্পের ক্ষতিসাধন
বুয়র যুদ্ধ—(১৮৯৯-১৯০২)

বাঙলায় দুর্ভিক্ষ (১৮৯৯-১৯০১)

* গান্ধী :কর্তৃক—"নাতাল
* ভারতীয় কংগ্রেস" (১৮৯৪) প্রতিষ্ঠা।
* দক্ষিণ-আফ্রিকার এশিয়াটিক বিভাগের আক্রমণ
* বুয়োর যুদ্ধে গান্ধীজির সহযোগিতা ও সেবা
*স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনী (১৮৯৬)

লর্ড কার্জন—(১৮৯৯-১৯০৫)

* কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকার হরণ এবং সরকারী প্রভাবের অধীনে আনয়ন (১৯১৪)
* আর্থিক দুর্গতি
* বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইন
* সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব (১৯০৩)
* বঙ্গবিভাগের বিজ্ঞাপন (১৯০৩)
* বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব মঞ্জুর (১০০৫) ২০শে জুলাই
* ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুৎসা (১৯০৫)
* শিক্ষাবিভাগের কর্তা কার্লাইল সাহেবের সার্কুলার
* "বন্দে মাতরম্" সার্কুলার
* মাদারীপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ছাত্রদের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত
* Imperial Cadet Corps
* Punjab Land Alienation Act
* Coopertive Credit Society
* Deparment of Commertce & Industry
* Imperial Library

* সরলা দেবীর "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার"
* সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ডন সোসাইটি (১৯০৩)
* অনুশীলন সমিতি"— (প্রমথ নাথ মিত্র)
* সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব (১৯০৫)
* ৭ই অক্টোবর মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে টাউনহলে জনসভা— বিলাতী বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত
* রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে জন-জনসভা (২৭শে অক্টোবর)
* "অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি" (কৃষ্ণকুমার মিত্র + শচীন্দ্রনাথ বসু)
* জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ—
* "জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ গঠিত"
* রাখিবন্ধন-অরন্ধন-প্রতিবাদ সভা-জাতীয় ধনভাণ্ডার মিলনমন্দির (১৮ই অক্টোবর)

দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো—
(১৯০৫-১৯১০)

* রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দমন আইন (১৯০৭)
* দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-নির্যাতন
* অশ্বিনী দত্ত, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদের নির্বাসন
তিলকের কারাদণ্ড (১৯০৮)
* বিস্ফোরক আইন
* সংবাদপত্র দমন আইন } (১৯০৮)
ফৌজদারী আইন সংশোধন (১৯০৮)
* পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি সহ মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার (১৯০৯-মে)
* অনুশীলন সমিতি (ঢাকা)
স্বদেশী বান্ধবসমিতি (বাখরগঞ্জ)
ব্রতীসমিতি—(ফরিদপুর)
বে-আইনী ঘোষিত

* পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—
* বিলাতী বস্ত্র যজ্ঞ (১৯০৬)
* মুসলিমলীগ (১৯০৮)
* আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলা (১৯০৮)
* সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ (১৯০৭)
* বৈপ্লবিক তৎপরতা— (১৯১১)
* (১৬টি পূর্ববঙ্গে + ২টি পশ্চিমবঙ্গে)
* নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (সত্যাগ্রহ) } আন্দোলন (১৯০৬) ১৯০৭)
*সন্ত্রাসমূলক কার্য্য ১৫টি (১৯০৯)
* নাসিক ষড়যন্ত্রের মামলা
* কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত (১৯০৯)
(দক্ষিণপন্থী + বামপন্থী)
* সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯১০)

লর্ড হার্ডিঞ্জ :—(১৯১০-১৯১৬)

* সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন (১৯১১)

* তুরস্কের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়
* জাতিদের সংগ্রামে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

* বঙ্গভঙ্গ রহিত—বাংলা আসাম, উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত

* ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত

* প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪)

* ইংরেজরা দ্বিজাতিতত্ত্ব-প্রচারে—সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি—প্রচারে—ঐকান্তিকভাবে রত।

* ভারতরক্ষা বিধান (১৯১৫, ১৮ই মার্চ)

* পাঞ্জাব সরকারের চণ্ডনীতি—বেপরোয়া ফাঁসি—

* কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতা (১৯১৩—১৯১৬)

* গদর-আন্দোলন (১৯১৩)

* নিখিল ভারত হোমরুল লীগ (১৯১৬)

* রাজাবাজারে বোমা আবিষ্কার
বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলা } ১৯১২

* দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা (১৯১২)

* কাবুলে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট

* লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা (১৯১৫)

* যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বুড়িবালামের তীরে সম্মুখসমর (১৯১৫)

লর্ড চেমসফোর্ড :—

(১৯১৬-১৯২১)

বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান

* রাশিয়ায় বিপ্লব (১৯১৭)

* ১৯১৭ সালে কংগ্রেসে চরম-পন্থীদের প্রাধান্য

* ভারতশাসনসংক্রান্ত মন্টেগুর ঘোষণাবাণী (১৯১৭)
* রাওলাট রিপোর্ট (১৯১৯)
রাওলাট বিল (১৯১৯, ১০ই মার্চ)
* মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার (১৯১৯)

*গান্ধীজীর চম্পারণ-সত্যাগ্রহ (১৯১৯)
* খেড়া সত্যাগ্রহ (১৯১৮)
* আমেদাবাদে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মেটাতে প্রায়োপবেশন

* যুদ্ধবিরতি (১৯১৮, ১১ই নভেম্বর
* রাওলাট বিলের প্রতিবাদে
* মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্লের পদত্যাগ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড [জেঃ ডায়ার] ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯

* বিশ্বব্যাপী অর্থসংকটের (১৯২০) ধাক্কা
* রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি বর্জ্জন

* জাতি-সংঘ (লীগ অফ্ নেশনস্)
* ১৯২০—৬ই এপ্রিল—সত্যাগ্রহ আন্দোলন
* খিলাফৎ আন্দোলন

লর্ড রেডিং—

(১৯২১-১৯২৬)

* অসহযোগ আন্দোলন দমনের চেষ্টা
* রাউলাট আইন রহিত করণ।
* ভারতীয় কলে প্রস্তুত কাপড়ের উপর শুল্ক প্রত্যাহার
* ভারতীয়-ইউরোপীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য দূরী করণ
* ভারতীয় নৌ-বাহিনী গঠনের সূত্রপাত

* আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতালাভ (১৯২২)
* কংগ্রেস আন্দোলনের—অহিংস অসহযোগের তীব্রতা বৃদ্ধি
* ট্রেড ইনিয়ন আন্দোলন ধর্মঘট

লর্ড আরুইন

(১৯২৬-৩১)

* সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০) * ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী (১৯২৮)
* প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০)
* গান্ধী-আরুইন চুক্তি (১৯৩১) * পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী (১৯২৯)
* দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক * আইন অমান্য-আন্দোলন
* ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি * সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

লর্ড উইলিংডন—

(১৯৩১-১৯৩৬)

* তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩২)
* সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২ * মাহাত্মাজীর অনশন
* পুণাচুক্তি * সাম্প্রদায়িক ঐক্যস্থাপনের জন্য কংগ্রেসের চেষ্টা
* শ্বেতপত্র (১৯৩৩) *কৃষকশ্রমিক-আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি
* ভারতশাসন সংবিধান (১৯৩৫)
* হিটলারের অভ্যুদয় (১৯৩৩) * ভারতে সাম্যবাদী দলের উৎপত্তি

লর্ড লিনলিথগো—

(১৯৩৬-৪৩)

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯)

এই যে তথ্যগুলি সাজিয়ে দেওয়া হ'লো, বলা বাহুল্য, এরা এই সময়কার রাজনৈতিক-আর্থনৈতিক পরিবেশের দিক্‌দর্শক মাত্র। মোটামুটি বিবরণ দিতে গেলে এইভাবে দেওয়া যেতে পারে :—(ভারতবর্ষে), কংগ্রেস ক্রমে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কংগেস আবেদন-নিবেদনের পর্য্যায় অতিক্রম করে' আন্দোলনকারী রাজনৈস্তিক দলের স্তরে পৌঁছে যায়। ক্রমে কংগ্রেস স্বায়ত্তশাসনের দাবী তোলে—সে দাবী ছেড়ে পূর্ণস্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার দু'একবছর যেতে না যেতেই, কংগ্রেসকে বিষ নজরে দেখতে থাকে—দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালাতে থাকে। ভেদনীতি প্রয়োগ করে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গ করে—বাংলার ঐক্যের দেহে আঘাত করতে চেষ্টা করে। মুসলমান-সম্প্রদায়কে উস্কিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়তে—মুসললিমলীগ প্রভৃতি দল গঠন করতে উৎসাহিত করে। ভেদ-বুদ্ধি পাকা করবার জন্য ক্রমে আসন সংরক্ষণ, পৃথকনির্ব্বাচন প্রভৃতি চালু করে—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রবর্ত্তন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার উস্কানি দেয়। ভেদ-নীতি দিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন দমন করতে না পেরে, শেষপর্য্যন্ত দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশি—সন্ত্রাসজনক কার্য্যকলাপ চলতে থাকে। এই সব বিপ্লবীদের দমন করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার বেপরোয়া নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এই সব বিপ্লবীরাই সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদী দল গঠন করেন—রাশিয়ার মতো বিপ্লব ঘটাবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে মন দেন—কৃষক-আন্দোলন শ্রমিক-আন্দোলনের মাঝ দিয়ে জনজাগরণ আনতে চেষ্টা করেন। ভেতরে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, বাইরে জাতিদ্বন্দ্ব—দুই দ্বন্দ্ব বুকে নিয়ে ভারত নতুন ইতিহাসের দিকে এগিয়ে চলে।

ভারতের বাইরে—এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্ররূপে প্রকাশ পায়। অষ্টাদশ

শতাব্দীতে, আমেরিকায় এবং ফরাসীদেশে যে দু'টি ঐতিহাসিক বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাদের আমরা উল্লিখিত দুই দ্বন্দ্বের মুখপাত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বৈদেশিক শাসন-শোষণ থেকে জাতীয় জীবনকে মুক্ত করার সংগ্রাম, আর ফরাসী বিপ্লব স্বদেশেরই শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রাম। প্রথমটি বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্থাৎ জাতিদ্বন্দ্ব দ্বিতীয়টি দেশীয় কুশাসন ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই নানাদেশে নানা আন্দোলনের মাঝ দিয়ে এই সংগ্রাম চলতে থাকে। একদিকে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে—সাম্রাজ্যের বিস্তার করতে ঐকান্তিক ; অন্যদিকে পরাধীন জাতিরা স্বতন্ত্র জাতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য বিজাতীয় শাসন বা আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টিত। ইতালী, জার্মানী, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের বৈদেশিক-প্রভাবমুক্ত জাতি হিসাবে অভ্যুদয়—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই পরিণতি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দুর্বলরা সবল হ'য়েই সাম্রাজ্যলোভে মত্ত হ'য়ে উঠে—বনিয়াদী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

প্রতিযোগিতায় না নেমেও বড় হওয়ার উপায় নেই। প্রতি-যোগিতা করতে হ'লে—শিল্প-সমৃদ্ধ হওয়া চাই। আর তা' হ'তে গেলে কাঁচামাল যোগান দেবে, তৈরী মাল কিনে নেবে—এমন দেশ হাতে রাখা চাই অর্থাৎ সাম্রাজ্য চাই। সাম্রাজ্য চাওয়া মানেই সাম্রাজ্য নিয়ে ব'সে আছে এমন কাউকে হঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা—এক কথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। জাতিকে মত্ত করতে না পারলে যুদ্ধ জমে না। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কড়া মদ খাইয়ে—শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে

মনকে বিষাক্ত করতে না পারলে জাতকে-কে-জাত উন্মত্ত করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদীদের মাঝে সামরিক প্রস্তুতির তীব্র প্রতিযোগিতা-আরম্ভ হয়। ফলে যুদ্ধও অনিবার্য্য হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও—সাম্রাজ্যবাদী শকুনিদেরই শব নিয়ে কাড়াকাড়ির উৎকট লড়াই।

এ চিত্রের একদিক—জাতিদ্বন্দ্বের চিত্রের দিক। অন্যদিকে রয়েছে—শ্রেণী-সংগ্রামের নানা আন্দোলন। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে কারখানার এবং শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে। তার সঙ্গে বাড়ে তাদের দুঃখদুর্দ্দশার মাত্রা। এই শোষিত জনসাধারণের মুক্তির জন্য শ্রমিক-সংঘ গড়ে উঠতে থাকে। নানা দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন মাথা তুলতে থাকে। কম্যুনিষ্ট ইস্তাহারে (১৮৪৮) এদের মূলমন্ত্র ঘোষিত হয়। মার্কস-এঙ্গেলস প্রমুখ মনীষীরা সাম্যবাদকে নতুন জীবনদর্শনের আসনে বসিয়ে দেন। সাম্যবাদের প্রভাব ধীরে ধীরে নানাদেশে সংক্রামিত হ'তে থাকে। রাশিয়ায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে—প্রথম মহাযুদ্ধের জাতিদ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্রের মধ্যেই—শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রথম এবং স্মরণীয় ঐতিহাসিক যুদ্ধ দেখা দেয় এবং প্রথম শোষিত জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই পুঁজিবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের সংগ্রাম নতুন উদ্যমে আরম্ভ হয়—নতুন পর্য্যায়ে প্রবেশ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে—নানাদেশে সাম্যবাদী দল গড়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী শাসক-সম্প্রদায়ও শক্তি সংগ্রহ করতে, সাম্যবাদের কণ্ঠরোধ করতে উঠে পড়ে লাগে। ক্রমে ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনীর এবং জার্মানীতে নাৎসী হিটলারের অভ্যুদয় ঘটে। আবার সাম্রাজ্যবাদী কাড়াকাড়ি উৎকট রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এশিয়ায় জাপানও পিছিয়ে থাকে না—সাম্রাজ্যলিপ্সায় মরিয়া হ'য়ে উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এদের লোভ-হিংসার আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে। এই রাজনৈতিক পটভূমির উপর দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনা

করে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে—এককথায় মানুষকে সর্বতোভাবে মুক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সংগ্রাম ক'রেছেন তার প্রেরণা রয়েছে ঘরে-বাইরের এই রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে।

দার্শনিক পরিবেশ ঃ—বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তা কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে—আগেই সেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরবতারণা করা অনাবশ্যক। এখনে এইটুকু জানালেই যথেষ্ট হবে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে—বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা আরও বেড়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন প্রায় সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা বলতে সার্বজনীন প্রতিষ্ঠার কথা বলা বলা হ'চ্ছে না। এ কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে, তখন কেন আজও, বস্তুবাদ সর্ববাদিসম্মত মতবাদে পরিণত হ'তে পারেনি। যাই হো'ক—বস্তুবাদ এই সময় নানা বেশে আত্মপ্রকাশ করে এবং খুব দম্ভভরেই বিচরণ করে। যান্ত্রিক বস্তুবাদ মার্কসের হাতে প'ড়ে ক্রমে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে পরিণত হয়। তারপর থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেরই রাজত্ব চলছে এবং নতুন কোন বস্তুবাদ না আসা পর্য্যন্ত এর রাজত্বই চলবে।

কিন্তু অন্যপক্ষে—অধ্যাত্মবাদের শিবির রক্ষা করবার জন্য কেউ দাঁড়ায়নি বা আজও দাঁড়িয়ে নেই—এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। বস্তুবাদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য—পাদ্রীপুরোহিত ভক্ত দার্শনিকরা প্রাণপণে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন—এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রাম কোন একটা দেশে সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই। প্রত্যেক দেশেই দুই শিবিরের সংগ্রাম চলেছে। কোন দেশে বেশী তীব্র, আর কোন দেশে কম তীব্র এই যা পার্থক্য। এই দ্বন্দ্বের আওতা থেকে মুক্ত এমন শিক্ষিত ব্যক্তি খুব কমই আছে—নেই বল্লেও চলে।

এখানে এই দুই শিবিরের সংগ্রামের রীতি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্তুবাদীরা আত্মার দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা মানেন না বা আত্মাকে কোন পরমাত্মার অংশ বলেও মানেন না। ফলে ভূত ও ভগবান,—পুনর্জন্ম স্বর্গ-নরক মোক্ষ—এ সব কোন কিছুই মানেন না। তেমনি মানেন না—অলৌকিক অনুভূতি—মর্মদৃষ্টি (Intuition)। এদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বড় প্রমাণ। যা প্রত্যক্ষের বাইরে(পর্য্যবেক্ষণের বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমাণের বাইরে) তা অসৎ। বস্তুবাদীর কাছে—পরম সত্য অনির্বচনীয় কোন 'সচ্চিদানন্দ' পুরুষ নয়, সত্য র'য়েছে বিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির মৌলিক ধর্মের মধ্যে—যৌগিক রূপ-বৈচিত্রের মধ্যে। এই সত্যকে লাভ করতে হ'লে বুদ্ধির বা যুক্তির (Reason) আশ্রয় নিতে হবে। বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া 'সত্য'লাভ অসম্ভব। অন্যপক্ষে অধ্যাত্ম-বাদীরা—অচিন্তনীয়স্বরূপ সচ্চিদানন্দ কোন Absolute সত্তা স্বীকার করেন। জগৎ ও জীবনকে তাঁরই সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি রূপে দেখেন। এঁদের কাছে এই পরম সত্তা ছাড়া আর সবই অনিত্য। সুতরাং সেই সত্তার রূপই সত্যের স্বরূপ। তাঁর ইচ্ছাই পরম মঙ্গল। তাঁর রূপই পরম সুন্দর। এই সত্তা 'অবাঙমনসোগোচর' তাঁকে পেতে হ'লে—তাঁর কৃপা চাই—দিব্য দৃষ্টি চাই—অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি চাই। যুক্তি তাঁর নাগাল পায় না—যুক্তির আলোকে তাঁকে পাওয়া যায় না—মর্মে ধরা না দিলে তাঁকে ধরা যায় না। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"। পরাদর্শনে (Metaphysics) অধ্যাত্মবাদীরা যেমন অনির্বচনীয় 'সচ্চিদা-নন্দ'-সত্তাকে মানতে ও মানাতে বদ্ধপরিকর, জ্ঞানদর্শনেও (Epistemo-logy) তেমনি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির (Mystic Experience) মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে ঐকান্তিক। সাধারণ রীতিতে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে—সাংকেতিক রীতি (Symbolic) আশ্রয় করতে এরা বাধ্য হন। এই কারণেই সাংকেতিক রীতি অধ্যাত্মবাদী শিবিরের

প্রধান হাতিয়ার রূপেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রাধান্য লাভ করে।

বস্তুবাদের বিরুদ্ধে অধ্যাত্মবাদের দিক থেকে বড় অভিযোগ বা অভিযান আসে—নীতির ক্ষেত্রে—মঙ্গলের ক্ষেত্রে। এমনি করে যুক্তি সাজিয়ে দেওয়া হয়—বস্তুবাদ বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান, বিজ্ঞানের দান যন্ত্র, যন্ত্রের বলে বলীয়ান হ'য়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্য শাসন-শোষণ করছে। পুঁজিবাদী শাসকরা শ্রমিক-কৃষকদের শোষণ করছে, পীড়ন করছে—তাঁদের বাঁচার অধিকারটুকুও অস্বীকার করছে, যন্ত্রের দানেই শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। মুনাকার লোভে, মালিকরা মানুষকে অমানুষ করে তুলছে—মনুষ্যত্বটুকু নিংড়ে বের করে নিচ্ছে—জীবন থেকে বিশ্রাম, আনন্দ, সৌন্দর্যবোধ সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে। এমনি করে' যান্ত্রিক-সভ্যতা মানুষের প্রাণ পীড়ন করছে—মানবাত্মাকে অবমাননা করছে,—তথা মানুষের মঙ্গলের বুকে চেপে বসে আছে। সুতরাং মানুষের সমস্ত দুঃখ-দুর্গতির মূলে রয়েছে—যন্ত্র—বিজ্ঞান অর্থাৎ বস্তুবাদ। বস্তুবাদ যন্ত্র-শক্তির দম্ভে মানুষের দেবত্বকে অস্বীকার করছে। সুতরাং সমস্ত অমঙ্গলের আকর ঐ বস্তুবাদ এবং তারই দস্তু—যন্ত্র-সভ্যতা—শিল্প-সভ্যতা। সভ্যতার সঙ্কট শুধু সাম্রাজ্যবাদই সৃষ্টি করেনি, বস্তুবাদও সভ্যতার মস্ত বড় 'সঙ্কট'। এই সঙ্কট থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে বস্তুবাদীদর্শন এবং তার আনুষঙ্গিক উৎপাত—"যন্ত্র"-"কারখানা" প্রভৃতিও বর্জ্জনকরতে হবে। অন্ততঃ যন্ত্রকে দেবতার অধীন করতে হবে—দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব মানতেই হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই সব যুক্তিকে সুযুক্তি বলে মনে হ'লেও—যুক্তিগুলি যে হেত্বাভাসপূর্ণ অর্থাৎ ঠিক নয় সে কথা—অধ্যাত্মবাদীরা তলিয়ে দেখেননি। সাধারণবুদ্ধিদের কাছে বস্তুবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারাতেই তাদের আনন্দ! যুদ্ধে জয়লাভ নিয়েই কথা।

বস্তুবাদীদর্শন বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা পুষ্ট হ'য়েছে—বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করছে—একথা সত্য। একথাও সত্য বিজ্ঞানের গবেষণার ফলেই যন্ত্র-সভ্যতা গড়ে উঠেছে—সাম্রাজ্যবাদীরা পুঁজিবাদীরা বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগ করে শাসন-শোষণ করেছে এবং আজও নানাদেশে করছে। কিন্তু তা'ই ব'লে বিজ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ থাকবে—পুঁজিবাদীদের শাসন-শোষণ কায়েম থাকবে, যন্ত্রসভ্যতা থাকা পর্যান্ত মানুষের ভাগ্যে বিশ্রামহীন শ্রমের চাপ থাকবে—মানুষ মুক্তির স্বাদ পাবে না, আনন্দ-সম্ভোগ থেকে, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে—একথা সত্য নয়। যন্ত্র শোষণ-পীড়নের হাতিয়ার বটে কিন্তু যে হাতে হাতিয়ার থাকে সেই হাতই তো প্রকৃত দায়ী। হাতের দোষ যন্ত্রের ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন? অসুরের হাতের খাড়া শিবশক্তিকে আঘাত করে বলে' দুর্গতিনাশিনী দুর্গার হাতের খাড়া ভেঙ্গে ফেলতে কেউ যুক্তি দেবে কি? যন্ত্র মানুষকে শাসনও করে না বা শোষণও করে না। মানুষই মানুষকে শাসন-শোষণ করে। সুতরাং যন্ত্রকে নিমিত্তের ভাগী করা, শিল্প-সভ্যতাকে দুঃখদুর্দ্দশার কারণ বলে' দায়ী করা, নিশ্চয়ই কোন সুযুক্তি নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাই ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই যন্ত্রকে দানব করেছে, কারখানা-জীবনকে অভিশাপে পরিণত করেছে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটলে—সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লে, যন্ত্র বা শিল্প-কারখানাই যে আশীর্ব্বাদে পরিণত হ'তে পারে—এ প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া গেছে। জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে দৈবকৃপার কোন প্রয়োজন নেই, সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তনই যথেষ্ট—এ কথা আজ আর কল্পনামাত্র নয়।

সাহিত্যিক পরিবেশ—

'সাহিত্যিক পরিবেশ' কথাটা ব্যাপক অর্থে—নানা প্রকার সাহিত্যের

এবং নানা সাহিত্যিক আন্দোলনের বা মতবাদের সমষ্টি। এখানে আমি ১৮৮০ থেকে ১৯৪১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক ইউ-রোপীয় ও দেশীয় সাহিত্যের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব না, কারণ তা করতে যাওয়ার অর্থ—সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা ; সুতরাং শুধু সাহিত্যিক আন্দোলন সম্পর্কে দু'একটা কথা বলেই ক্ষান্ত হব। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এবং পরবর্ত্তীকালে, যে সব সাহিত্যিক আমাদের দেশে জন্মেছেন তাঁদের কবি-মানসগঠনে ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব যে কতখানি এবং কতভাবে পড়েছে তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ আজও হয়নি। হ'লে দেখা যাবে—অনেকেরই অনেক মৌলিক কল্পনার বীজ বা প্রেরণা ইউরোপ থেকেই এসেছে। একদিকে শেক্‌সপীয়র, মিলটন এবং প্রাচীনতর মহাকবিদের প্রভাবের কথা যেমন স্মরণীয়, অন্যদিকে তেমনি গেটে-শিলার ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ কীটস্ প্রমুখ রোমাণ্টিক কবিদের এবং স্কট, বালজাক, ডুমা, হিউগো, ফ্লবার্ট, হদর্ণ, থ্যাকারে, ডিকেন্স টলষ্টয় প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিংশশতাব্দীর আধুনিক কবিদের ও ঔপন্যাসিকদের প্রভাব পরিমাপ করাও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ শক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার।

বাংলা-সাহিত্যের উপর ইউরোপীয় সাহিত্য কতভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বা রবীন্দ্রমানসের গঠনে কত লেখকের লেখা কতভাবে কাজ করেছে—এ আলোচনায় প্রবেশ করবার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর রোমাণ্টিক-কবি-চিত্ত-গঠনে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের Excursion (1814) প্রভৃতি, শেলীর—"Alastor" (1816) প্রভৃতি, কীটসের Endymion (1810!...) প্রভৃতি এবং অন্যান্য কবি ও কাব্যের প্রভাবের মাত্রা বিশেষভাবে পরিমাপ করে দেখা দরকার। বিহারীলালের "সারদা"-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের—

"কবিকাহিনী" রচনায়, লীলা-সঙ্গিনী প্রভৃতি কল্পনায়—"আলষ্টর" সিনথিয়া-এণ্ডিমিয়ন কাহিনীর প্রভাব প্রত্যক্ষে—পরোক্ষে কতখানি কাজ কারছে—অবশ্যই গবেষণা করে দেখা দরকার। বলা বাহুল্য—এ গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের পরিসর আবশ্যক। সুতরাং এখানেই এ প্রসঙ্গের উপ-সংহার করা যাক। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সাহিত্যিক আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে' 'সাহিত্যিক-পরিবেশ-আলোচনার এবং রবীন্দ্রযুগসম্পর্কিত আলোচনার পরিসমাপ্তি করা যাক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমপাদে একদল শিল্পী-সমালোচক "শিল্পের জন্য শিল্প" (l art pour l art,) মতবাদটি পরবর্ত্তীকালে যা' art for art's sake. আন্দোলনরূপে বিখ্যাত হ'য়েছে—প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

এই মতবাদটি যে 'ঐতিহাসিক সমালোচনাপদ্ধতি'র প্রতিক্রিয়া থেকে, সাহিত্য-শিল্পকে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ করবার মনোভাব থেকে, জন্মেছে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। মনে রাখা দরকার—বস্তুবাদে এবং অধ্যাত্মবাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছে, তার সাথেও এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বের বেশ একটু যোগ আছে। একপক্ষে বস্তুবাদীরা অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সত্তা স্বীকার করতে নারাজ। শিল্পকে সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু বলতে তারা চান না এবং চান না বলেই সাহিত্য-শিল্পকে তারা উদ্দেশ্যমূলক তথা প্রয়োজনের সামগ্রী বলেই মনে করেন। অন্যপক্ষে অধ্যাত্মবাদীরা শিল্পকে দেশ-কালাতীত অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বাহন বলে' চালাতে চান। কারণ যত দেশকালাতীত অলৌকি সত্তা স্বীকার করানো যাবে, ততই বস্তুবাদের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের একটা রূপ দাঁড়ায় এই—বস্তুবাদপ্রবণ সমালোচকরা সাহিত্যের উদ্দেশ্য স্বীকার

করেন এবং অধ্যাত্মবাদীরা সাহিত্যকে উদ্দেশ্যহীন বলে' ঘোষণা করেন—অলৌকিক রহস্যময় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই—এই কথা জোর গলায় প্রচার করেন। এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব আজও চলছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় আন্দোলন—বাস্তবতার (Realism) আন্দোলন। অধ্যাত্মবিমুখতার সঙ্গে এ আন্দোলনের স্বাভাবিক একটা যোগ আছে। যে অনুপাতে অতিপ্রাকৃত-জগতে-বিশ্বাস কমেছে, সেই অনুপাতে বাস্তবতার চাহিদাও বেড়েছে। সাহিত্যে জীবনের সম্ভব ও সম্ভাব্য রূপ চাই—প্রকৃতজগতে জীবনের যে রূপ দেখা যায়, পাওয়া যায়, সম্ভাব্য বলে স্বীকার করা যায়, সেই রূপ সাহিত্যে ব্যক্ত করতে হবে। যা' অতিপ্রাকৃত যা' মিথ্যা, যা' অসম্ভব, আধুনিক রুচির কাছে যা অনুচিত, তা' প্রকাশ করলে চলবে না। বলা বাহুল্য—এই জাতীয় বাস্তবতার চাহিদা অধ্যাত্মবাদীর মনঃপূত নয়। এ চাহিদা তাঁদেরই যাঁরা শিল্পে লৌকিক জগতের যথাযথ রূপ দেখতে চান—"বাস্তব"-বিষয়বস্তুর "বাস্তবিক" উপস্থাপনা দেখতে চান। বিংশ শতাব্দীতে এই বাস্তবতার চাহিদা নানা প্রবণতায় প্রকাশ পেয়েছে। পরাদর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান নানা দিক থেকে বাস্তবতার চাপ আত্মপ্রকাশ করেছে। কেউ বস্তুবাদী দর্শনের সংস্কার প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন, কেউ মনস্তত্ত্বের নতুন তত্ত্ব প্রচারে চেষ্টিত হয়েছেন, কেউ নয়া সমাজবিজ্ঞানের সংস্কার নিয়ে—নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন এবং স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। এক ব্যক্তিতে একাধিক প্রবণতাও প্রকাশ না পেয়েছে এমন নয়। দর্শনে অধ্যাত্মবাদী শিবিরে থেকেও কেউ কেউ মনস্তত্ত্বে বাস্তব—সমাজতত্ত্বে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করেছেন। যা'ই যিনি করুন,মোটকথা, বাস্তবতার চাহিদা বস্তুবাদী সংস্কার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে। আধুনিকরা যেমন চান 'বাস্তব'

(Real)—বিবষয়বস্তু, তেমনি চান 'বাস্তবিক' (realistic) উপস্থাপনা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, বস্তুবাদী-দর্শনের ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যতো দিক থেকে আন্দোলন দেখা দেয় তাদের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। একথাও বলা হ'য়েছে—অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকে (intuition) অর্থাৎ 'বোধি'কে বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা—বুদ্ধিকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করার চেষ্টা, বোধের জগতের ঊর্ধ্বে অনুভূতির জগতকে স্থাপনা করা—এই আন্দোলনে একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই বোধ-বুদ্ধির সংগ্রাম—সাংকেতিক রীতির আন্দোলনের (Symbolism) মাঝ দিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। এখানে সাংকেতিক রীতির আন্দোলন সম্বন্ধে সামান্যভাবে একটু আলোচনা করলেই আগের কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক যেতে না যেতেই, বস্তুবাদ বেশ উচ্চকণ্ঠে আপনাকে ঘোষণা করতে থাকে এবং বেশ জিদের সঙ্গেই অতিপ্রাকৃতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে দেয়। এই সংগ্রামে বুদ্ধি বা (intellect) হয় তার প্রধান অস্ত্র। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (mystic feeling) উপর, দিব্যদৃষ্টির (Intuition)—উপর প্রবল ঘৃণা, তার উৎসাহ যোগায়। যুক্তিবাদের সঙ্গে স্থাপনা করে সে মৈত্রী। ভাববিলাসের সঙ্গে ঘটে তার প্রবল শত্রুতা। বস্তুবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সংস্কার এগিয়ে চলতে থাকে বটে। কিন্তু অবাধে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। অধ্যাত্ম-বাদী দার্শনিক-শিল্পী সমালোচক এই সংস্কার প্রতিরোধ করতে উঠে পড়ে লাগেন। একদিকে, দার্শনিকরা অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব, দিব্যদৃষ্টির অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন; অন্যদিকে শিল্পীরা—সাধকদের মতো, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জগতের রূপ ধ্যান করতে চেষ্টা করেন—আভাসে-ইঙ্গিতে মর্মদৃষ্টির সাহায্যে তাকে প্রকাশ করতে তথা তার অস্তিত্ব ও মহিমা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। বোধের চেয়ে

অনুভূতির মাহাত্ম্য বড়, পরম অখণ্ড সত্যকে, পরম সুন্দরকে, বুদ্ধি দিয়ে নয়, মর্ম দিয়ে লাভ করতে হবে—কারণ বুদ্ধি দিতে পারে শুধু খণ্ড সত্যেরই জ্ঞান, অখণ্ড অনির্বচনীয় সত্যের জ্ঞান দিতে পারে একমাত্র 'বোধি'—এই সব সংস্কার সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে হ'লে—আভাস-ইঙ্গিতের—সংকেতেরই শরণ নিতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে—ফরাসীদেশে Baudelaire তাঁর শিষ্য—Arthur Rimbaud, Verlaine, Mallarme প্রভৃতির মধ্যে সাংকেতিক রচনার ঝোঁক প্রথম প্রকাশ পায়। এঁদের প্রভাবে পুষ্ট হ'য়ে—১৮৮৬ খ্রীঃ একদল শিল্পী—"লা' "ডেকাডেন্ট"—পত্রিকার মারফৎ "ডেকাডেন্স"—মতবাদ প্রচার করেন। এদের শিল্পবিষয়ক সিদ্ধান্ত হয়—**শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির কোন যোগ নেই—শিল্প ও প্রকৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ।** এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এই যে, যেহেতু শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নাই, সেইহেতু সমাজেরও কোন যোগ নেই। শিল্পের জগৎ স্বতন্ত্র এক অনুভূতির জগৎ। এই সময়েই (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দেই)—"Figaro"-তে সংকেতবাদের ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং "Le Symboliste"-নামক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। এদের উদ্দেশ্য—এমন প্রকাশ-রীতি অবলম্বন করা যাতে—বস্তু-রূপ বা চিন্তা প্রকাশ না হ'য়ে শুধু একটা মানসিক অবস্থা ব্যঞ্জিত হবে। ঘোষণা করা হয়—"symbolist Poetry seeks to clothe the Idea. with a sensory form which, however, would not be its own end,......Thus in this art... all Concrete phenomena are mere sensory appearances destined to represent their esoterie affinities with primordial Ideas" এই আন্দোলনটি যে মূলতঃ—ভাববাদী আন্দোলন—"esoteric affinities with primordiai Idial" কথাটি থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রামাণিক একখানি গ্রন্থে মন্তব্য

করা হয়েছে—"This movement......is an offshoot of romanticism to which it is connected by an almost uninterrupted if sometimes underground, current and more generally to a mystical conception of the universe derived more or less remotely from Neo-platonism" (Dictionary of world Literature)। এই মন্তব্যের শেষ বাক্যটিতে স্পষ্ট করে বলা হ'য়েছে—আন্দোলনটির পিছনে অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী—রহস্যবাদী দর্শনের প্রভাব রয়েছে। (রূপক সাংকেতিক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা—"রীতি" আলোচনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

বিংশ শতাব্দীতেও এই আন্দোলনের বেগ বেড়েছে ছাড়া কম পড়েনি। সাংকেতিক রীতিকে নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা হ'য়েছে। তবে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে এর যে নাড়ীর যোগ রয়েছে তা' রয়েই গেছে।

এই সাংকেতিক রীতিরই রকমফের পাওয়া যায়—"Expressionism"-এর মাঝে। এই আন্দোলন—Lethar Schreyer-এর ভাষায়—"The spiritual movement of the time that places inner experience above external life"—Ivan Goll-এর ভাষায়—"the things that lie behind things" কে প্রকাশ করা,—গলস্‌ওয়াদি যাকে বলেছেন—"to picture the inside of things without showing their outside"। একথা সত্য বটে—Expressionism রূপগত বাস্তবিকতা অপেক্ষা ভাবগত বাস্তবিকতার পক্ষপাতী; সুতরাং বাস্তবতা-অবাস্তবতার সঙ্গেই তার সম্পর্ক বেশী। কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে, সাংকেতিক আন্দোলনেরই এ এক বিশেষ পরিণতি। এই প্রকাশরীতিতেও সংকেতের সাহায্যে ভাব বা মানসিক অবস্থাকে ব্যক্ত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের সাংকেতিক-আন্দোলনের প্রভাবে ইংল্যাণ্ডে

"ডেকাডেন্ট", আমেরিকায় "ইমেজিষ্ট"—স্প্যানিশ আমেরিকায়—এবং স্পেনে "মডার্নিষ্টাস্"—এমনি নানা দেশে নানা সম্প্রদায় গড়ে উঠে। যাঁরা কম অধ্যাত্মপ্রবণ, তাঁরা সাংকেতিক রীতিতে লৌকিক অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি প্রকাশ করতে গিয়ে, দুর্বোধ্য ভাব-ভাষাময় আধুনিক কবিতার সৃষ্টি করেন। "ডাডাইজম্","সুররিয়েলিজিম" প্রভৃতি সংকেত—প্রবণতারই নানা পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত দার্শনিক-রাজনৈতিক-সামাজিক এবং সাহিত্যিক বা শৈল্পিক পরিবেশের মধ্যে থেকেই সাহিত্য-শিল্প রচনা করেছেন। তাঁর দার্শনিক উপলব্ধি—সমসাময়িক দর্শনের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দর্শনের বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে তিনি যেমন আস্থা স্থাপন করেছেন, তেমনি বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। যাকে তিনি সত্য বলে স্বীকার করেছেন তাকে প্রচার করেছেন, প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। আবার যাকে স্বীকার করতে পারেননি—তার হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। রাজনীতি-দর্শন, নীতিদর্শন, সমাজদর্শন, শিল্পদর্শন—সব দর্শন সম্পর্কেই এই একই কথা। 'রবীন্দ্র-মানস'—নিরূপণ করার প্রসঙ্গে,—রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক (সমস্ত দর্শন অন্তর্ভুক্ত) প্রবণতাগুলি—কোন্ দার্শনিক সিদ্ধান্তে তাঁর অনুরাগ কোন্ দার্শনিক সিদ্ধান্তে বিরাগ—আলোচনা করে দেখানো হবে। সুতরাং এখানেই "রবীন্দ্র-যুগ" সম্পর্কিত আলোচনার উপসংহার করা যাক।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-মানস

মানসিক ক্রিয়াগুলি, মোটামুটি, তিনটি বৃত্তির কাজ বলে' গণ্য করা হ'য়ে থাকে। প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে—মনের তিনটি বৃত্তি স্বীকার করা হয়েছে—এক, জ্ঞানবৃত্তি; দুই অনুভববৃত্তি; তিন, ইচ্ছাবৃত্তি। সুতরাং ব্যক্তিমনের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেতে হ'লে, এই তিন বৃত্তির সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের হিসাব-নিকাশ করেই পেতে হবে—জানতে হবে—ব্যক্তির জ্ঞানের সঞ্চয় কতটুকু, অনুভব-সামর্থ্য কতটুকু এবং ব্যক্তির ইচ্ছার প্রবণতা কোন্ দিকে এবং কত ঐকান্তিক। বিশেষ করে জানতে হ'লে—ব্যক্তি কত কি জানে শুধু তা' জানলেই চলবে না, ব্যক্তি কোন কোন বিষয়কে সত্য বলে জানে এবং সত্য বলে জানে ব'লে কোন্ কোন্ তত্ত্বকে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা'ও জানতে হবে। তেমনি জানতে চেষ্টা করতে হবে—ব্যক্তির অনুভবের সামর্থ্য—বিষয়ের সঙ্গে একাত্মক হওয়ার ক্ষমতা—ভাবাস্থায় সমাহিত হওয়ার শক্তি—ভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতি-স্পন্দনকে গ্রহণ ও দর্শন করার শক্তি, ভাবের ও রূপের অন্বয়যোগকে উপলব্ধি করার শক্তি—ভাবকে কল্পনায় এবং বিষয়কে ভাবে রূপান্তরিত করার শক্তি—এক কথায় কল্পনা-শক্তি। এই দুই শক্তির হিসাব-নিকাশ করলে মনের সামর্থ্যের অনেকখানি জানা হয়, সত্য, কিন্তু সবটা জানা হয় না—যে বাসনার মধ্যে আচরণের প্রেরণা নিহিত সেই বাসনারই স্বরূপ জানা হয় না। গোড়াতেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে।

বাসনা কেন সমাজ-সাপেক্ষ বা পরিবেশ সাপেক্ষ হ'তে বাধ্য, বাসনা কি করে এবং কতভাবে সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়ে থাকে, জ্ঞান-অনুভব-

বাসনার দ্বারা সমস্ত প্রকাশের প্রকৃতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—এ সব কথা আগেই সবিস্তারে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এখানে এইটুকু মনে করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট যে, জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা এই তিনটি সংস্থা বা চিত্ত-বন্ধ পরস্পর নিরেপক্ষ নয়—স্বতন্ত্র হয়েও একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত। জীবন-যাপনের বিশেষ অবস্থার মাঝ দিয়ে এই বন্ধগুলি গড়ে উঠে ব'লে জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য জীবনযাপনের প্রকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে।

অবশ্য, জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে মোটামুটি ভাবে—রেখারূপ এঁকে দেখানো কোন ক্ষেত্রেই অসম্ভব নয়। যেমন, ব্যক্তি আশৈশব, প্রকৃতির কাছ থেকে, পরিবারের কাছ থেকে এবং সমাজের কাছ থেকে প্রতিমুহূর্ত্তে যে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে বড় হয়েছে, তার নিখুঁত হিসাবপত্র তৈরী করা একরূপ অসম্ভবই বলা চলে; কিন্তু ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষার সাধারণ পরিচয় সংগ্রহ করা একটু অনুসন্ধান করলেই সম্ভব হয়। যেখানে ব্যক্তির আত্মজীবনী বর্ত্তমান; সেখানে—ব্যক্তির নিজের মুখেই অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেখানে তা না থাকে, সেখানে অপরের লেখা জীবনী শরণ্য। তা'ও যেখানে না থাকে সেখানে ব্যক্তির আচার—আচরণ তথা রচনা বিশ্লেষণ করে বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করা যায়। ব্যক্তির অনুভব-সামর্থ্য ও ইচ্ছা সম্পর্কেও একই সূত্র প্রযোজ্য। অর্থাৎ ফলেন পরিচীয়তে—প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব অনুমান দিয়ে পূরণ ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

যা' হোক, রবীন্দ্র-মানসের আলোচনা, আমাদের সূত্রানুসারে, একদিকে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার প্রকৃতিটি জেনে নেওয়া, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা নির্দ্দেশ করা—তাঁর পরাদার্শনিক

রাজ-আর্থনৈতিক, নৈতিক, শৈল্পিক এবং অন্যান্য প্রিয় মতবাদগুলি জেনে নেওয়া—এক কথায়, তাঁর জীবনদর্শনের বা ধারণাগুলির পরিচয় দেওয়া। রবীন্দ্রমানসের এত ব্যাপক আলোচনার জন্য যে অবকাশের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তা নেই বলেই আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করতে চেষ্টা করব না। আর এক কারণেও করব না। সে কারণটি এই যে, এ সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর অদ্বিতীয় রবীন্দ্র জীবনী-গ্রন্থে, যথেষ্ট—যথেষ্ট বল্লেও যথেষ্ট বলা হয় না—পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠককে—রবীন্দ্রনাথকে যারা পড়তে বা পড়াতে চান তাঁদের সকলকেই—আমি রবীন্দ্র-জীবনী পাঠ করে, আমার এই অংশের অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করে নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে আমি শুধু—অন্য দিকের বিষয় আলোচনা করব।

প্রথম আলোচ্য—রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শন (Metaphysics)। বলা বাহুল্য সমস্ত দর্শনের মূলে আছে এই পরাদর্শন। সুতরাং বলা যেতে পারে জীবন-দর্শনের ভিত্তি পরাদর্শনের সিদ্ধান্ত দিয়েই গঠিত। বাস্তবিকই তো, কোন ব্যক্তির পরাদর্শন-প্রীতি জেনে নিতে পারলে, ব্যক্তির অন্যান্য দর্শনকেও বেশ কতকটা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। সাধারণ ভাবে ব্যক্তি যত কথাই বলুন, আর যত নতুন-ভাষাতেই বলুন, শেষপর্য্যন্ত তাকে যখন শেষ কথা বলতে হয়—তিনি তাঁর মূল দর্শনের সংস্কারকেই প্রকাশ ক'রে থাকেন—যেমন বিচিত্র তানবিস্তারের পরে গায়ক সমে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যে নানাভাবের ঢঙ ও তানবিস্তার দেখালেও, শেষপর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম-ব্যাখ্যাত ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের ঠাঁটের মধ্যেই আবর্ত্তন করেছেন এবং মূল সিদ্ধান্তের সমেই ফিরে এসেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরাদর্শনেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত এবং মহর্ষির জীবনের মন্ত্রেই রবীন্দ্রনাথ

দীক্ষিত। মহর্ষির জীবনের মন্ত্র সেই গায়ত্রী মন্ত্রটিই—ভারতবর্ষের অনেকেরই যা' জপের মন্ত্র। এই মন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক ক'রে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র ব'লে বরণ করেছে—সেই মন্ত্রটি গায়ত্রী। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।" এই জপের মন্ত্রটিই মহর্ষির জীবনের মন্ত্র—রবীন্দ্রনাথেরও মূলমন্ত্র।—"অন্তরকে ও বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হ'চ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা" সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক,—"জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন।" এই জীবন-দর্শন রবীন্দ্রনাথেরও জীবনদর্শন। পারমার্থিক সত্তা, রবীন্দ্র-নাথের কাছে—"শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্"—ব্রহ্মই পরম সত্য। "তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংশ্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতি সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে।... তিনি শিব তার মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক। তার মানে এ নয় যে তবে এ সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে এই সমস্তই তা'তে এক।" ("ওঁ"—শান্তিনিকেতন) রবীন্দ্রনাথের কাছে—'সত্য-শিব-সুন্দর' অপেক্ষা "শান্তম্ শিবং অদ্বৈতম্" পরমসত্যের ধ্যান হিসাবে অধিকতর উপযোগী। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—"কোন ফরাসি দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় করেছেন—the true, the good, the beautiful। ব্রাহ্মসমাজে তারই একটি তর্জমা খুব চলতি হ'য়েছে—"সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্"। এমন কি অনেকে মনে করেন, এটি উপনিষদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করেছেন সে হচ্ছে শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। শান্তং হ'চ্ছে সেই

সামঞ্জস্য যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত ...... শিবং হ'চ্ছে মানবসমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই কল্যাণের মধ্যে বিকাশ-লাভ করছে যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়েও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হ'চ্ছে—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আর অদ্বৈতং হ'চ্ছে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করছে।" (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—(১৬৬-) আরো একটু ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—"অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হ'চ্ছে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য্য। কারণ বিপ্লব না থাকলে শান্তির কোন মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাকলে অদ্বৈত নিরর্থক" (ঐ ১৬৭)। 'সত্য-শিব-সুন্দর'—এই ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্রের সমালোচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয় আমাদের অনুভূতিগত বিশেষণ মাত্র, সত্যের তত্ত্ব হচ্ছে অদ্বৈত। যে সত্য বিশ্বপ্রকৃতি লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ করে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানিনে।"—(ঐ—১৬৮)। ১ম খণ্ড)। এই ব্রহ্ম—"সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্"।—"তিনি অনন্ত বলেই সর্ব্বত্রই ধরা দিয়ে আছেন—এই জন্য তার আনন্দরূপের অমৃত-রূপের প্রকাশ সকল দেশ"—"সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে চিরকাল ভোগ ক'রে চলব এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোন অর্থই নেই—তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ

মায়া মরীচিকা।" (পূর্ণ—শান্তিনিকেতন)—"এমনি ক'রে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকালস্বরূপ খণ্ড-কালের দ্বারা তার প্রকাশ চলছে......যিনি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্ত্তিমান করছেন—জগৎ-রচনায় করছেন মানব-সমাজের ইতিহাসে করছেন।......"

এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম অসীম সত্তা লীলাবশে আপনাকে সীমার বাঁধন পরিয়ে লীলা করছেন। এই সৃষ্টি তাঁরই "বহু" হওয়ার লীলা অদ্বৈতের বিশ্বরূপ লীলা—রূপে রূপে প্রতিরূপে আপনাকে প্রবিভক্ত করে দেওয়ার লীলা। যেহেতু সীমার বাঁধনেই রূপের সম্ভাবনা—এ লীলা—সীমার মাঝে অসীমের লীলা। নিজের অখণ্ডতার মাঝে খণ্ডতার প্রতিভাস সৃষ্টি ক'রে অসীমের মাঝে সীমা কল্পনা ক'রে—এ তাঁর প্রেমের লীলা। সীমা না থাকলে প্রেমের লীলা সম্ভব নয় বলেই তিনি প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমা, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমা স্থাপিত করেছেন—"প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তা' হ'লে তাঁর প্রেমের লীলা কোনমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তার প্রেম কাজ করছে; তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবদ্ধ জীবাত্মা (পার্থক্য—শান্তিনিকেতন ১)

এই কারণেই, নির্বিশেষের মধ্যে, বিশেষের,—অসীমের মধ্যে সীমার অখণ্ডের মধ্যে খণ্ডের অস্তিত্ব সম্ভব হ'য়েছে।—"যেখানেই হোক বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। মিথ্যাই বলি, মায়াই বলি তার মস্ত একটা জোর আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে? ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন শক্তি (তাকে শয়তান বল বা আর কোন নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর ক'রে এই মায়াকে আরোপ করে? সে তো

কোনমতে মনেও করতে পারিনে।......ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এই সমস্ত যা কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।"

এখন, 'ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এই সমস্ত যা কিছু হ'চ্ছে একথা স্বীকার করলে, তাঁর ইচ্ছাকেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা বলে মনে করলে—অহং-কারকে ব্রহ্মের প্রেমলীলার উপায় বলে স্বীকার করলে—ব্যক্তির আচ-রণের শেষ দায়িত্বও গিয়ে পড়ে ব্রহ্মেরই ঘাড়ে। পাপ-পুণ্যের, ধর্ম্মা-ধর্ম্মের মধ্যে সীমারেখা টানাও সম্ভব হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক জগতের মধ্যে, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, বন্ধ-মুক্তি—এ সব দ্বন্দ্ব স্বীকার না করলে উপায় নেই। এদের স্বীকার করতে যাওয়ার অর্থই হ'চ্ছে—এদের অস্তিত্ব স্বীকার করা আর সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা সেই ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাটিকে (free will)—যা' পাপ করতে পারে, দুঃখ ভোগ করতে পারে—বন্ধ অবস্থায় থাকতে পারে। অদ্বৈতের ইচ্ছার মধ্যে 'স্বাধীন ইচ্ছার' কল্পনা না করা পর্য্যন্ত তা' করা সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান-কল্পে রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন—অদ্বৈত ইচ্ছার বৃত্তের মধ্যে অহং-এর —তথা ব্যক্তি-ইচ্ছার বৃত্তের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে—অহং একেবারে মিথ্যা নয়, যেমন মিথ্যা নয় এই সংসার। তাই লিখেছেন —"এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তা হ'লেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে, এমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না, তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।" (নদী ও কূল)। তাঁর মতে—'যিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন, দানপত্রে আছে—'যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ' আমরা একে ভোগ করতে পারব (ইচ্ছা) রবীন্দ্র-নাথকে স্বীকার করতে হ'য়েছে—"মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপন সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন—এইখানে তাঁর

থেকে তাকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র ক'রে দিয়েছেন। সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না......সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও না মানতেও পারি, সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি।...... বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্ব্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়েনি। কেননা এইখানে প্রেমের আসন পাতা হ'বে। এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য, অন্যায়, পাপ মলিনতার অবকাশ ঘটেছে ...এইখানে মানুষ এতদূর পর্য্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন এমনটি ঘটতে পারতো না—বস্তুতঃ সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন..." প্রশ্ন যদি উঠে—তবে জগদীশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ? কোথায়—সর্ব্বব্যাপিতা কোথায় ?—রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই—"সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা' নয়, কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন—এই সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটিতে তিনি আছেন অথচ নেই।" (আত্মবোধ—শান্তিনিকেতন)। অন্যত্র এই সম্বন্ধে লিখেছেন—"বিশ্ব-সাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য, কেবল ওই একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেননি—সেটি আমার ইচ্ছা। ওইটিই তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন—মন ভুলিয়ে নেন।" (ইচ্ছা)। আগেই বলা হয়েছে —প্রকৃতিতে নিয়ম এবং মানুষের মধ্যে অহংকার দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অহংকারই সমস্ত রকম অসামঞ্জস্যের মূল। এই অসামঞ্জস্য আনার জন্যেই অহংকারের আয়োজন করা হ'য়েছে—"ভগবান ইচ্ছা করেই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের সামঞ্জস্য একটুখানি নষ্ট করে দিয়েছেন—এই তাঁর আনন্দের কৌতুক.........ঈশ্বর যে অহংকার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তার প্রেমেরই লীলা। অহংকার না

হ'লে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হ'লে মিলন হয় না, মিলন না হ'লে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদ পারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এই সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল আর ধর্মতন্ত্রই বল।" লক্ষ্য করবার কথা—মানুষ সব চাওয়ার মাঝ দিয়ে ভগবানের সঙ্গেই মিলতে চাইছে। রাজনীতি—অর্থনীতি—সমাজনীতি—সব নীতি এক হিসাবে—মানুষের প্রেমের সাধনারই রূপ।

যা হোক, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী ব'লেই যেমন সে তার ইচ্ছাকে বিশ্বধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে— স্বরূপে অবস্থান করবার সাধনা করতে পারে, তেমনি অহংকারবশে আবার বিশ্ব-বিধানের প্রতিকূলতাও করতে পারে—তাকে আঘাত করতে পারে—সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা না করে অন্তরে বাইরে অশান্তি—অমঙ্গল সৃষ্টি করতে পারে। কারণ—নিয়মের সঙ্গে বিচ্ছেদই অশিব ('তিন') অহংকারের বিকার থেকেই অমঙ্গলের উৎপত্তি—পাপের জন্ম। অহংকারের বিকার ঘটে। কারণ—"অহংকারের স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা"........অহংকারের এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে উঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে প্রকাশ পায়।" (অহং—শান্তিনিকেতন)

"কোন একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনা ঘনীভূত করি, তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড় ক'রে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে—**অমঙ্গল**। অংশের প্রতি আসক্তি-বশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে **পাপ** (তপোবন—শান্তি-নিকেতন)।—"প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য

ভেঙে যায়।" স্বরূপে অবস্থান করার জন্য—"জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকে যেন বাধা-মুক্ত ক'রে তুলি।" আত্মার স্বভাব কি?—"পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই।"

যখন—"ক্ষুধিত অহং"—যে কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে কৃপণ নেবার মৎলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মৎলব ছাড়া কিছু করে না"—যে "আত্মার আত্মীয় নয়"—এই স্বভাবটিকে আচ্ছন্ন করে বসে, তখনই পাপের জন্ম হয়—মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। "অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে......অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছে আমাদের আত্মার নাম-রূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টণ তৈরি ক'রছে......."আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা".........."আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না।....." "তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে।...আত্মাই অহং'এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে দীনহীন হ'য়ে বাস করতে থাকে (নদী ও কূল)।

রবীন্দ্রনাথের কাছে—পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম—"সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধার জিনিস নয়"। পাপ-পুণ্য মূলতঃ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ বন্ধে পাপ—মুক্তিতে পুণ্য। যা' চৈতন্যের আবরক তাই পাপ। "কোন-একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপে প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়।...... ...আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে। কোন-একটাকে স্ফীত করতে থাকে। তা'তে ক'রে

কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না তা' নয়, চারিদিকের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।" অন্তরে-বাইরে এই সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারাই—ধর্মসাধনার বড় কথা। সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারা অধর্ম বটে কিন্তু কিন্তু সব চেয়ে বড় অধর্ম—বড় পাপ—স্বভাব-হানিতে। "আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে উঠি। বলি যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কাউকে মানিনে" এবং সেই অহংকারের তাড়নায় বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই—বিশ্বের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক যোগটিকে—প্রেমের যোগকে—আনন্দের যোগকে অস্বীকার করি। এই স্বভাব-বিরোধিতা—ব্রহ্ম-বিমুখতাই আসল পাপ।

এখানেই একটা কথা বলা দরকার—কথাটা এই—পাপ-পুণ্য "সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধার জিনিস" না হ'লেও—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্যাপার হ'লেও—অন্তরে-বাইরে সামঞ্জস্য রক্ষার কথা যেখানে বলা হ'য়েছে—যেখানে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার কথা বলা হ'য়েছে সেখানেই 'সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধা'র সঙ্গে পাপ-পুণ্যের যোগও স্বীকার করা হ'য়েছে। যেমন, ভিতরে অসামঞ্জস্য ঘটলে বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব নয়, তেমনি বাইরের অসামঞ্জস্য তখনই দেখা দেয় যখন ভিতরের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়। এককথায়, বাইরের অসামঞ্জস্য অন্তরের অসামঞ্জস্যেরই পরিণতি—বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং, পাপ-পুণ্য আধ্যাত্মিক—একথা বলায়—পাপ-পুণ্যকে সম্পূর্ণ সমাজ-নিরপেক্ষ করে তোলা হয়নি। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে—রবীন্দ্রনাথের "শান্তং শিবং অদ্বৈতম্"—বিশ্বপ্রকৃতি, মানবসমাজ—সবকিছুকে নিয়েই সত্য। জড়ের জগৎ প্রাণের জগৎ এবং মনের জগৎ, সব নিয়েই সর্ব্বং-খল্বিদং।" এই বিশ্ব বিশ্বরূপের লীলা। এই লীলার আবেগ থেকেই

প্রকৃতির উদ্ভব—প্রকৃতির বুকে প্রাণের আবির্ভাব—এবং প্রাণের জগতে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ঘটেছে। বস্তুর বিবর্ত্তনের ইতিহাস যেমন তাঁরই সৎ-স্বরূপের লীলা, মানবসমাজের বিবর্ত্তনে তাঁরই চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপের লীলা।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্রহ্ম-বিবর্ত্তনবাদ, এবং বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে সুন্দর একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। এই সামঞ্জস্য স্থাপন করা সহজ হ'য়েছে এই কারণেই যে—বিবর্ত্তনের সংস্কারকে আমাদের ঔপনিষদ দর্শনের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ অসীম সমীকরণ-শক্তিবলে—উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মধ্যে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ এবং বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদকে আত্মসাৎ করে নিতে চেষ্টা করেছেন। 'আত্মার প্রকাশ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—"প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না। কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্মের সঙ্গে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তা' হ'লে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার যদি কেবল বিরোধই থাকত, তার কোন সামঞ্জস্যই না থাকত, তা' হ'লেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না", তখন অনেকটা হেগেলীয় দর্শনের দ্বন্দ্বের ধারণাকেই প্রকাশ করেন। যদিও আমাদের শাস্ত্রে "দ্বন্দ্ব" শব্দটি পাওয়া যায়—এবং দ্বন্দ্বাতীত হওয়ার সাধনার কথাও বলা হয়েছে, তবু—'কর্মের মধ্যে শক্তির বিরোধ'-এর কল্পনা ভক্তত এবং প্রধানতঃ হেগেলীয়। তেমনি যখন লেখেন—"বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগি—চলতে চলতেই তার যা-কিছু পাওয়া। জড়ের রাস্তায় চলতে

চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে প্রাণকে প্রাণের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে মানুষকে" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি), তখন ব্রহ্মবাদ অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের সুরটিই বেশী ফুটে উঠে। কারণ ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারণা বৈদান্তিক দর্শনে অস্ফুট, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেই সুপরিস্ফুট। ব্রহ্মবাদে 'লক্ষ্যহীন বৈরাগী'র স্থান নেই—'অকারণ চলা' বলেও কোন চলা থাকতে পারে না। কারণ লক্ষ্য সেখানে ধ্রুব—ব্রহ্মের পরমপদ। চলার কারণ তো তাঁরই প্রেমের আকর্ষণ—ব্রহ্মের স্বভাবে ফিরে যাওয়ার আবেগ। নীহারিকা থেকে ক্রমে ক্রমে অজৈব এবং জৈব জগতের—মনোজৈবিক জগতের অভি-ব্যক্তির কল্পনা বিজ্ঞানেরই কল্পনা—বিবর্ত্তনবাদেরই ধারণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তায় এই কল্পনা মাঝে মাঝে মিশিয়ে ফেলেছেন। পশ্চিম মহাদেশের জীবনদর্শনের সমালোচনা করার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন—"এতদূর পর্য্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোন জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলছে—বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে' তেমনি ইউরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে—জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হ'য়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলেছেন এই তাদের "কথা (কর্ম্মযোগ)। (Alexander-এর Space Time Deity-তে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেই জাতীয় সিদ্ধান্তের উপর কটাক্ষ—বলে মনে হয়।) রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত—"ব্রহ্মের একদিকে ব্যাপ্তি, আর-একদিকে সমাপ্তি; একদিকে পরিণতি আর-একদিকে পরিপূর্ণতা; একদিকে ভাব, আর-একদিকে প্রকাশ"—(কর্মযোগ)। যা'ই হোক—পরিণতির দিকে—প্রকাশের দিকে—ক্রমাভিব্যক্তির যে কল্পনা করা হ'য়েছে, তা'তে বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের ছোঁয়াচ একটু লেগেছে। এই প্রকাশেরই মাঝে সৃষ্টিলীলা চলেছে

সে লীলা—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা" এই প্রকাশের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরিত্য আছে, তা' না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকে তা' হ'লেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।" (আত্মার প্রকাশ) সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে এবং আছে সেখানেই "যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হ'য়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে।" (ঐ)। এই চলার মাঝ দিয়েই সীমা অসীমকে প্রকাশ করছে। এই কারণেই জগতের মধ্যে নিরন্তর একটি অভিব্যক্তি আছে, গতি আছে। "রূপ হতে রূপান্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ ক'রছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন" (আত্মার প্রকাশ)।

যেখানে সীমার সার্থকতা অসীমকে প্রকাশ করায়—সেখানে —"আমাদের জীবনের সাধনা এই যে অহংএর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব।"—কারণ—"মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার, অনন্তের আনন্দকে পাওয়া" (অগ্রসর হওয়ার আহ্বান)। "আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেই সকব ইচ্ছার মধ্যে তার সমাপ্তি নয়, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান-প্রেম-কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে—সে যেখানে গিয়ে পৌচচ্ছে সেখানে গিয়ে থামতে পারছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে। (অনন্তের ইচ্ছা)।

কিন্তু আত্মার অন্তরতম এই অব্যক্ত ইচ্ছা অহংকারের চাপে অবাধে প্রকাশিত হ'তে পারে না। "ভগবান...অহংকারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আমাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা সমস্তই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয় করে এক একটি অপরূপ মূর্তি ধরে বসে আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়া-কাড়ি টানাটানির অন্ত নেই।" এই অহংকারের বিকৃতি থেকেই সমস্ত পাপের, সমস্ত তাপের উৎপত্তি। এই অংকারের বিকৃতি বশেই ব্যক্তি—সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়, শিবকে পদদলিত করে, সুন্দরের প্রতি বিমুখ হয়। ভুলে যায়—"যে অধ্যাত্মলোকে তার স্থিতি সে হচ্ছে ব্রহ্মলোক। যে জগৎ সভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসিনি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন...নিজের অনন্ত আভি জাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।" (প্রভাতে)

সুতরাং—"আত্মা দিয়ে চিত্তের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য।" এই প্রবেশ যত বাধাপ্রাপ্ত তত আমরা বদ্ধ, তত আমরা প্রবাসী, তত আমরা পরাধীন। "বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই"—(ত্যাগ)। প্রেমেই স্বাধীনতা আর সেই স্বাধীনতারই নাম মুক্তি। সুতরাং সাধনা বলতে স্বাধীনতারই সাধনা প্রেমের সাধনা। কারণ—"স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে না" —"প্রেম" স্বরূপের সঙ্গে মিলিতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে।"......"প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই

যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।" (প্রেম) "এই প্রেমেই আমরা অনন্তের আস্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না" (প্রার্থনা)। কিন্তু সাধনায় বিকারের সম্ভাবনা আছে। তাঁর মতন হ'তে গেলে—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগ চাই। তিনি যেমন চৈতন্যস্বরূপ, যেমন প্রেমস্বরূপ, তেমনি কর্মস্বরূপও। সুতরাং জ্ঞান—প্রেম-কর্মের যোগেই তাঁর সাথে যুক্ত হতে হবে। শুধু কর্মে, শুধু জ্ঞানে বা শুধু প্রেমে যে-যোগ সে যোগ অসম্পূর্ণ। "পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিল্‌তে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিলিতে হবে" (সমগ্র এক)।

কিন্তু সামঞ্জস্য রক্ষা করাই সমস্যা। কর্মের সাধনায়, জ্ঞানের সাধনায়, প্রেমের সাধনায়, বিকার শঙ্কা আছে।—"প্রেমের সাধনায় বিকারাশঙ্কা আছে। সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরমসিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।" (বিকারশঙ্কা)। "ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে

কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।" কারণ মনের ও হৃদয়ের জ্ঞানের ও ভক্তির অখণ্ড যোগেই সাধনার সম্পূর্ণতা। মহর্ষির সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ আদর্শ সাধনা বলে গ্রহণ করেছেন—"তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্ম নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম—নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ, জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্ম নিবেদন......... পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথ গ্রহণ।" (সামঞ্জস্য)॥

রবীন্দ্রনাথও সাধনার সামঞ্জস্যের পূজারী। জ্ঞান-প্রেম-কর্ম এই তিনের সামঞ্জস্য যেখানে ক্ষুণ্ণ, তাঁর মতেও, সেখানে সাধনা অসম্পূর্ণ—বিকৃত। জ্ঞানের বিকৃতি আসে—প্রথমতঃ "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্"—তত্ত্বকে না বুঝতে পারার ফলে। সমস্ত গতির গতি হিসাবেই যে তিনি শান্ত, সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের পরম আশ্রয় রূপেই যে তিনি শিব এবং সমস্ত খণ্ডসত্তার সমবায়েই যে তিনি অদ্বৈত—এই তত্ত্বটি যেখানে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয় না সেইখানেই জ্ঞানের বিকৃতি ঘটে। যাঁরা সেভাবে উপলব্ধি করেন না তাঁরা ভুলে যান—"যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই-সমস্ত-কিছু-বিবর্জ্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাকেও ত্যাগ করা হয়।" (কর্ম)। জগৎকে যাঁরা মায়া বলে অস্বীকার করতে চান তাঁরা এই ভুল করে থাকেন। তাঁরা ভুলে থাকেন—যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে—ব্রহ্মের আনন্দ আছে তারি মাঝখানে। এই ভুল ধারণা অর্থাৎ মায়াবাদ থেকেই আসে—কর্মবিমুখতা—"নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাতলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে, তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন।

তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।” (কর্মযোগ)। কর্মহীন জ্ঞান—জ্ঞানহীন কর্মের মতোই অসম্পূর্ণ।

জ্ঞানের অন্যতম বিকৃতি—ভক্তিশূন্যতা বা শুষ্কতা। ব্রহ্মকে “শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্” বা ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্’—বলে জানাই মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমগ্র সত্তা বা প্রকৃতি দিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তি কোথায়? তিনি যেখান “আনন্দম্” সেখানে তাঁকে পরানুরাগ দিয়েই পেতে হবে। ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান . ন...বিভেতি কদাচন—এতে আনন্দ-যোগের—ভক্তিযোগেরই কথা বিশেষ করে বলা হ'য়েছে। তবে প্রেমের বা ভক্তির বিকৃতি না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা চাই। জ্ঞানের ও কর্মের সম্পর্ক থেকে ভক্তিকে বিযুক্ত করে তুললেই, ভক্তির মধ্যে বিকৃতি দেখা দিয়ে থাকে—ভক্তি প্রমত্ত হ'য়ে উঠে। “হৃদয়াবেগকে চরম রূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনি মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক না কেন, তাতেই তার সফলতা”—(সামঞ্জস্য) এই বিকৃতির অবস্থায়—“মানুষ পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করে, কাকে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করে না। তখন—“সত্যের সঙ্গে রসের জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে।”

যেমন জ্ঞানের বিকৃতি সম্ভব, প্রেমের বিকৃতি সম্ভব, তেমনি কর্মের বিকৃতিও সম্ভব। একথা ভুলে গেলে চলবে না—ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানময় ও প্রেমময় তেমনি তিনি কর্মময়। “আনন্দ আছে, অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না। সেই ক্রিয়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম।” ......“ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন—তিনি ‘বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।’...... তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করেছেন। কাজ করেছেন তিনি কাজ করছেন—নইলে আপনাকে

তিনি দিতে পারবেন কী করে? সেই তো তাঁর সৃষ্টি।" (কর্মযোগ)। "উপনিষৎ বলছেন—এষ দেবো বিশ্বকর্মা, এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করেছেন।" (আত্ম-বোধ) সুতরাং বিশ্বকর্মার সঙ্গে যোগ রাখতে হ'লে কর্মকে ত্যাগ করলে চলবে না। "তখন কী আনন্দ যখন সকল কর্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছে ফিরে ফিরে না আসে কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হ'য়ে উঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ—তখন সংসারই তো আনন্দ-নিকেতন।" (কর্মযোগ)—"এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্য বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে, তাই যদি না হত তা' হ'লে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না"—"মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।"—(কর্মযোগ)। "সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানবমাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টির ব্যাপার থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোন-একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা।" (কর্মযোগ)।" কে বলতে চায়—'আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তার সঙ্গে মিলব'। কে বলতে চায় এই সমস্তই মিথ্যা—এই বৃহৎ সংসার এই নিত্যবিকাশমান মানুষের

সভ্যতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ ক'রে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা—এই পরম দুঃখের এবং পরম সুখের সাধনা।" "আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া; আনন্দ সত্যই নিজেকে বিচিত্রপ্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেইজন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ…তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ, এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ—(কর্ম)"—"এখন. আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয়, তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্ম-যোগ।" (কর্ম)—"একথা বলতে পারব না একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়" (কর্মযোগ)। মুক্তির সঙ্গে কর্মের বিরোধ নেই। কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি, কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়।"—"কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি।"

'কিন্তু, যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে……..আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে, তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায় (শক্তি)।

এই যেমন একদিকে কর্মের বন্ধন-রূপ, তেমনি অন্যদিকে কর্মযোগে যুক্ত হ'তে গিয়ে মানুষ কর্মকেই লক্ষ্য করে তুলতে পারে তথা যোগের বিকৃতি ঘটাতে পারে। যেখানে কর্মের মূলে জ্ঞানের ও ভক্তির প্রেরণা কাজ করে না, সেই উদ্দেশ্যহীন অসাড় কর্ম প্রকৃত যোগ থেকে মানুষকে

ভ্রষ্ট করে। সেই যোগভ্রষ্ট মানুষ উপলক্ষ্যকেই লক্ষ্য মনে করে, আচার-বিচারকেই ধর্ম বলে জানে এবং মন্ত্রের শব্দকেই মননের মর্যাদা দিয়ে বসে। "ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য গতি দিবার জন্যই আচারের সৃষ্টি"—"জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে। সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়—"এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য" (অচলায়তন-গ্রন্থপরিচয়)। "মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভি-নিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র।......কিন্তু সেই মন্ত্রকে মননব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কি হইতে পারে?.........তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে; তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে।"—(ঐ)।

তখন যাগযজ্ঞ পূজা-অর্চনা প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের স্তূপের অন্তরালে দেবতা ঢাকা পড়ে যায়। দেবতার স্থান অধিকার করে মৃণ্ময় বা পাষাণময় মূর্তি। বিশ্বরূপের অধিষ্ঠানকে সঙ্কুচিত করে মন্দিরের সংকীর্ণ অন্ধকার গৃহকোণে পরিণত করা হয়। সব ক্ষেত্রেই উপলক্ষ্য লক্ষ্যের স্থলে অভিষিক্ত হয়।

অতএব—রবীন্দ্রনাথের মতে—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যেই সাধনার চরম প্রকাশ। অরূপের ও রূপের, অসীমের ও সীমার সামঞ্জস্যের এবং 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'-এর সামঞ্জস্যের ভিত্তির ওপরে রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের প্রতিষ্ঠা বলেই জ্ঞান-প্রেম-কর্মের পূর্ণ সামঞ্জস্যেই ব্রহ্মযোগের পূর্ণতা সম্ভব হয়। স্বভাব প্রাপ্তিতেই সাধনার সিদ্ধি। ব্রহ্মের যা স্বভাব—সেই স্বভাব পেতে গেলে—জ্ঞানযোগ প্রেমযোগ—কর্মযোগ তিন যোগই চাই। যেখানে পূর্ণ সামঞ্জস্যের

অভাব—সেখানেই অপূর্ণতা। এই দিক থেকে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে এক কথায় আমরা 'সামঞ্জস্যের দর্শন' বলতে পারি। অসীম ও সীমাকে মিলিয়ে, ব্রহ্ম ও সংসারকে মিলিয়ে যে দর্শন তা'কে অবশ্যই 'সামঞ্জস্য'-বাদী দর্শন বলা যেতে পারে।

বাস্তবিক রবীন্দ্রদর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব এবং বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা। ব্রহ্মকে ও বিশ্বকে স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখে বিশ্বের ব্রহ্মময়ত্ব এবং ব্রহ্মের বিশ্বরূপত্ব বজায় রেখে, রবীন্দ্রনাথ পরা ও অপরা তত্ত্বের মধ্যে যেভাবে সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁর সমন্বয়ের দৃষ্টিতে—ব্রহ্ম ও বিশ্ব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা নয়—সম্পূর্ণ এক না হ'লেও, স্বতন্ত্র কোন-কিছু নয়। অন্তরে যিনি এক বাহিরে তিনিই বিচিত্ররূপী—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি"—"তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃন সংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোক বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।"—(প্রাণ)। এই কর্মই তো বিশ্বসৃষ্টি। প্রাকৃতিক জগৎ, প্রাণের জগৎ এবং মনের জগৎ—সবই ব্রহ্মের আত্মক্রীড়া—আনন্দের বিচিত্র সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ—"শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন"—না; ব্রহ্মকে শুধু নির্গুণ বলেই—মানলেন না। মহর্ষির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন তাঁর সম্পর্কেও সে কথা সত্য—সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয়নি" —(সামঞ্জস্য)। শক্তি, শক্তির কার্য এবং শক্তিমানকে এক করে দেখলেন। ব্রহ্মের লীলাকে বিধানের ডোর পরিয়ে দিলেন। ঘোষণা করলেন—ব্রহ্মই বিশ্ব-প্রকৃতিতে নিয়মের রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন। জগতে বিধান আছে—নিয়ম আছে। এই বিশ্ববিধান থেকে পালিয়ে মুক্তি নেই। মুক্তি

পেতে হ'লে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করতেই হবে। "জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন দেখে কার্যকারণের কোথাও বিচ্ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে" (জগতে মুক্তি)।

এখানেই বিজ্ঞান-চর্চার উপযোগিতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন—একজন বৈজ্ঞানিক যতখানি আবেগ নিয়ে দিতে পারেন ততখানি আবেগ নিয়েই তিনি দিয়েছেন। কারণ যে সত্য জগৎপ্রকৃতির মধ্যে নিয়ম হয়ে তাকে বেষ্টন করে আছে, তাকে পেতে হ'লে নিয়মকে জানতেই হবে। জ্ঞানময়ের সঙ্গে যুক্ত হ'তে গেলে সব রকম অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন করতে হবে। জগৎ-প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলে চোখ বুজে থাকলে বা উপেক্ষা করলে সত্যকেই উপেক্ষা করা হবে। ভুলে গেলে চলবে না—"আমাদের প্রেম জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে মুক্তি বলব—নির্গুণ ব্রহ্মে তার যে কোন স্থান নেই।" (জগতে মুক্তি)।

কিন্তু সত্য তো কেবল জগৎ-প্রকৃতিরূপেই অভিব্যক্ত নয়। জীব-প্রকৃতি—মানব-প্রকৃতিরূপেও তাঁর উন্নতর অভিব্যক্তি ঘটেছে। সুতরাং মানুষ শুধু যে জগৎ-প্রকৃতির আশ্রয়ে আছে তা' নয়, সমাজ-প্রকৃতিকেও আশ্রয় করে আছে।—"মানুষের কাছে কেবল জগৎ-প্রকৃতি নয়, সমাজ-প্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। তা আছে বলেই "এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে, মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয়, ততখানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।"—(সমাজে মুক্তি)।

এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ সামাজিক জীবন-যাপনকেও মুক্তিসাধনার অন্যতম এবং অপরিহার্য উপায় রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। জগৎ-প্রকৃতির জ্ঞানকে—অর্থাৎ বিজ্ঞানকে যেমন মুক্তি-সাধনার উপায় বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তেমনি সমাজ-বিজ্ঞানকে তথা নীতিবিজ্ঞানকেও